নিবেদিতা বিদ্যালয়
শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা
১৮৯৮-১৯৯৮

শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা

১৯৯৮

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল
৫ নিবেদিতা লেন
কলকাতা— ৭০০০০৩

সূচীপত্র

জয় বিশ্বনুতে (স্তব) ✡ **তারাপদ ভট্টাচার্য** ৯

ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাচিন্তা ✡ **প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা** ১০

সেকালের নারীশিক্ষা ও নিবেদিতা বিদ্যালয় ✡ **চিত্রা দেব** ১৪

ভারতকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ—নিবেদিতা ✡ **কমল নন্দী** ১৯

দেবী-জননী নিবেদিতা (কবিতা) ✡ **নচিকেতা ভরদ্বাজ** ২৭

আঁধারে জ্বেলেছ দীপ (কবিতা) ✡ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী** ২৯

তমোহর তিনিই ভগিনী (কবিতা) ✡ **দিব্যেন্দু পালিত** ৩০

প্রণমি তোমারে ✡ **প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা** ৩১

বাগবাজার পল্লী, নিবেদিতা ও তাঁর স্কুল ✡ **স্বাতী ঠাকুর (চক্রবর্তী)** ৩৪

ক্রিস্টিন : বিদ্যালয়ের আর এক ধাত্রী ✡ **দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত** ৩৯

নিবেদিতার শিক্ষাভাবনা ✡ **সুব্রতা সেন** ৪৬

একটি পারিজাত পুষ্প ✡ **প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা** ৫২

সুন্দরের উপাসনায় নিবেদিতা ✡ **প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা** ৫৪

নিবেদিতার চোখে ভারতে পৌরাণিক চরিত্র ✡ **পূর্বা সেনগুপ্ত** ৫৯

নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ✡ **বন্দিতা ভট্টাচার্য** ৬৪

নিবেদিতার রচনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ✡ **নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়** ৬৬

নিবেদিতার মনোলোকে সারদা মাতা (কবিতা) ✡ **শঙ্করীপ্রসাদ বসু** ৭১

নিবেদিতার সমাজচেতনা ও সমন্বয় ভাবনা ✡ **সান্ত্বনা দাশগুপ্ত** ৭৬

ভারতে জাতীয়তা ও নিবেদিতা ✡ **স্বামী বলভদ্রানন্দ** ৭৯

ভগিনী নিবেদিতা : শিল্পীর দৃষ্টিতে ✡ **রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়** ৮৬

অজন্তাতীর্থে ✡ **গৌতম হালদার** ৯০

স্বামীজীর আহ্বানে ✡ **প্রণবেশ চক্রবর্তী** ৯৩

আলো দাও (কবিতা) ✡ **অর্ধেন্দু চক্রবর্তী** ৯৬

ভগিনী নিবেদিতা (কবিতা) ✡ **সরল দে** ৯৭

নিবেদিতা (কবিতা) ✡ **নিমাই মুখোপাধ্যায়** ৯৮

শুভ্র শতদল (কবিতা) ✡ **মানসী বরাট** ৯৮

চিরসন্ন্যাসিনী (কবিতা) ✡ **প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা** ৯৯

অনন্তের পাখি ✡ **প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা** ১০০

একটি প্রতিবেদনে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের অতীত রূপপ্রতিমা ✡ **হর্ষ দত্ত** ১০৩

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বের রূপকার ✡ **ঝরনা চৌধুরী** ১০৯

ছাত্রীদের স্মৃতির আলোয় নিবেদিতা ✡ **দীপ্তি ঘোষ** ১১৪

কত স্মৃতি কত ছবি ✡ ১১৮

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগ ✡ ১৩১

বিদ্যালয়ের এক অসামান্য ছাত্রী ✡ **প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা** ১৩৩

অর্ঘ্য (কবিতা) ✡ **জিতেন্দ্রনাথ সরকার** ১৩৭

আলোকদূতী (কবিতা) ✡ **প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণা** ১৩৮

তুমি এখানেই (কবিতা) ✡ **মানসী মজুমদার** ১৩৯

নিবেদিতা-তীর্থে মনীষী সমাগম ✡ **রেবা ভট্টাচার্য** ১৪০

নিবেদিতাতীর্থে ✡ **প্রব্রাজিকা মৈত্রীপ্রাণা** ১৪৪

সত্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সাফল্যের চাবিকাঠি ✡ **ভাস্বতী সেনগুপ্ত** ১৪৮

একটি আলোকচিত্র ✡ **প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা** ১৫০

সম্পাদনায় নির্দেশনা :	প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা
সম্পাদনা :	প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা
সহ সম্পাদনা :	প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা
প্রুফ দেখেছেন :	সোমনাথ ভট্টাচার্য রীনা মুখোপাধ্যায় স্বরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়
লেজারে অক্ষরবিন্যাস :	হাসি ঘোষাল
অঙ্গসজ্জা :	রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতী দাস স্নিগ্ধা দত্ত
লেজারে বিজ্ঞাপন কম্পোজ :	প্রব্রাজিকা অসীমপ্রাণা ব্রহ্মচারিণী অমলা
প্রয়োজনীয় সহায়তা :	দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীশ্রীমা ও নিবেদিতা

প্রাক্‌কথন

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্ণ হল । যে কোনও বিদ্যালয়ের পক্ষেই এই শতবর্ষ উদ্‌যাপন পরম গৌরবের বিষয় । নিবেদিতা বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষালয় কোনদিনই ছিল না, আজও নেই । তার কারণ এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের অন্তরালে আছে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন, নিবেদিতার মতো মহৎ প্রাণের উৎসর্গ এবং ভারতের মেয়েদের জন্য নতুন পথের ইঙ্গিত । নিঃশেষে ও নিঃশর্তে সেবা ও কর্মে আত্মনিবেদনের একটি পরম্পরাও এই প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ।

একশ বছর পরের সুপ্রতিষ্ঠ নামী বিদ্যালয় এবং তার উজ্জ্বল ছাত্রীদের দেখে সেই পুরোনো দিনের ছবি— সামান্য শিক্ষার আলোক পাবার জন্য ব্যগ্র নিবেদিতার ছাত্রীদের ছবির আভাস পাওয়া কঠিন । এই একশ বছরে দেশ, সমাজ-সংসার এবং জীবনের মূল্যবোধ— সবকিছুর মধ্যেই এসেছে অনেক পরিবর্তন । কিন্তু এর মধ্যে নিবেদিতার বিদ্যালয়ে যেসব মেয়েরা পড়াশোনা করেছে— তাদের চিন্তা ও জীবনে একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ আজও চোখে পড়ে । একশ বছরের একটি সমীক্ষা আমাদের সচেতন করে তুলেছে নতুন করে ।

নিবেদিতার যুগে মেয়েদের ভারতীয় ভাবে ভাবিত করার প্রয়োজন যতটা ছিল, আজ স্বাধীন ভারতে সে প্রয়োজন কি সহস্রগুণ হয়ে ওঠেনি ? আন্তর্জাতিক হবার অতিরিক্ত আগ্রহে স্বদেশ এবং নিজ সংস্কৃতির প্রতি বিমুখতার বিপদ যে ঘনিয়ে আসবে— সে কথা স্বামীজী জানতেন এবং নিবেদিতাও বুঝেছিলেন । ভারতের নিজের ঘরানার শিক্ষাদীক্ষাই যে মেয়েদের একদিন অনন্য ভূমিকায় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকরূপে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে নির্ভীক করবে— এ সত্যও নিবেদিতার অগোচর ছিল না । তাই এই শতবর্ষের বৃত্তে দাঁড়িয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিবেদিতার অর্পিত দায় বহন করে নিয়ে যাওয়ার শুভদিন এসেছে ।

নিবেদিতার জীবন—এযুগে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে আত্মত্যাগ ও সেবার মহিমা । যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছিলেন নিবেদিতাকে, তাঁদের জীবনে পরাধীন ভারতে সঞ্চারিত হয়েছিল দেশপ্রেম ও দেশসেবার প্রেরণা । জাতীয়তাবোধের পাঠ নিতে এই নিবেদিতার কাছে সেদিন আসতেন দেশের বরেণ্য নেতা, সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক । অধিকাংশ মানুষই গ্রহীতার ভূমিকায় থাকেন । দাতার ভূমিকা বড় কঠিন ; সেখানে স্বামীজীর কঠিন নির্দেশ সর্বদাই ধ্বনিত হত— 'দাও আর ফিরে নাহি চাও থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল ।'

নিবেদিতার নিবেদনের ব্যাপকতা ও গভীর আন্তরিকতা দেখে সেদিনের কবি-মনীষীরা বিস্মিত, শিল্পীরা স্তব্ধ ও বুদ্ধিজীবীরা বিমূঢ় হয়েছিলেন । স্বদেশ, স্বজাতি, স্বপ্রতিষ্ঠা, নিজের দেহ-মন-প্রাণ সবই সেই দানের উপকরণ হয়েছিল । সেইসঙ্গে তিনি যেন নিজের হৃদয়ের রুধির সিঞ্চিত করে শিশু বিদ্যালয়টিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন । নিবেদিতার অপরিমেয় শক্তির কি অপচয় ঘটেছিল ঐ ক্ষুদ্র বিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রয়াসে ? না, সেদিনের

মনীষীরা অন্তত সে কথা ভাবেননি । তাঁরা দেখেছিলেন, ধরিত্রী যেমন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে মাটির নীচের একটি বীজকে লালন করে, নিবেদিতাও স্বামীজীর স্বপ্নসম্ভব একটি বিদ্যালয়কে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন । ভারতের ঐতিহ্যের মাটি লেগে থাকত তাঁর হাতে গড়া ছাত্রীদের অঙ্গে, তাদের মানসে, তাদের জীবনযাত্রায় । মহান অধ্যাত্মভাবের জন্মদাত্রী এই ভারতবর্ষের পুণ্যনাম নিবেদিতাই তাঁর ছাত্রীদের জপ করতে শিখিয়েছিলেন । তাঁর সেকালের ছাত্রীরা এই বাংলার অন্তঃপুরে মিশে গিয়ে কোনও দৃষ্টান্ত রেখেছিল কিনা আমাদের জানা নেই । কিন্তু তাঁরই ছাত্রী একদিন বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত মেয়েদের মঠের প্রথম অধ্যক্ষার পদে বসে নতুন ইতিহাসের সূচনা করেছেন— এ আজ সর্বজনবিদিত ঘটনা ।

বিদ্যালয়ের স্মরণিকার পথ ধরে এগিয়ে যেতে গিয়ে বার বার আমাদের ফিরে তাকাতে হয়েছে প্রতিষ্ঠাত্রী নিবেদিতার দিকে । নিবেদিতা ও তাঁর বিদ্যালয়কে পৃথক করে দেখা যায় না । তাই আমাদের অনুরোধে লেখক-লেখিকারা সাগ্রহে পাঠিয়েছেন নিবেদিতার প্রতি তাঁদের প্রাণের শ্রদ্ধার্ঘ্য, জানিয়েছেন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শতবর্ষে তাঁদের আনন্দ ও গৌরব । নিবেদিতা আমাদের কাছে বিদেশিনী নন । ত্যাগ ও সেবার আদর্শে তিনি ভারতের সজীব প্রতিমা । তাঁর জীবনের বহুমুখী বিকাশ বহু প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় । তা শুধু এখানকার কর্মী ও ছাত্রীদেরই নয়, বিশ্বের নারীকুলকে চিরদিন প্রেরণা দেবে নিঃস্বার্থ সেবায় ও নিরলস কর্মে । ভারতীয় মেয়েকে প্রকৃত অর্থে ভারতীয় করার জন্য তিনি জীবন দিয়েছেন । প্রাচ্যের ধ্যানশক্তি ও পাশ্চাত্যের কর্মশক্তি মিলিত হয়ে মেয়েদের চেতনায়— এও যাঁর অভীপ্সা ছিল, তাঁর সেই ভাবনাকে সার্থক করতে কি মেয়েরা আজ এগিয়ে আসবে না !

আশীর্বাণী

শ্রীসারদা মঠ
দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭০০ ০৭৬
ফোন : ৫৫৩-২৫৬৬/৩৪১১

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে । নিঃসন্দেহে এ এক বিশেষ আনন্দবার্তা, একটি বিদ্যালয়ের পক্ষেও মহাগৌরবের বিষয় ।

ভারতে নারীশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বামী বিবেকানন্দ মনেপ্রাণে অনুভব করতেন । তাঁর এই মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি নির্বাচন করেছিলেন নিবেদিতাকে । নিবেদিতাই সেদিন শিক্ষাদান কাজে যোগ্যতম এবং বিধিনির্দিষ্ট যন্ত্র হবার সৌভাগ্য লাভ করেন । স্বামীজী তাঁকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন : "স্বদেশের নারীগণের উন্নতিকল্পে আমার কতগুলি সংকল্প আছে । আমার মনে হয়, ঐগুলি কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার ।" গুরুগতপ্রাণ নিবেদিতা এই আদিষ্ট কর্মে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করলেন ।

১৩ নভেম্বর, ১৮৯৮ শ্রীশ্রীকালীপূজার পুণ্যদিনে ভগিনী নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়টির ঐতিহাসিক উদ্বোধন সম্পন্ন করেছিলেন জগজ্জননী শ্রীসারদা দেবী । বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শ্রীশ্রীমায়ের অমোঘ আশীর্বাণী বর্ষিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রীদের ওপর । শ্রীশ্রীমায়ের শুভাশীর্বাদ নিয়ে যে-বিদ্যালয়ের শুভারম্ভ তার উদ্দেশ্য শুধুই মেয়েদের শিক্ষার প্রসার নয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মূল শিক্ষাদর্শের মিলন ঘটানোও তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল । আগামী যুগের নারীর মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সঙ্কল্পের সঙ্গে মাতৃসুলভ কোমল হৃদয়বৃত্তির সমাবেশ চেয়েছিলেন নিবেদিতা ।

শতবর্ষ আগে যে-বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা নানা বাধাবিপত্তি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও নিজের বৈশিষ্ট্যে এতকাল অবিচলিত থেকেছে ।

নিবেদিতা শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে বলেছিলেন : "দৈনন্দিন কাজকর্ম, দুঃখবিপদকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা, উচ্চতম স্তরের ভালবাসা, সবরকম গণ্ডি অতিক্রম করা, মহত্তম কারণের জন্য অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া, জাতির ন্যায্য অধিকার রক্ষায় দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়ানো— এখানেই ভারতীয় নারীর সত্যকার মুক্তি ।" এদেশের মেয়েদের যথার্থ শিক্ষার প্রকাশ এই ভাবের বিকাশে ।

ভগিনী নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাদর্শ স্মরণে রেখে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে চলুক । শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী ও বিদ্যালয়ের কর্মযজ্ঞের প্রথম হোতা ভগিনী নিবেদিতার শুভাশীর্বাদ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, কর্মী ও ছাত্রী প্রত্যেকের ওপর সতত বর্ষিত হোক—এই আমার অন্তরের প্রার্থনা ।

ইতি—
শুভানুধ্যায়িনী
প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা
(মোক্ষপ্রাণা)
অধ্যক্ষা
শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

চয়ন

[প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা রচিত 'ভগিনী নিবেদিতা জীবনী গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

"যে যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও আধ্যাত্মিক শক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর লীলাবিগ্রহধারণ এবং ভারতাত্মার পূর্ণ প্রতীক রূপে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব, ভারতের পুনর্জাগরণের সেই গৌরবময় শুভ মুহূর্তে ভগিনী নিবেদিতার অভ্যুদয়ও সুপরিকল্পিত । ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে তাঁহার অবদানও অতুলনীয় । ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণসাধনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া গেলেন, তাহার কী অপূর্ব প্রকাশই না ভগিনী নিবেদিতার জীবনে দেখা গিয়াছে ! যুগপ্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র শিক্ষাকে স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র দুইটি সংক্ষিপ্ত শব্দে নির্দেশ করিয়া জগৎসমক্ষে স্থাপিত করিলেন, 'ত্যাগ ও সেবা' । আর ভগিনী নিবেদিতার জীবনে সেই ত্যাগ ও সেবা বাস্তবরূপ গ্রহণ করিল ।...

তিনি এমন ভাবময়ী ছিলেন যে, অনেকসময় তাঁহাকে দেখিয়া রক্তমাংসগঠিত দেহের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যাইতে হইত । কখনও তিনি লোকশিক্ষয়িত্রী, কখনও স্নেহবিগলিতা জননী, কখনও কর্তব্যৈকনিষ্ঠ মায়ামমতাবর্জিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মী, কখনও বিনীতা ছাত্রী, অথবা সেবিকা, আবার কখনও ভগবদ্ভাবে বিভোরা । বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ হইয়াছিল একই চরিত্রে— আর সব ভাবগুলি যেন তাঁহার জীবনে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল । তদানীন্তন বাংলাদেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীর মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না যিনি এই সম্পূর্ণ ভোগসুখবিরহিত, স্বার্থগন্ধশূন্য অনন্তভাবময়ীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হন নাই ।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনকালকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে । এই তিনটি পর্বের মধ্যে একটি চমৎকার পরম্পরা রহিয়াছে । প্রথম পর্ব— তাঁহার জন্মকাল হইতে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত । এই সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রের অনন্যসাধারণ গুণগুলির সম্যক বিকাশের সহিত প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল সংশয় ও অনিশ্চয়তা । একদিকের সংশয়ের তাড়নায় মানসিক অবসন্নতা ও হতাশা, আবার তাহারই সহিত অন্তরের অন্তস্তলে এক পরম আশ্বাস— যে মহা আহ্বানের জন্য তিনি প্রতীক্ষারত, তাহা একদিন তাঁহার সমগ্র সত্তাকে উদ্ভাসিত করিয়া এক ঊর্ধ্বস্তরে জাগ্রত করিবে । আমাদের অত্যন্ত পরিচিত সাধারণ জীবন তাঁহার জন্য নহে । স্বামী বিবেকানন্দের দৈববাণীর মাধ্যমে সেই প্রত্যাদেশ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ হইয়াছিল । তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর নিবেদিতার জীবনের যে দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয় তাহাকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিপর্ব বলা যাইতে পারে । স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা তিনি কতখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহার চিন্তারাজ্যে কতদূর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, নিবেদিতার স্বলিখিত পুস্তকগুলি তাহার অসংখ্য নিদর্শন বহন করিতেছে । তৃতীয় পর্বে তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবনের মহত্তর প্রকাশ । নীরব অনলস কর্মের মধ্য দিয়া প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আত্মবিসর্জন— ইহাই নিবেদিতার ব্রত । আর নিবেদিতা জানিতেন, 'ব্রতের উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই জীবনের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হওয়া নহে ।...

তাঁহাকে কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিতেন, 'আমি শিক্ষয়িত্রী' । সত্যই তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষয়িত্রী । জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার আদর্শ ও অভিলাষ ছিল শিক্ষাকার্যে আত্মনিয়োগ । শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌গণের চিন্তাধারা ও শিক্ষাপ্রণালীর সহিত পরিচয় এবং শিক্ষাকার্যে উহাদের যথাযথ প্রয়োগ তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ করিয়াছিল । তিনি বলিতেন, 'হায়, শিক্ষাই তো ভারতের সমস্যা । কেমন করে প্রকৃত শিক্ষা— জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, য়ুরোপের নিকৃষ্ট অনুকরণের পরিবর্তে, ভারতবর্ষের প্রকৃত সন্তানরূপে তোমাদের গঠন করতে পারা যায়, তাই সমস্যা । তোমাদের শিক্ষা হবে হৃদয়ের, আত্মার এবং মস্তিষ্কের উন্নতিসাধন । তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে, পরস্পরের মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগসূত্র-স্থাপন ।'...

আশ্চর্য এই যে, যখন এদেশের বহু শিক্ষিত, জ্ঞানী ব্যক্তি পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সমগ্র ভারতকে দেখিতে ও পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে ভারতীয় জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করিয়া উহার সংস্কার-সাধনে ব্যস্ত, নিবেদিতা তখন ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্রভাবে উহার কল্যাণ ও উন্নতির চেষ্টায় তৎপর । তিনি বলিতেন, 'আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি আমার যাত্রার আরম্ভ ভারতবর্ষে, আর ভারতবর্ষেই তার পরিসমাপ্তি ।

জয় বিশ্বনুতে

তারাপদ ভট্টাচার্য

নিজজন্মভুবং পরিহৃত্য মুদা
জগৃহে স্বগৃহং পরকীয়-ভুবি ।
পরিসেবিতুমার্তজনানিহ যা
শতশোঽথ নমামি নমামি হি তাম্ ॥

ক্ব নু নিঃস্বজনঃ ক্ব চ রোগকৃশঃ
ক্ব হি বর্ণপ্রবোধবিহীননরঃ ।
ভগিনী সরসেন করেণ খলু
কুরুতে স্ম যথোচিতমাত্মরতিঃ ॥

পৃথুভারতভূমিমবেক্ষ্য ভৃশং
বহুভারততত্ত্বমধীত্য ধিয়া ।
নিজজীবনযাপনমঞ্জুপথে
বিচকর্ষ মুহুর্জনসঙ্ঘমহো ॥

লিখনে কথনেঽমিতশক্তিমতি
জনশিক্ষণকর্মণি কৌশলিনি ।
অতিদুর্জয়চিত্তবলেন যুতে
জয় হে জয় হে জয় বিশ্বনুতে ॥

আর্তজনের সেবার জন্য আপন
জন্মভূমি ছেড়ে যিনি পরের দেশে
গৃহ-রচনা করেছিলেন, তাঁকে নমস্কার,
শত শত নমস্কার ।

কোথায় নিঃস্বজন ? কোথায় রোগজীর্ণ ?
কোথায় নিরক্ষর মানুষ ? আত্মানন্দে পূর্ণ
ভগিনী স্নিগ্ধ হাতে যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন
করেছেন ।

নিবিড়ভাবে বিশাল ভারতবর্ষকে দর্শন করে,
ভারতের বহু তত্ত্ব মনীষার বলে অধ্যয়ন করে,
বারবার তিনি জনসংঘকে আপন জীবনের
অনিন্দ্যসুন্দর পথে আকর্ষণ করেছেন ।

অয়ি বিশ্ববন্দিতা, লিখনে ও ভাষণে অমিত তোমার
শক্তি । লোকশিক্ষণে তোমার অপূর্ব কুশলতা ।
অতি দুর্জয় চিত্তবল তোমাকে আশ্রয় করেছিল ।
তোমার জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক ।

মানসী কন্যকা স্বামি-বিবেকানন্দ-লালিতা ।
করোতু শং সদাস্মাকং ভগিনী সা নিবেদিতা ॥

স্বামী বিবেকানন্দের পরিপালিতা মানসী কন্যা সেই
ভগিনী নিবেদিতা নিত্য আমাদের কল্যাণ করুন ।

ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাচিন্তা

প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা

[রামকৃষ্ণ সারদা মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ জয়ন্তীর অন্যতম অনুষ্ঠান 'শিক্ষকদিবস' পালিত হয় ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ । উদ্যোক্তারা ছিলেন বিদ্যালয়েরই শিক্ষিকাবৃন্দ । বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা ও অভিভাবকগণও সভায় অংশগ্রহণ করেন । বর্তমান প্রবন্ধটি ঐ উদ্দেশ্যে রচিত ।]

আজ ৫ সেপ্টেম্বর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর জন্মদিবস । এই দিনটি ভারতবর্ষে 'শিক্ষকদিবস' বলে স্বীকৃত । আজ শিক্ষকদের প্রণাম জানাবার শুভলগ্ন । অতীতে যাঁরা ভারতসন্তানদের প্রেরণা যুগিয়েছেন, এখনও যাঁরা সেই লক্ষ্যে নিবেদিত, ভবিষ্যতের ভারতসন্তানরা যাঁদের মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন— সেই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি আমার প্রণতি নিবেদন করি । এই সূত্রে মনে পড়ছে, ব্যক্তিগতজীবনে পাঠশালার যে-পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে 'হাতে খড়ি'-র পর পাঁচ বছর বয়সে পৌঁছেছিলাম, এবং তারও পরে স্কুলে পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একে একে যাঁদের শিক্ষাগুরুরূপে পেয়েছিলাম, সেইসব স্নেহশীল মানুষের কথা । কত পেয়েছি, তা পরিমাপ করার সাধ্য আজ নেই । তাঁদের সকলকেই আমার প্রণাম ।

বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষাদাত্রীরা আজ 'man-making education' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । 'মানুষ তৈরি করা'-ই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য— এ বিষয়ে সকলেই একমত । কিন্তু কোন্ মানুষ ? দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহংকার নিয়ে যে মানুষ তার শিক্ষার কথাই কি বলা হচ্ছে অথবা 'the whole man'-এর ? সে-ও তো আবার পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে ! গত চারশ বছরে পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিজ্ঞানীরা অনেকটাই এগিয়েছেন প্রাচ্যের অধ্যাত্মদর্শনের দিকে, কিন্তু এখনও রয়েছেন বহুদূরে ।

অতীত ভারত কি শিক্ষার মূল লক্ষ্যের কথা বহুদিন আগেই বলে যায়নি ? এখন আমরা 'man-making education'-এর কথা বলছি । সেই মানুষের সংজ্ঞা কী ? কোন্ সে মানুষ ? উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ১৮৮২-১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন— কাকে মানুষ বলি ? যার মান-হুঁশ হয়েছে । ইন্দ্রিয়াতীত, এমনকি মন-বুদ্ধি-অহংকারের পারে অধ্যাত্মসত্তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন । মুণ্ডক উপনিষদে উঠেছিল : 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'— কোন্ তথ্য সুবিদিত হলে, সমস্তই বিজ্ঞাত হয় ? আচার্য দিলেন : মানুষের জীবনে দুটি বিজ্ঞান জানার আছে । অপরা ও পরা বিদ্যা । অপরা বিদ্যা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নশ্বর জগৎ জ্ঞান, সুতরাং তা লৌকিক স্তরের । পরা বিদ্যা লোক বিদ্যা— যার দ্বারা অবিনশ্বর নিত্য বস্তুর অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ বা ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায় । ('অথ পরা— তদক্ষরমধিগম্যতে' ।) স্বস্বরূপকে জানাই তো শিক্ষার উদ্দেশ্য— শাস্ত্রে তাই উদাত্তস্বরে ঘোষণা : 'আত্মানং বিদ্ধি' এখানে আমরা দুই ধারার উল্লেখ পেলাম । একটি লাঠি দুভাগে দেখানোর মতো । এখানে water-tight par নেই । অপরা বিদ্যা সেই পরা বিদ্যার দিকে অ সোপানবিশেষ ।

যখন শুনি নিবেদিতা বলছেন : 'Education has a s তখন এই 'মান-হুঁশ' কথাটির ভিতরে নিহিত আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত শিক্ষাদানে তার অনিবার্যতার প্রসঙ্গ বিশেষ করে ধরতে পারি ।

ভারতে শিক্ষা ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত— 'Learning is integral part of religion.' আর এদেশে 'রিলিজিয়ন' বোঝায় পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা— ''Try to be pure and unselfish and that is the whole of religion'' রিলিজিয়ন-এর ভিত্তিভূমি হল : 'Truth, purity and ser

র্ম এমন এক ভাবাদর্শ যা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় রিণত করে । আপাতমানুষটিকে শিক্ষাদান করা নয়, শিক্ষার রিধির মধ্যে সেই আদর্শকে আনা চাই যা দেহের মধ্যে যে দেহী আছেন, জীবের মধ্যে যে শিব আছেন, তাঁকে প্রকাশ করে । তাতে স্পিরিচুয়্যালিটিকে বাদ দিয়ে, অধ্যাত্মতত্ত্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা শুধু যে ব্যর্থ হবে তা নয়, অন্তরাত্মার স্বরূপপ্রকাশে অন্তরায় হবে, সে শিক্ষা ছাত্র বা ছাত্রীর মনুষ্যত্ববিকাশের পথকেও অবরুদ্ধ করে দেবে । স্বামীজীর প্রার্থনা : "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমাকে মনুষ্যত্ব দাও, আমায় মানুষ কর ।" মানুষ হতে গেলে চাই চরিত্রগঠন— আর সেটাই শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, 'চরিত্রগঠন' হবে কতকগুলি স্থায়ী মূল্যবোধে'র দ্বারা শিক্ষার্থীর চরিত্রকে বিকশিত করার প্রচেষ্টা । সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য কখনও জীবিকা উপার্জন বা 'bread earning' হতে পারে না ।

১৮৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী ইংল্যান্ডে রয়েছেন । ১২ মে লন্ডনে 'এডুকেশন'-এর ওপর বক্তৃতা দিলেন । বিষয়টি তাঁর সুনির্বাচিত । মেরী লুইস বার্ক লিখেছেন, ওদেরই দেশে, ওদেরই সামনে দাঁড়িয়ে : "...enforcing ancient Hindu Principle without fear— without expecting favour he (Swami Vivekananda) dealt blow after blow." স্বামীজী বললেন— যে-শিক্ষক কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষাদান করেন, তিনি সত্যভ্রষ্ট হন— "The teacher who taught for money making was a traitor to the highest and deepest truth."

এখানেই শিক্ষাকে ধর্মের 'integral part' বা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে জোর দেওয়া হচ্ছে । কারণ শিক্ষা বা ধর্ম কোনটাই কেনাবেচার উপযোগী পণ্যবস্তু নয় । "Neither the one, nor the other can be bought or sold."

৯ জুন, ১৮৯৬ স্বামীজী তাঁর আরেকটি বক্তৃতায় আরও স্পষ্ট ভাষায় বলছেন : "The soul aim of the education system was man-making where cramming has no place." মুখস্থবিদ্যা বিদ্যা নয় । নিবেদিতাও 'bookish education'-এর বিরুদ্ধে বলতেন, শিক্ষা বোতলে ভরে ঔষধ খাওয়ানোর মতো দেওয়া যায় না । ছাত্রদের মস্তিষ্ক নানা তথ্যে ভরে গুদাম ঘর বানানো শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় । 'Reservoir of knowledge' ছাত্রের ভিতরেই রয়েছে, তাকে 'manifest' বা বিকশিত করাই শিক্ষকের দায়িত্ব ।

এটা ভারতে নূতন কথা নয়— তাই বলা হয় পিতামাতার ঋণ শ্রাদ্ধ করে, পিণ্ডদান করে বা বংশরক্ষা করে শোধ করা যায় । কিন্তু শিক্ষাগুরু বা দীক্ষাগুরুর ঋণ অপরিশোধ্য । এঁরা কোনও প্রতিদানের প্রত্যাশায় বিদ্যাদান বা ধর্মদান করেন না ।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কথা বলতে গেলে স্রষ্টা নিবেদিতার কথা এসেই পড়ে । এই বিদ্যালয়ের জন্য নিবেদিতা তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন । সরলাবালা সরকার 'নিবেদিতা বিদ্যালয় ও তাহার আদর্শ' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> "এমন একটি জিনিস সেই বিদ্যালয়ে ছিল যাহা অন্যত্র দুর্লভ । সেটি ছাত্রীদের উপর প্রতিষ্ঠাত্রীর একান্ত আন্তরিকতা ও ভালবাসা । সেই ভালবাসার আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া ভালবাসার পবিত্র আবহাওয়ায় দরিদ্র নিবেদিতা বিদ্যালয় আনন্দের নিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল । নিবেদিতা এই বিদ্যালয়ের জন্য প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছিলেন— ইহাই তাঁহার সাধনা ও জীবনের ব্রত ছিল । সে ব্রত লোকহিতসাধন নয়, পরোপকার করিবার ইচ্ছার ভিত্তিতে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নয়, প্রেমের ভিত্তিতে ইহার প্রতিষ্ঠা । নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন এবং পূজা করিতেন । তাঁহার মনোজগতে যে-ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আদর্শ সবসময়ই জাগ্রত থাকিত বাহিরের জগতের সহিত হয়ত অনেক সময় তাহার মিল হইত না, কিন্তু নিবেদিতা তাহাতে নিরাশ হইতেন না, তিনি জানিতেন, ভারত-রমণীর স্বভাবগত মাধুর্য, ঔদার্য, নিঃস্বার্থতা, সর্বভূতের উপর মাতৃত্বের ভাব এবং অতি সহজ ত্যাগশীলতা, এই গুণগুলি আজিও তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান আছে, সময়ের ও পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতায় কতকটা আচ্ছন্নভাবে আছে মাত্র । নিবেদিতা সেই শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা ভারতের কন্যাগণের এই মোহাচ্ছন্নতা কাটিয়া যাইবে, আবার তাঁহারা নিজের স্বাভাবিক মহিমায় প্রকাশ পাইবেন, ভারতবর্ষে আবার সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দময়ন্তী, মৈত্রেয়ী ও গার্গীর আবির্ভাব হইবে ।"

যাঁর হৃদয়ে শিক্ষার আলোক জাগ্রত হয়েছে, তাঁর কাছে শিক্ষা তখন বাইরে থেকে সংগ্রহ করা জ্ঞানমাত্র নয় । সেটি তখন তাঁর নিজেরই অন্তরের ভাব বা অনুভূতি । তখন তাঁর সমগ্র জীবনের ছোট-বড় প্রত্যেক কাজে, কথায়, চিন্তায়, জীবনের প্রতিমুহূর্তে শিক্ষার সাফল্যই পরিস্ফুট হয় । নিবেদিতা ভারতবর্ষের মেয়েদের মধ্যে এই ভাবের শিক্ষাকেই জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন । চেয়েছিলেন ভারতরমণী স্বকীয় ধ্যান-ধারণার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে উঠবে ।

আমরা যেন ভুলে না যাই, এদেশে নিবেদিতার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল— একদল শিক্ষয়িত্রী বা

শিক্ষাপ্রচারিকা বা preacher তৈরি করা— অল্পসময়ের জন্য শিক্ষাদান করা নয় । এটি মনে রাখলে শ্রীশ্রীমাকে দিয়ে এই বিদ্যালয়টির উদ্বোধনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় । শ্রীশ্রীমায়ের সুদীর্ঘ জীবনে আর কখনও তাঁকে এমন ভূমিকায় দেখা যায়নি । এই উদ্বোধনের ভিতর দিয়ে যেন প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য— সেতু প্রস্তুত হল ।

ইতিপূর্বেই বলেছি অপরা বিদ্যাকে পরা বিদ্যা থেকে বিচ্ছিন্নদৃষ্টিতে দেখা চলে না । পাঠশালা বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুরু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই ভারতবর্ষে শিক্ষকদের এক অনন্য দায়িত্ব— সসীম মানুষের অন্তরালে যে অসীম সত্তা আছে, ছাত্রছাত্রীকে সে বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা, ঐ বিষয়ে অনন্ত জিজ্ঞাসা ছাত্রের মনে জাগিয়ে দেওয়া । সেই জিজ্ঞাসু ছাত্র তখন উচ্চতর পরা বিদ্যার অন্বেষণে ব্যাকুল হয়, মুমুক্ষু হয় । তখন আসে ধর্মশিক্ষক বা অধ্যাত্ম-পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব ।

নিবেদিতার শিক্ষাচিন্তায় প্রধান স্থান পেয়েছিল জাতীয় শিক্ষা বা জাতিগঠনমূলক শিক্ষা । India- কে nation বলে ভাবার মতো দৃষ্টিকোণ তখনও তৈরি হয়নি । ব্রিটিশ নাগরিক, এই আইরিশ মহিলা ক্ষোভে দুঃখে আত্মহারা হয়ে যেতেন, কেমন করে এদেশের ছেলেরা পরাধীনতার গ্লানি এমন এক চরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে সহ্য করে । ভারতকে উঠতে হলে চাই স্বাধীনতা । আর স্বাধীনতা পেতে হলে চাই ত্যাগ ও সেবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া । জাতীয় শিক্ষার মূলকথা এই ত্যাগ ও সেবা— অপরের কথা আগে ভাবা । একজন গৃহস্থ তাঁর প্রতিবেশীর কথা আগে ভাববেন । নিবেদিতা আশা করতেন— বিদ্যার্থীরা শিক্ষার ভিতর দিয়ে স্বদেশ, স্বজন এবং স্বধর্মে উদ্দীপিত হবে ।

জাতীয় জীবনের আদর্শ ভারতবর্ষে পূর্ণ বিকশিত করতে হলে দুটি জিনিসের প্রয়োজন— প্রথম মাতৃভূমির প্রতি জ্বলন্ত প্রেম— যে প্রেম আত্মা থেকে অধিক, বিত্ত থেকে, পুত্র থেকে অধিক— এইরকম প্রেম । আমাদের মাতৃভূমি চিরদিন সব সম্প্রদায়কে, সব ধর্মকে নির্বিশেষে সমানভাবে আশ্রয় দিয়েছেন । সেই সর্বধাত্রী মাতৃভূমির প্রতি আমাদের অন্তরের সমস্ত ভক্তি, ভালবাসা নির্বিচারে ঢেলে দিতে হবে । তখন সেই জ্বলন্ত দেশপ্রেমই সম্প্রদায়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমস্ত ভারতবাসীকে এক করে তুলবে । 'Man making education' তখন হবে 'nation-making' । এখানে শিক্ষকের ভূমিকা অসাধারণ । কিন্তু এই ঐক্য ও সমন্বয়ের ভাবটিকে জাগ্রত রাখতে হলে চাই আত্মত্যাগ । শিশুকাল থেকে জননীই সন্তানকে এই আত্মত্যাগের প্রেরণা দিতে পারেন ।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতা 'বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউস' খুলেছেন । বোর্ডিং-এর ছেলেদের সিস্টার রোজ তাঁর ১৬ নং বোসপাড়া লেনে আসতে বলছেন । নিজেও যাচ্ছেন তাদের কাছে ।

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মাধ্যমে পেয়েছি প্রমথরঞ্জন পালের স্মৃতিকথা । প্রমথবাবু বলছেন, তিনি বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসের আবাসিক ছিলেন । "১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে একদিন সিস্টার আমাদের বলছেন, আজ আমি তোমাদের কিছু বলব । তোমাদের প্রথমেই জানতে হবে তোমাদের মহামাতাকে— তোমাদের মাতৃভূমিকে— মাতা ভারতবর্ষকে । তোমরা কোনও মতে নিজ মাতা ও দেশমাতার মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য বোধ করবে না । তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, দেশমাতাকে দর্শন কর, তাঁর পরিক্রমণ কর, তাঁর সন্তানদের জান— জান তাঁর ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রীতিনীতি ঐতিহ্য— এককথায় সম্পূর্ণ ইতিহাসকে । মাতার মতোই তাঁকে ভালবাস, শ্রদ্ধা কর, সেবা কর । বন্দে মাতরম্ ।

"ভগিনী 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করলেন সুস্পষ্ট সংস্কৃতে । তারপর নীরব হয়ে গেলেন । কিছু পরে বললেন, এই মহো... মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' এই পবিত্র বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করো, ... উপর ধ্যান করো ।" এই 'বন্দে মাতরম্' নিবেদিতা স্কুলের তখন প্রতিদিনের প্রার্থনায় উচ্চারিত হত । এমনকি যখন 'বন্দে মাতরম্' বিদেশী শাসকদের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়, তখনও নিবেদিতার বিদ্যালয়ে সে মন্ত্রের আবৃত্তি করত মেয়েরা । নিবেদিতা একদিন ভারতবর্ষের মানচিত্র এনে টাঙিয়ে দিলেন সেই বোর্ডিং হাউসের দেওয়ালে ... দিয়ে বললেন "তোমরা এখন এই যে দেওয়ালে টাঙানো মানচিত্র দেখছ— এ কেবল মুদ্রিত আকারের একখণ্ড কাগজ ... নয়, এ তোমাদের মাতার চিত্র । কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ... স্পন্দিত জীবন্ত অখণ্ড অস্তিত্ব ।... একটা কথা সবসময় ... রাখবে, যেখানেই যাও, যে-দেশেই যাও, ভারতমাতার মূর্তি ... মনে মলিন না হয় । তিনি যেন হৃদয়ে সতত বিরাজ করেন ।"

তিনি ভারতবর্ষ কথাটি উচ্চারণ করতে করতেই ভাবমগ্ন ... যেতেন । সে দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন, কেবল তাঁরাই উপলব্ধি ... পারবেন দেশপ্রেম কাকে বলে । তিনি চাইতেন, ছাত্রছাত্রী ... দেশের ইতিহাস, ভূগোল শিখুক— দেশভ্রমণ করে, কেবলমাত্র ... পড়ে নয় । Tourist-দের মতো উত্তেজনা ভরা hurricane ... বা ঝটিকা সফর-এর ভিতর দিয়ে নয়, দেশমাতার পরিক্রমা ... সাধকের মতো । উপাসকের মতো ভারতমাতাকে দর্শন ... অন্তরে তারা জপ করবে 'ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ... মা ।' যাঁরা তাঁর 'The Web of Indian Life' বা 'Footfalls of Indian History' বা 'Studies from an Eastern Home' পড়েছেন তাঁরা চমৎকৃত হতে বাধ্য । তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার ... নিবেদিতা ভারতের অপার মহিমা দেখে কিভাবে অভিভূত হতেন ...

নিবেদিতা কলকাতা পৌঁছবার পরে স্বামীজী উৎসুক হয়েছিলেন তাঁকে শ্রীমার পদপ্রান্তে উপস্থিত করতে । আমরা জানি ...

অনায়াসে মা তাকে আপন কন্যা জ্ঞানে গ্রহণ করেছিলেন । স্বামীজী চাইতেন শিক্ষাদানে নিযুক্ত হবার আগে নিবেদিতা পরিচিত হন অন্তঃপুরচারিণী ভারতীয় নারীদের সঙ্গে, অন্তরঙ্গ পরিবেশে । স্বামীজীর আগ্রহে গোলাপ-মা, যোগীন-মা, গৌরীমা, গোপালের মা— সকলের সঙ্গেই নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল । নিবেদিতা একদিন মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকায় কামারহাটি গিয়েছিলেন গোপালের মাকে দেখতে । তাঁরা গোপালের মাকে দর্শন করে ফিরে এলে স্বামীজী বলেছিলেন : "আহা, তোমরা প্রাচীন ভারতকে দেখে এসেছ— উপাসনা ও অশ্রুবর্ষণ, উপবাস ও রাত্রি জাগরণ— সে ভারত বিদায় নিচ্ছে ।" স্বামীজীর এই বাণী নিবেদিতার মনে গভীর রেখাপাত করে এবং তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর উপরেও তার অপরিসীম প্রভাব দেখা যায় । নিবেদিতার কাছে ভারত অখণ্ড, অবিভাজ্য । তার ইতিহাসও তাই । ভারতের কোনও খণ্ডিত অংশের ইতিহাস তাঁর মতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না— এই বিরাট উপমহাদেশ বিবিধ, বিচিত্র সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প— অনন্ত বৈচিত্র্য নিয়েও অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে অটুট । ঐতিহাসিক গবেষকদের কাছে এ এক মহা বিস্ময়ের বিষয় । নিবেদিতার শিক্ষাচিন্তাকে তাঁর ভারতচিন্তা থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয় ।

মাত্র একশ দুই বছর আগে ১৮৯৬-এর নভেম্বরে ইংল্যান্ডে এক সভায় স্বামীজী বজ্রনির্ঘোষে নিবেদিতার ভিতরের সিংহিনীকে জাগিয়ে তুলেছিলেন । তাঁর সেই উদাত্ত আহ্বান আজকের এই সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশে— তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছেন আজকের ছাত্রীরা, যাঁদের মধ্যে আছেন আগামী দিনের জননী ও শিক্ষয়িত্রী— তাঁদের সকলের উদ্দেশেই পূজার মন্ত্রের মতো সেই বাণী উচ্চারণ করে আজকের আলোচনা শেষ করব ।

স্বামীজী স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষে সকলকে আহ্বান করে বলেছিলেন : "প্রেমের সর্বগ্রাসী বহ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হয়ে যাঁদের জীবন জ্বলন্ত প্রেমমাত্র বলেই মনে হবে, এমন স্বার্থসম্পর্কমাত্র-শূন্য মানুষদেরই আজ প্রয়োজন । এই ভালবাসাই তোমাদের প্রতি কথাটিকে বজ্রতুল্য অমোঘ করবে । জাগো, জাগো মহাপ্রাণ । পৃথিবী দুঃখে ক্লেশে দগ্ধ হচ্ছে দেখেও কি তোমরা নিদ্রিত থাকবে ?"

স্বামীজীর এই জাগরণ মন্ত্রই আরও জোরালো ভাষায় শোনা গেছে বারবার : ''Arise, awake and stop not till the goal is reached.''

"ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত কিছুতেই তোমার যাত্রা থামিও না ।"

জেনারেল সেক্রেটারী, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ।

সেকালের নারীশিক্ষা ও নিবেদিতা বিদ্যালয়

চিত্রা দেব

"আমার স্বদেশের নারীদের জন্য কিছু পরিকল্পনা আছে। আমার মনে হয় সেগুলি সার্থক করতে তুমি আমাকে বিশেষ সাহায্য করতে পার"— লন্ডনের এক আলোচনা সভায় কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী একদিন বলেছিলেন মার্গারেট নোবলকে। পরে সে প্রসঙ্গ নিয়ে কোনও কথা না হলেও মার্গারেট এই বাক্যটিকে অবলম্বন করেই স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগের প্রভূত সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছিলেন। বছরখানেক পরে তিনি মনস্থির করলেন, ভারতে এসে সবকিছু চাক্ষুষ দেখবেন। তাঁর দৃঢ়সংকল্পের কথা জানতে পেরে স্বামীজী এবার তাঁকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে লিখলেন : "এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর— একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন।" একটু একটু করে পরিস্ফুট হল, এই 'প্রয়োজন' এদেশের নারীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য। প্রথমে বিস্মিত না হয়ে পারি না, যাঁর কাছে ভারতীয় নারীর আদর্শ শ্রীশ্রীমা, যিনি মহাকালী পাঠশালায় বালিকাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি দেখে মুগ্ধ হন, সেই স্বামীজী-ই অনুভব করেন, ভারতীয় নারীসমাজের জন্য প্রয়োজন মার্গারেট নোবলের মতো এক নারীর! তবে কি তিনি আমেরিকায় দেখা 'আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন' মহিলাদের আদলেই গড়তে চেয়েছিলেন এদেশের নারীদের? কিন্তু পরে বোঝা গেল, তাঁর প্রকৃত ইচ্ছা হল, নারীশিক্ষায় ভারতের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে পশ্চিমের কর্মশক্তি। তার আগে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন তিনি নিজে। প্রাচ্যের ভাবধারার সঙ্গে প্রতীচ্যের কর্মধারার মিলন ঘটাতে স্বয়ং গড়ে তুললেন মানসকন্যাকে। মার্গারেটের পুনর্জন্ম হল নিবেদিতার মধ্যে। এই নিবেদিতার হাতেই স্বামীজী তুলে দিলেন এদেশের নারীশিক্ষার ভার। বাগবাজারের অপরিসর গলিতে একটি অতিসাধারণ গৃহে অল্প কয়েকজন ছাত্রী সংগ্রহ ক… শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে … শিক্ষাকে জাগিয়ে তোলার কঠিন সাধনায় নিজেকে নিয়ো… করলেন ভগিনী নিবেদিতা। নারীর আত্মচেতনা বিকাশের … উপ্ত হল সেই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে। শতবর্ষ পরে সেই ছোট্ট বিদ্যা… যেমন বিশাল মহীরুহে পরিণত, এদেশের মেয়েদের ম… তেমনই আত্মসচেতন হবার প্রয়াস ক্রমবর্ধমান।

সেকালে অর্থাৎ একশ বছর আগে এদেশের নারীশিক্ষা … পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল, আজকের মেয়েদের দেখে তা বোঝার … নেই। যদিও আমরা জানি, নিবেদিতা তাঁর স্কুল খোলার … বছর আগেই এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার সূচনা হয় '… জুভেনাইল সোসাইটি'-র উদ্যোগে, ১৮১৯ খ্রীস্টা… গৌরীবাড়িতে। সেখানে ভর্তি করা হত জাতিধর্মনির্বিশেষে … মেয়েদের। মিশনারিদের উদ্যোগে শিক্ষা বলে স্বাভাবিকভা… তার সঙ্গে যুক্ত ছিল খ্রীস্টধর্মের প্রচার। অবশ্য কাগজে-… প্রমাণ না থাকলেও, ভারতে আগত প্রথম মিশনারি মহিলা … মার্শম্যান শ্রীরামপুরের মেয়েদের স্কুলের ভার নিয়েছিলেন … আগে এবং ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে চল্লিশটি বালিকা বিদ্যালয় … হয়। আরও পিছনে তাকালে দেখা যাবে মিসেস হেজ … খ্রীস্টাব্দে এদেশের খ্রীস্টান মেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছিলেন … তিনজন মহিলা পরবর্তী চল্লিশ বছরে তিনটি স্কুল খুলেছিলে… লেখাপড়া শেখানো ছাড়াও এই চারটি স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল … আগত ইংরেজ কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের বিবাহোপযোগী … তৈরি করা। এইসব কারণেই এদের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ … না। তবে নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে অস্বীকার করা চলে … আমাদের নারীশিক্ষা প্রথম থেকেই বিবাহকেন্দ্রিক বা '… ওরিয়েন্টেড'। ইংল্যান্ডে এই জাতীয় মনোভাব প্রাধান্য পেত …

সময়ে ; এদেশের নারীশিক্ষার শুরুতেও ছিল 'ভাল স্ত্রী' ও 'ভাল বধূ' হবার অলিখিত শর্ত । তবে মিশনারি স্কুলে মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার দিকটিও ভাবা হত । এই ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করেন মিস মেরি কুক । ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড ইটস ভিসিনিটি'র কাজ শুরু হয় । তিনি ভারতীয়দের সাহায্য পেয়েছিলেন । রাজা বৈদ্যনাথের স্ত্রীকে তিনি পড়াতেন । সেজন্য রাজা মাঝে মাঝে মিস কুকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসতেন ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের উৎসাহ দিতে, অর্থসাহায্যও করতেন । আর এক মুসলিম মহিলা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে মিস কুককে সাহায্য করতেন ও শ্যামবাজার অঞ্চলের বহু মুসলিম বালিকা তাঁর আগ্রহে ওই স্কুলে ভর্তি হয় । মিস কুকের শিক্ষা দেবার পদ্ধতির কথা কিছুটা জানা যায়, ৮ মার্চ, ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' থেকে :

> *"প্রথম কতকদিন পর্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করে এই কর্মে যত লাভ হয় তাহা তাহারদিগকে পারিতোষিকের মত দেওয়া যায় সেই লাভ দেখিয়া শিল্পকর্ম করিতে অনেকের লোভ জন্মিয়াছে তাহাতে ছয় পাঠশালাতে প্রায় এক হাজারখান গামছা কিনারা সিলাই হইতেছে এবং কোন কোন পাঠশালাতে মোজা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিনশত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে ।"*

এই সংবাদ থেকে আমাদের অনুমান, নিম্নবিত্ত পরিবারের বালিকারাই এই স্কুলগুলিতে আসত এবং পারিতোষিকের প্রলোভন তাদের মনে স্কুল সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিয়েছিল । কিন্তু যে পরিবারের মেয়েরা বাড়ি থেকে বেরোতেন না, তাঁদের সঙ্গে এ স্কুলগুলির কোনও সম্পর্ক ছিল না । মিশনারি মহিলারা সেজন্য অনেকের বাড়িতে গিয়ে লেখাপড়া শেখাতেন । নানা কারণে 'জেনানা মিশনের' প্রচেষ্টা সফল হয়নি, বিশেষ করে খ্রীস্টধর্ম শিক্ষা দেবার আগ্রহ হিন্দুদের মনে ক্রোধ সঞ্চার করে ।

অতএব মিশনারিদের পাশাপাশি শুরু হয় ভারতীয়দের চেষ্টা । উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনের শুরু থেকেই দেখা যায়, এদেশের মেয়েদের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ । ছোট-বড় নানাবিধ সামাজিক অত্যাচার ও অবিচারের পাকে পাকে নারীর জীবনবিকাশের পথ রুদ্ধ । শিক্ষিত হলে যেহেতু মানুষের মন কুসংস্কারমুক্ত এবং সবকিছু বিচার করে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে, সেইজন্যই মেয়েদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখা হত । সবকিছুকেই বলা হত মনুর বিধান । এমনও হতে পারে, বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে নারীদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণ দেখেই তাদের পুরুষের অধীনে নিয়ে আসার জন্য মনু কয়েকটি নির্দেশ জারি করেন । সেগুলিকে নিজেদের মনের মতো করে গুছিয়ে সমাজপতিরা নারীদের ঘিরে নানারকম নিষেধের বেড়াজাল তৈরি করেন । কিন্তু কোনও কারাগারই নিশ্ছিদ্র হতে পারে না । সমাজের কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশে, কোনও কোনও পরিবারের অন্তঃপুরে, বৈষ্ণবদের আখড়ায় সঙ্কীর্ণধারায় নারীশিক্ষা অব্যাহত ছিল । এদের ব্যতিক্রম হিসাবেই ধরা যেতে পারে । বিপুলসংখ্যক নারী ছিলেন অজ্ঞান ও অশিক্ষার কারাগারে নিরুপায়ভাবে বন্দিনী ।

উনিশ শতকের নবজাগরণ এক অর্থে নারীজাগরণেরও সূচনা করেছিল । কারণ উনিশ শতকে যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের শুরু, তার মূল কথাই ছিল নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া— স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার ও সামাজিক সংস্কারাদির পরিবর্তন । এই ব্যাপারটিকে বিভিন্ন মনীষী তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন । স্ত্রী-স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন অনেকে, যদিও তাঁদের মনে তখনও এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও ধারণা গড়ে ওঠেনি । পশ্চিমী শিক্ষা ও আদর্শ মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল অনেককে । স্বদেশের নারীর দুঃখ-দুর্দশার কথা মনে পড়েছিল তাঁদের । এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, তখন অধিকাংশ পুরুষের ধারণা ছিল, মেয়েরা বোধশক্তিহীন এবং তাদের লেখাপড়া শেখানো শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, অসম্ভব । রাজা রামমোহন রায় এমন মনোভাবের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন :

> *"বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ না করিতে পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়, আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ?"*

নারী সম্পর্কে পুরুষের বদ্ধ ধারণার উচ্ছেদ কিন্তু সহজে হয়নি । এদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষী নারীশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন । নারীর প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখকষ্ট ও সমস্যা নিয়েই তাঁরা চিন্তা করেছিলেন প্রথমে । কীভাবে মেয়েরা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন, সাংসারিক কাজকর্ম সুশৃঙ্খলে সারতে পারেন, হতে পারেন স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী, শিশুপালনে দক্ষতা দেখাতে পারেন— সে কথাই ভেবেছিলেন তাঁরা । নব্যশিক্ষিত যুবকরাও চাইতেন তাঁদের স্ত্রীরা শিক্ষিত হবেন । কিন্তু সমগ্র সমাজে কজন লেখাপড়া শিখত ? স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে রাধাকান্ত দেবের আগ্রহ ছিল, তবে তিনি ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পক্ষপাতী

ছিলেন না । মেয়েরা অন্তঃপুরে কিংবা প্রতিবেশী কারও বাড়িতে পড়াশোনা শিখবে, এই ছিল তাঁর নীতি । সমসাময়িক বহু ব্যক্তিই ছিলেন তাঁর পক্ষে । নারীশিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে বাদানুবাদ চলতেই থাকল । ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হবার একশ বছর আগে প্যারীচরণ সরকার বারাসাতে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নেন । এই স্কুলটি পরিদর্শন করতে গিয়ে জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ধর্মনিরপেক্ষ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রেরণা পান এবং বুদ্ধিজীবী বাঙালি ভদ্রলোকদের সাহায্যে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয় ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (বা বেথুন স্কুল) । দৃষ্টান্তস্থাপনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও আরও কয়েকজন তাঁদের বাড়ির মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করেন । কিন্তু মেয়েরা সেখানে বেশিদিন পড়তে যেতে পারত না । অধিকাংশ মেয়ের বিয়ে হত দশ-বারো বছর বয়সে এবং তখন থেকেই তারা গৃহবন্দী, কাজেই অন্তঃপুরশিক্ষার প্রয়োজন রয়েই গেল ।

কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজের আরও অনেকে সমবেতভাবে নারীশিক্ষার কথা চিন্তা করেছিলেন । যেমন, 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা'-র সাহায্যে মেয়েরা বিয়ের পর ঘরে বসে লেখাপড়া শিখত এবং বছরে দুবার করে বাড়িতে বন্ধ খামে প্রশ্ন পাঠিয়ে মেয়েদের পরীক্ষা নেওয়া হত । উমেশচন্দ্র দত্তের 'বামাবোধিনী সভা' ও 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৪) স্ত্রীশিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের লেখার ও মত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিল । তার ফলে জানা গিয়েছিল, মেয়েরা নিজেদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন কিনা কিংবা কী ভাবছেন । দেখা গিয়েছে এদেশের নারীপ্রগতি আন্দোলনের মুখপাত্রদের মতামতের সঙ্গে সদ্যশিক্ষিতারা অনেকক্ষেত্রেই একমত ছিলেন না । যেমন, আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধারেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুযায়ী নারীশিক্ষা চাননি, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 'বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা, হৃদয়প্রধান শিক্ষা নহে । অতএব এ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে ।' নব্যপন্থী শিবনাথ শাস্ত্রী যখন নারীর চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির জন্য তাদের জ্যামিতি, লজিক ও মেটাফিজিক্স পড়াতে চেয়েছিলেন তখন কেশবচন্দ্র সেন প্রশ্ন করেন : "এ সকল পড়াইয়া কি হইবে ?" নারীকে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করেননি এবং উপার্জনক্ষম করে তোলার কথা ছিল ভাবনারও অতীত । পাশাপাশি বামারচিত প্রবন্ধে দেখা যাচ্ছে :

> *"...যদি আপনারা নারীগণের উন্নতিতে আপনাদের উন্নতি নির্ভর করে ইহা বুঝিয়া থাকেন...যদি নারীগণকে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করিতে চান...তাহা হইলে এখনি স্ত্রীশিক্ষার সীমা নির্ধারিত করিয়া দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবেন না ।" (১২৯১ বঙ্গাব্দ)*
>
> *অপর একজন লিখছেন : "আমাদিগের সাধারণ পরীক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত না হওয়াতেও আমাদিগকে লেখাপড়া প্রথম উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া থাকিতে হইতেছে... আবশ্যকস্থলে ও উপযুক্তা হইলে স্ত্রীলোকেরা চাকরীই বা না করিবে কেন ?" (১২৮৩ বঙ্গাব্দ)*
>
> *এক সদ্যশিক্ষিতা লিখেছেন : "স্ত্রীলোকদিগকে সৎশিক্ষা কিরূপে দিতে হয়, এদেশীয় পুরুষ মহাশয়েরা ইহার কিছুই জ্ঞাত নহেন ।" (১২৯৬ বঙ্গাব্দ)*

যাঁরা মনে করেন, উনিশ শতকের নারী পুরুষ-নির্ধারিত মূল্যবোধের বাইরে যেতে পারেননি এবং তাঁদের চিন্তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ছিল না, তাঁরা নারীমনকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেননি ।

আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে এদেশের নারীশিক্ষা যথেষ্ট সফল হচ্ছিল না, সে কথা সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন স্বামীজী । অবশ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীরা পেয়েছিলেন উচ্চশিক্ষালাভের অধিকার, নিজের ইচ্ছামতো জীবিকাগ্রহণের সুযোগ ও আরও অনেককিছু । স্থাপিত হয়েছিল বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়, যা পরে যুক্ত হয়ে যায় বেথুন স্কুলের সঙ্গে, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, ইডেন স্কুল এবং হিন্দু বালিকাদের জন্য মহাকালী পাঠশালা । মিশনারি স্কুলও ছিল, তার মধ্যে লোরেটো কনভেন্ট, লা-মারটিনিয়ের, ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হত । এদেশের উচ্চশিক্ষিতা মহিলারা নারীশিক্ষার কাজেও এগিয়ে এসেছিলেন । বেথুন স্কুলের শিক্ষিকারা প্রায় সকলেই সেখানকার প্রাক্তন ছাত্রী । তবু স্বামীজী অনুভব করেছিলেন, ভারতীয় নারী, বিশেষ করে হিন্দু বালিকারা যথার্থ শিক্ষা পাচ্ছে না । অধিকাংশই রয়েছে অজ্ঞানতার অন্ধকারে । একই সঙ্গে অনুভব করেছিলেন, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজটি তাঁর নিজের পক্ষে করা সম্ভব নয়, কারণ "পুরুষ নারীর জন্য যাহা করিয়া দিতে পারে, তাহা অপেক্ষা নারী অনেক ভালভাবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে । পুরুষেরা মেয়েদের ভাগ্য গঠনের ভার গ্রহণ করাতে নারীজাতির যত কিছু অনিষ্ট হইয়াছে ।"— নিবেদিতার কাজ শুরু হল এই বিন্দু থেকে ।

প্রথমদিকে নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ স্বামীজীর কাছে উত্থাপন করতে চাইলে স্বামীজী তাঁকে উৎসাহ দেননি । কিন্তু পরে তিনি নিজেই সে প্রসঙ্গ তুললেন ও নিবেদিতা কী ভাবছেন তা জানতে চাইলেন । শিক্ষাবিদ্ হিসাবে নিবেদিতা জানতেন শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে ছাত্রীর বিদ্যা ও বুদ্ধির ওপর । তাই জানালেন, শিশু যেমন বানান করে পড়তে শেখে তিনি তেমনই করে নিজের কার্যপদ্ধতি ঠিক করে নেব । সেইসঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ে রামকৃষ্ণপূজা ও ধর্মভাবকে প্রাধান্য দিতে চাইলেন ।

সময়ে স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন : "কলিকাতায় নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়টি যেমন করে হোক খাড়া করে দিতে হবে ।" তাতে বোঝা যায়, স্বামীজী নিবেদিতার কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে রাজি না হলেও, স্কুল গড়ার কাজে প্রাথমিক সাহায্য করার কথা ভেবেছিলেন । বস্তুত, বাগবাজার পল্লীতে হিন্দু বালিকাদের স্কুলে পাঠানো হত না, কোনও হিন্দু পরিবারের মেয়েই স্কুলে যেত না । কাজেই বলরাম বসুর বাড়িতে একটি সভায় নিবেদিতা যখন তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রী চাইলেন তখন স্বামীজীর পরিচিত এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই তাঁদের কন্যাদের স্কুলে পাঠাতে রাজি হলেন, তা-ও স্বামীজীর প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ।

আপাতদৃষ্টিতে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর বাগবাজারের একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে নিবেদিতা-স্থাপিত ছোট্ট স্কুলটিকে কোনও ভাবেই বিশেষ কিছু বলে মনে হয় না । কোনও আড়ম্বর চাননি নিবেদিতা নিজেও । তখন শহরে ও গ্রামে মেয়েদের জন্য বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে । প্রথমপর্বে স্কুলটি ছিল একেবারেই ঘরোয়া, কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হত । মেয়েরা গল্প শুনে শুনে ভারতের ইতিহাস জানত, রঙ তুলি দিয়ে ছবি আঁকত, সেলাই শিখত । কিন্তু তাদের মনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করত নিবেদিতার ভালবাসা এবং তার ফলেই তাদের জীবনচর্যায় প্রভাববিস্তার করতে লাগল নিবেদিতার শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, স্বদেশের প্রতি ভালবাসা, আপন ঐতিহ্যের জন্য গর্ব । অর্থাৎ একই সঙ্গে নিবেদিতার স্কুলটি ছিল সাধারণ এবং অসাধারণ । সেকালে কোনও স্কুলেই এভাবে শিক্ষা দেওয়া হত না । স্বামীজী বলেছিলেন : "শিক্ষা বলিতে কতকগুলি তথ্য শেখা নহে, আমাদের বৃত্তিগুলির— শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে, অথবা বলা যাইতে পারে শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে চালিত হয় এবং সফল হয় ।" নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভারতীয় জাতির স্বাভাবিক মনোবৃত্তির ও মানসিক শক্তির উজ্জীবন । কাজটি খুব কঠিন তাতে সন্দেহ ছিল না । নিবেদিতার শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে নিজের শিক্ষাচিন্তার প্রকৃত কোনও তফাৎ খুঁজে না পেয়েও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও মৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্যকভাবে সুসঙ্গত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় তো জানি না ।" আসলে, এ কাজ সাধারণ শিক্ষকের নয়, প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে । স্বামীজীও অনুভব করেছিলেন, মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত আরও শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন । নিবেদিতার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হবে, যদি তিনি আরও শিক্ষয়িত্রী তৈরি করে নিতে না পারেন । কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিবেদিতার কাজ ছিল দুটি, ছাত্রীদের শিক্ষিত করে তোলা এবং অনুপ্রাণিত ছাত্রীদের মধ্যে থেকে তাঁর উত্তরসূরীদের খুঁজে নেওয়া । বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে হলেও দুটি ক্ষেত্রেই তিনি সফল হয়েছিলেন । প্রধানত অর্থাভাবে নিবেদিতাকে স্কুলের কাজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও আট মাস পরে বন্ধ করে দিতে হয় । কয়েক বছরের বিরতির পরে পুনরায় স্কুলের কাজ শুরু হয় ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের সরস্বতী পুজোর দিন থেকে, আরও নিশ্চিতভাবে বলা চলে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি থেকে । কারণ, এই সময় বক্তৃতা সফরের জন্য কয়েকমাস তাঁকে কলকাতার বাইরে থাকতে হয় ।

প্রথম থেকেই আর পাঁচটা স্কুলের চেয়ে আলাদা । নতুন বিদ্যালয় ভবনটি দেখলেও সেকথা মনে পড়ে । যদিও সেসময় নিবেদিতা লোকান্তরিতা কিন্তু তাঁর আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছিল সংশ্লিষ্ট সকলের মনে ।

নিবেদিতা বিদ্যালয় নামটি স্বামীজীরই দেওয়া, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে চিঠিতে তিনি এই নামটিই দিয়েছিলেন । যদিও নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল, নাম হবে 'রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস', বিদেশিরা একে বলতেন বিবেকানন্দ স্কুল । প্রতিবেশীরা স্বামীজীর চিঠির কথা না জেনেই বলত সিস্টার নিবেদিতার স্কুল । অতি সার্থক সেই নাম । রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী বাগবাজারবাসীদের তিনি বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই অতি সন্তর্পণে খুলেছিল হিন্দু অন্তঃপুরের দরজা । একটি-দুটি করে প্রথমে বালিকারা, পরে বালবিধবা ও বধূরাও এলেন নিবেদিতার স্কুলে । বাঙালি বিবাহিতা মেয়েদের স্কুলে আসার ঘটনা এই প্রথম । ইতিপূর্বে কোনও বাঙালি মেয়েকেই বিবাহের পরে লেখাপড়া শিখতে আসতে দেখা যেত না । এমনকি, ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরাও বিবাহের পরে সাধারণত স্কুলে বা কলেজে পড়া বন্ধ করতেন । ব্যতিক্রম হিসাবে একমাত্র কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া আর কারুরই নাম শোনা যায়নি । অথচ নিবেদিতার হিন্দু স্কুলে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে বিবাহিতা ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ষাটজন । বাংলাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেলাই শিখতেন, পরে অভিভাবকদের আগ্রহে মেয়েদের ইংরেজীও শেখানো হত ।

আগেই উল্লেখ করেছি, পশ্চিমের অনুকরণে এদেশের নারীশিক্ষাও অনেকাংশে ছিল বিবাহকেন্দ্রিক । কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা লক্ষ্য করেন, শিক্ষিত এবং কলেজে-পড়া ছেলেরা লেখাপড়া-জানা মেয়েকে বিবাহ করতে চায়, সেজন্য মেয়েকে কিছুটা লেখাপড়া শেখানো হত এবং মেয়ের বিবাহের পরে তার প্রয়োজন না থাকায় পড়া বন্ধ করা হত । নিবেদিতা কিন্তু এধরনের নারীশিক্ষার পক্ষে ছিলেন না । বরং তাঁর সমস্ত চেষ্টায় জল ঢেলে ছাত্রীদের বাল্যবিবাহের হাড়িকাঠে বলি দেওয়া হত বলে তাঁর খুবই দুঃখ ছিল । তিনি সযত্নে লক্ষ্য করেছিলেন, সব মেয়েই বিবাহ করতে ইচ্ছুক নয়, তাদের সামনে বিকল্প কোনও পথ না থাকায় তারা বাধ্য হয়ে বিবাহ করছে । একটি মেয়ে সম্পর্কে তিনি

লিখেছিলেন : "সে বিবাহ না করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প । তাহার বিশ্বাসভাজন কাহাকেও সে বলিয়াছে যে, বলপূর্বক বিবাহ দিলে সে আত্মহত্যা করিবে । তাহার তীক্ষ্ণ বিবেক, অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং যথেষ্ট সতেজ কাণ্ডজ্ঞান আছে । উচ্চভাব অতি সহজে ধরিতে পারে । বিবাহ হইতে তাহাকে রক্ষা করা উচিত ।" বলা বাহুল্য, তিনি মেয়েটির বিবাহ বন্ধ করতে পারেননি । এখানে আর একটি ছাত্রীর কথা বলা যেতে পারে । তিনিও উপরি-উক্ত গুণসম্পন্না ছিলেন । বিবাহ হলেও সংসার তাঁকে টানতে পারেনি । শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার উদ্যোগ শুরু হতেই তিনি গৃহত্যাগ করে চলে আসেন ওই বিদ্যালয়েরই শিক্ষয়িত্রী সুধীরাদেবীর কাছে । নিবেদিতা ঘটনাটিকে আমল দিতে চাননি । সীতা-সাবিত্রীর দেশে এ আদর্শ ভাল হবে কি না সে সংশয় তাঁর ছিল । কিন্তু বাধাও তিনি দেননি, কেননা, সব নারীর জন্য একই পথ, সে কথা স্বামীজীর মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন না । চমকপ্রদ ব্যাপার হল, নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সেই পলাতকা বালিকাই পরবর্তী কালে শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী । নিবেদিতা কীভাবে ছাত্রীদের গড়তেন তার নিদর্শন দু-একজনের স্মৃতিকথা থেকেও মেলে । তিনি তাদের বলতেন : "তোমরা সর্বদাই সোজা হয়ে বসবে; নীচু হয়ে কুঁজো হয়ে বা বেঁকেচুরে কখনও বসবে না ।" শুধু তাই নয়, মেরুদণ্ড সোজা রেখে কীভাবে বসতে হয়, প্রত্যেক ছাত্রীকে তিনি তা শেখাতেন । বাঙালি মেয়েকে ঋজু হয়ে দাঁড়াতে বা বসতে শেখানোও তো নতুন ঘটনা । মেয়েদের ইতিহাস ও অঙ্ক শেখাতেন নিবেদিতা । তাদের চরিত্র গঠনে সহায়ক কোনও ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিয়ে আলোচনা করতেন । বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হত শ্রীরামকৃষ্ণপূজার পর, শেষ হত গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে । হিন্দুনারীর ত্যাগ, ভক্তি, নিষ্ঠা, সেবাপরায়ণতা, সরলতা যেন মেয়েরা হারিয়ে না ফেলে সেদিকে নিবেদিতার দৃষ্টি ছিল । হয়তো সেজন্যই তিনি যখন স্থির করলেন, বিবাহিতা মেয়েদেরও শিক্ষা দেবেন তখন অভিভাবকদের তরফ থেকে আপত্তি ওঠেনি । ভগিনী ক্রিস্টিন বিবাহিতাদের ক্লাস নিতেন, প্রতিদিন দুপুর একটা থেকে চারটে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত তাঁরা স্কুলে থাকতেন । পড়ার সঙ্গে চলত শিল্পশিক্ষা, কখনও সেলাই, কখনও নরুণ দিয়ে ছাঁচ কাটা, ছবি আঁকা । ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ফুটে উঠত নিবেদিতার প্রতিটি কাজে— কখনও বালিকা ছাত্রীর কাছে শিখছেন পাত্র ছাড়াই অঞ্জলি ভরে জল পান করতে, কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন 'লাইন'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'রেখা' জানতে পেরে, কাগজে একটি আলপনা এঁকে উপহার দিলে সাজিয়ে রাখছেন সমাদরে— এই যে দেশীয় শিক্ষা, এ তো কৃত্রিম নয়, কাজেই ছাত্রীদের মনে তার প্রভাব অপরিসীম । অভাবী মেয়েদের দান-গ্রহণের গ্লানি থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের দিতেন কোনও না কোনও কাজ । লুপ্ত আত্মবিশ্বাস ও সুপ্ত মর্যাদাবোধ জেগে উঠে তাদের শিক্ষা দিত স্বাবলম্বী হতে ।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের এই শিক্ষাপদ্ধতি অন্যান্য মহিলাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল । সরলাদেবী (চৌধুরাণী) ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদে 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন'-এর অধিবেশনে দীর্ঘ ভাষণে জানান, ভারতে অন্তঃপুরশিক্ষা প্রয়োজন । গৌরীদান ও অবরোধপ্রথার জন্য মেয়েরা শিক্ষার আলো দেখতে পাচ্ছেন না এবং সেজন্য অবিলম্বে ভারতস্ত্রী মহামণ্ডল স্থাপিত হোক । সরলাদেবীর আগ্রহের নেপথ্যে নিবেদিতার আদর্শ কাজ করলে বিস্মিত হবার কিছু নেই । উভয়ের পূর্বপরিচয় ছিল এবং পরে দেখা গিয়েছে সরলাদেবী তাঁর প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের গীতার মর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছেন । প্রতিষ্ঠানের কলকাতার শাখাটি দেখতেন কৃষ্ণভাবিনী দাস । তিনি অন্তঃপুরিকাদের সাধারণশিক্ষার সঙ্গে শিল্পশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন । নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কি না জানা নেই, তবে তিনি সম্ভাব্যস্থলে মেয়েদের নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিতেন । জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী লাবণ্যপ্রভা নিবেদিতা বিদ্যালয় এবং ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । নিজের দেশ, দেশাচার ও ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ । আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলা বসু ছিলেন নিবেদিতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী । ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি শিক্ষালয়ের সেক্রেটারি হবার পরে সেখানে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কিছুটা প্রভাব চোখে পড়ে । শিশুশিক্ষার সূচনায় নিবেদিতা সেখানকার শিক্ষিকাদের কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু নির্দেশনা দেন । পরবর্তী কালে অবলা স্থাপন করেন বিদ্যাসাগর বাণীভবন— সেখানে অনাথা বিধবাদের স্বাবলম্বী হবার জন্য শিল্পশিক্ষা, শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল । তাছাড়াও তাঁর চেষ্টায় শিক্ষালয় থেকে পল্লীবালিকাদের জন্য অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয় । এদেশের নারীশিক্ষায় এগুলিকে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রভাবরূপে ধরে নেওয়া যায়, কারণ সেকালের নারীশিক্ষায় নিবেদিতা যোগ করেছিলেন নতুন মাত্রা । পরবর্তী কালের শিক্ষাচিন্তায় নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ভূমিকাটিও উজ্জ্বল । [illegible] গৌরব তার সূচনায়, নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের দুর্লভ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আজও তা অক্ষুণ্ণ ।

সুলেখিকা, বঙ্গসংস্কৃতি ও নারীজাগরণ বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচয়িত্রী ।

ভারতকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ— নিবেদিতা

কমল নন্দী

মহত্ত্ব

পৃথিবীতে মহত্ত্ব কোনও বিশেষ কাল, স্থান বা জাতির একচেটিয়া গুণ নয় । মহত্ত্ব বিকাশের সীমারেখা নেই । সতেজ, সংস্কারমুক্ত, স্বচ্ছ মন উপযুক্ত উপাদানের প্রাচুর্যে ও যথার্থ পরিচর্যায় মহৎ প্রাণে পরিণত হতে পারে । মহৎ প্রাণের বৈশিষ্ট্য হল : 'দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল' । তাঁরা সর্বস্ব দিয়ে ফকির হন, পৃথিবীর কাছে তাঁদের কণামাত্র প্রত্যাশা থাকে না । মহৎ ব্যক্তিরা কেবল দিয়েই যান, আগামী কালের সমাজকে ভাবনা-চিন্তায়, ধ্যান-ধারণায়, কর্মে ও জীবনে আর একটু সমৃদ্ধ করে তোলেন । তাঁদের প্রত্যাশা বর্তমানের কাছে নয়, ভাবী কালের নবীন প্রজন্মের কাছে । তাঁদের গভীর, মর্মভেদী দৃষ্টিতে বস্তুর বহিরঙ্গ ভেদ করে অন্তরঙ্গের স্বরূপ প্রকটিত হয় ।

আয়ার্ল্যান্ড-দুহিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের জীবনেও আমরা মহত্ত্বের এই বিশেষ গুণের প্রকাশ দেখি । এর আগেও ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে বা কোনও ভারতীয়ের চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে অনেক বিদেশী ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জন দিয়া (তাঁহারা) রিক্তহস্তে দেশে ফিরিয়াছেন । তাঁহারা শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন, সাধুচরিতে যাহা দেখিয়াছেন, সমস্ত দেশের দৈন্য ও অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পান নাই । তাঁহাদের যে ভক্তি সে মোহমাত্র, সে মোহ অন্ধকারেই টিকিয়া থাকে, আলোকে আসিলে মরিতে বিলম্ব করে না ।"

মিস মার্গারেট নোবল একমাত্র বিদেশিনী যিনি তাঁর আবাল্য প্রিয় জন্মভূমি, ইউরোপীয় আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, সংস্কার সবকিছু বিসর্জন দিয়েছিলেন ভারতবাসীর কল্যাণকামনায় পরিপূর্ণভাবে রূপান্তরিত একজন ভারতবাসী হিসেবেই । তাঁর সমগ্র ইউরোপীয় সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভারতীয়ত্ব প্রবেশ করেছিল, তিনি ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছিলেন ।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়

আইরিশকন্যা মিস মার্গারেট নোবলের ভারতের 'সেবিকা', 'বান্ধবী' ও 'লোকমাতা'য় রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল লন্ডনে, ১৮৯৫-এর নভেম্বর মাসে এক রবিবারের অপরাহ্ণে, ওয়েস্ট এন্ডের একটি ড্রইংরুমে । সেদিন আলোচনাকালে স্বামী বিবেকানন্দ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' তত্ত্বের অদ্বৈতানুসারী ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলছিলেন : "জগৎপ্রপঞ্চে সর্বরূপেই ব্রহ্মের প্রকাশ" ; "শরীর ও মন আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত", "আত্মজ্ঞানলাভের তিনটি মার্গ— কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান", "সকল ধর্মেরই একমাত্র শিক্ষা— ত্যাগ কর, ত্যাগ কর ।" আলোচনার মাঝে মাঝে তিনি 'শিব', 'শিব' বলে উঠছিলেন ; বিশ্বাস শব্দের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ-অনুভূতি শব্দটি স্বামীজী ব্যবহার করছিলেন । গৈরিক আলখাল্লা-পরিহিত, আয়তনয়ন, আত্মমগ্ন ভারতীয় যোগীর সেদিনের আলোচনা মার্গারেটের মনে গভীর রেখাপাত করে । স্বামী বিবেকানন্দের লন্ডনে প্রদত্ত আরও দুইটি বক্তৃতার (১৬ নভেম্বর ও ২৩ নভেম্বর, ১৮৯৫) সারাংশ মার্গারেট লিখে রেখেছিলেন । পরবর্তী কালে সেই কথাগুলি পড়তে পড়তে তিনি উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শ্রবণের আনন্দ অনুভব করতেন ।

স্বামীজী আমেরিকায় ফেরেন ২৭ নভেম্বর ১৮৯৫ ; নিউ ইয়র্ক থেকে আবার লন্ডনে প্রত্যাবর্তন পরের বছর ১৫ এপ্রিল । ভারতীয় যোগীর আলোচনা ও বক্তৃতার মধ্যে যে নতুন ভাবধারার

পরিচয় মার্গারেট পেয়েছিলেন, সেগুলি এই পাঁচ মাস ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধ্যানের সুযোগ তিনি পেলেন। সর্বোপরি, স্বামীজীর যুক্তিবিচারসমৃদ্ধ মৌলিক চিন্তাধারা, উদার ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও সঙ্কীর্ণতামুক্ত আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা মার্গারেটের মনে গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করেছিল।

১৮৯৬-এর মে মাসের প্রথম থেকে 'জ্ঞানযোগ'-এর ওপর স্বামীজী ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করেন; প্রতি রবিবারে পিকাডেলীতে 'Royal Institute of Painters in Water Colours' -এর গ্যালারিতে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন। জুন

মড স্টামের আঁকা নিবেদিতার ছবি

থেকে জুলাই মাসের গোড়া পর্যন্ত প্রতি রবিবারে 'Princess Hall'-এ ভক্তিযোগ, ত্যাগ ও প্রত্যক্ষ-অনুভূতি বিষয়েও বক্তৃতা দেন। মার্গারেট নোবল ছিলেন স্বামীজীর সকল বক্তৃতা ও আলোচনার নিয়মিত শ্রোতা। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি নির্বিচারে নির্দ্বিধায় স্বামীজীর সকল প্রতিপাদ্য বিষয়ই মেনে নিতেন। কিন্তু মার্গারেটের সংশয়, দ্বিধা, যুক্তির তীব্রতা, বিনা বিচারে সব কথা স্বীকার করে না নেওয়ার প্রবণতা স্বামীজীকে কখনও বিরক্ত করেনি। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী মার্গারেটকে একবার বলেছিলেন: "আমি দীর্ঘ ছয় বছর ধরে আমার গুরুদেবের সঙ্গে লড়াই করেছি, তার ফলে পথের খুঁটিনাটি সব নখদর্পণে। সুতরাং তুমি দুঃখ করো না যে তোমাকে বোঝাবার জন্য কাউকে বিলক্ষ কষ্ট পেতে হয়েছে।" স্বামীজী জানতেন, মার্গারেটের এই দ্বিধা, সংশয়, যুক্তির বেড়াজাল — সবকিছুরই মূল কারণ প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা। কোনও কিছু জানাকে বোধের স্তরে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজন নিরন্তর অনুধ্যান। যে কোনও নতুন ভাব, বিশেষত বিদেশী ভাবকে গ্রহণ করার প্রাথমিক শর্তই সেই ভাবের গভীর অনুচিন্তন।

আবাল্য খ্রীস্টীয় পরিবেশে লালিত-পালিত মার্গারেটের বদ্ধমূল ধারণা ছিল এবং সেটা স্বাভাবিকও বটে যে— 'পরোপকারই শ্রেষ্ঠ কর্ম।' স্বামীজী বললেন: "ধর্মদান ও জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ, তারপর বিদ্যাদান, দৈহিক বা জাগতিক দান সর্বনিম্ন।" মার্গারেটের দীর্ঘদিন লেগেছিল এই ভাবটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে। বিশুদ্ধ বায়ু আবশ্যক এবং পরিবেশ যেন স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়— নিবেদিতার মনে এই পাশ্চাত্যভাব দৃঢ়ভাবে প্রোথিত; স্বামীজী সেই ভাবের মূলে কুঠারাঘাত করে বললেন: "জগতের প্রতি উদাসীন হও।" দ্বিধাদীর্ণ মার্গারেট দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এ কী অভিনব চিন্তাধারা! যে সমস্ত অনন্যসাধারণ পুরুষ স্বকীয় মৌলিকতা, চিন্তার স্বচ্ছতা দিয়ে মানবসমাজকে চমৎকৃত করেছেন— মার্গারেটের তাঁদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা। স্বামীজী মার্গারেটের সেই শ্রদ্ধার ভিত্তিভূমিতেও নাড়া দিলেন। তিনি বললেন: "Spirituality cannot tolerate the world." অভিনব প্রাচ্য ধ্যান-ধারণার জোয়ারে মার্গারেটের আজন্ম-লালিত পাশ্চাত্য সংস্কার চুরমার হয়ে যাচ্ছে, ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে পড়ছে। প্রাচ্যের বৈদান্তিক ভাবধারায় অভিষিক্ত হয়ে মার্গারেটের নতুন জীবন শুরু হল।

পাশ্চাত্যের যুক্তিভিত্তিক, বিচারমূলক চিন্তনের প্রতিপাদ্য বস্তু হল জড়বাদ (Materialism), সংশয়বাদ (Scepticism), ভোগবাদ (Hedonism) ও অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism). জড়বাদীর মত হল—সেই অদ্বিতীয় বস্তুটি হল জড়। আর প্রাচ্যের ঋষিদের সাধনালব্ধ অনুভূতি হল— সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ সেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জড় নন, চৈতন্যময় এবং তিনিই একমাত্র সত্য ও শাশ্বত। কেবলমাত্র তিনিই মানবজীবনের একমাত্র উপাস্য। মার্গারেট এই দুই বিপরীত মেরুর ভাব-দর্শনের সমন্বয়ের পথ সন্ধান করছিলেন। কারণ তাঁর পক্ষে আবাল্য পরিপুষ্ট ভাবাদর্শের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ মোটেই সম্ভব নয় আবার নতুন দর্শনের আলোকে চিত্ত তাঁর আকুল; মনে হচ্ছে এই নতুন প্রাচ্য ধ্যান-ধারণা যেন অনেক গভীর ও শাশ্বত সত্যের ইঙ্গিতবহ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই মেরুর ভাবাদর্শের সেতুবন্ধনের সন্ধান তিনি পেলেন স্বামীজীর ধ্যান-ধারণা ও উপলব্ধিতে।

স্বামীজীর ধারণায়— মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ। মানবজীবনের অগ্রগতি মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে নয়, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে— এইভাবে মানুষ পরম সত্যে

আভাস পায় । স্বামীজীর এই ধারণার মধ্যে বিপরীতমুখী দুই প্রান্তীয় আদর্শের যেন সমন্বয় ঘটেছে ।

'মায়া' সম্বন্ধেও মার্গারেটের ধারণা পরিস্ফুট হল ধীরে ধীরে । তিনি বুঝলেন— চকিতের জন্য প্রকাশমান, এই আছে এই নেই, অসম ইন্দ্রিয়জগতের পিছনে ক্রমাগত উন্মাদের ন্যায় ছুটে চলা— যাতে চরম নিশ্চয়তাও নেই, তৃপ্তিও নেই, পরম আশ্রয়ও নেই— এরই নাম মায়া । আর এই সবকিছুর মধ্যে ওতপ্রোত যে সর্বোত্তম সত্য, তিনিই মায়াধীশ, মহেশ্বর ।

'বৈদান্তিক সর্বজনীনতা ও ঔদার্য'— মার্গারেটের মনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল । তিনি বুঝেছিলেন— প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী বৈদান্তিক দর্শনে আশ্রয় পেতে পারেন । ঔপনিষদিক ঔদার্য বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে উচ্চারিত সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত । এইপ্রকারে তাঁকে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের সন্ধান দিলেন স্বামীজী ।

নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বামীজীর ভাবনা-চিন্তার অনুধ্যান ও অনুচিন্তনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মার্গারেট পরাধীন দেশ ভারতবর্ষের দুঃখমোচনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, অন্তরের সমগ্র অনুভূতি ও প্রেম উদ্বেলিত হয়ে উঠল ভারতবাসীর জন্য ।

রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায় 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে তা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে : "আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিনযাপন করিয়াছেন— ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই-সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যাভঙ্গ হয় নাই— তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না । মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ।" ধীরে ধীরে ভারতের 'সেবিকা, বান্ধবী, মাতা' এইভাবে গড়ে উঠছিলেন ।

৭ জুন ১৮৯৬, স্বামীজী মার্গারেটকে একটি চিঠিতে লিখলেন :

প্রিয় মিস নোবল,

আমার আদর্শকে বস্তুত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতে পারে— মানুষের নিকট তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতিকার্যে সেই দেবত্ববিকাশের পন্থা নির্ধারণ ।...যাঁহারা জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বরেণ্য 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়'— তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে । অনন্ত প্রেম ও করুণায় পূর্ণ শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন ।...

হে মহাপ্রাণ, ওঠ জাগো । জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে ? এস আমরা আহ্বান করিতে থাকি— যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত না হন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের দেবতা বাহিরের আহ্বানে সাড়া না দেন । জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় আর কী আছে ? ইহা অপেক্ষা আর কোন্ কাজ মহত্তর ।... আমি কোন পরিকল্পনা করি না । কাজ শুরু করিলে কার্যপ্রণালী আপনি গড়িয়া ওঠে । আমি শুধু বলি— জাগো, জাগো ।...

পত্র পড়ে মার্গারেট স্তব্ধ, অভিভূত । ধর্মের নামে, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের নামে, বিশ্ববাসীর কল্যাণকামনায় স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বানে মার্গারেটের সমগ্র সত্তা একান্তভাবে সাড়া দিল । তাঁর ভিতরকার মহাপ্রাণ সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত বাধাবন্ধন উপেক্ষা করে ত্যাগ, প্রেম ও করুণার মূর্তিমানবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের কাজে আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্পে দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হল ।

এই দিনগুলির কথা স্মরণ করে ২৬ জুলাই ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে (স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের দু'বছর পর) একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন :

"মনে কর সেসময়ে যদি স্বামীজী লন্ডনে না আসতেন ! জীবনটা নিরর্থক হয়ে যেত । কারণ আমি সর্বদাই জানতাম আমি এক মহান সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় আছি । সবসময়ে বলে এসেছি একটা আহ্বান আসবে ; আর সত্যই সে আহ্বান এল ।"

মার্গারেটের নিবেদিতায় রূপান্তরের ভিত্তিভূমিটি রচিত হয়েছিল স্বামীজীর লন্ডনে থাকার সময়েই । ভারতীয় ভাবাদর্শের ব্যাখ্যা, পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সংঘাতের উদার বিশ্লেষণ, সর্বোপরি মার্গারেটের ব্যক্তিত্ব ও মৌলিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে স্বামীজী তাঁর মানসকন্যাকে গড়ে তুলেছিলেন । তা না হলে মার্গারেটকে নিবেদিতায় রূপান্তরের কাজটি কঠিন হত ।

ভারতে আগমন

২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৮ তারিখে মম্বাসা জাহাজে মার্গারেট নোবল কলকাতা বন্দরে পৌছলেন । জেটিতে স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেটকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । মার্গারেট পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী চৌরঙ্গীর একটি হোটেলে উঠলেন । এদেশে কাজের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ে মার্গারেটের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন ছিল । প্রথমত বাংলা ভাষা শেখা, দ্বিতীয়টি হল এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন । স্বামীজী তার যথোপযুক্ত আয়োজন করেছিলেন ।

ওই বছরে মার্চ মাসের মধ্যে মার্গারেটের জীবনে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল, তার মধ্যে দুটি ঘটনা চিরস্মরণীয় । প্রথমটি ১৭ মার্চ— মার্গারেটের জীবনে 'day of days.' দিনটি ছিল সেন্ট প্যাট্রিকের জন্মদিন । সংঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে সেদিন তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ।

সাক্ষাতের পাঁচদিন পরেই মার্গারেট ২২ মার্চ ১৮৯৮ তারিখের চিঠিতে মায়ের সম্বন্ধে লিখছেন : "তিনি অনাড়ম্বর, সহজতম

সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী ।" পাঁচ বছর পরে ২ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ তারিখের চিঠিতে মিসেস র‍্যাটক্লিফকে (স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক এস. কে. র‍্যাটক্লিফের স্ত্রী) লিখেছেন : "খুব সাদাসিধে হিন্দুরমণী, তবু আমার ধারণায় (তিনি) বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী ।" শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎ ১২ মে ১৯১১ । দীর্ঘ ১৩ বছরের পরিচয় ও সান্নিধ্য । কলকাতায় পদার্পণের পর শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্য মার্গারেটের জীবনের পরম সম্পদ । শ্রীশ্রীমাকে সেইসময়ে কাছে না পেলে মার্গারেট এই ভারতভূমিতে আমৃত্যু থাকতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে । শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে ভারতের নারীজাতির আদর্শকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন । 'জগৎ আলোড়নকারী শক্তি'র আধার মার্গারেটকে স্বয়ং স্বামীজী পরমা মাতৃমূর্তির পদতলে অর্পণ করলেন । 'হোলি মাদার' তাঁর 'চিরদিনের খুকি'র প্রতি পরম স্নেহের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা মিশিয়ে বলতেন : "আমার প্রাণের সরস্বতী,... যেন দেবী ।" মায়ের এই অকৃত্রিম স্নেহ নিবেদিতার একক জীবনে ফল্গুধারার মতো প্রবহমান ছিল ।

মার্গারেটের নিবেদিতায় রূপান্তর

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল ২৫ মার্চ । ওই দিনটি ছিল—' The day of Annunciation'— যেদিন দেবদূত ঈশাজননী মেরীকে জানান যে তাঁর গর্ভে ভগবান জন্মলাভ করবেন । মার্গারেটকে দিয়ে স্বামীজী সংক্ষেপে শিবপূজা করালেন । তারপর ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষান্তে ওই দিন তার নাম দিলেন নিবেদিতা ।

কলকাতার বাগবাজারপল্লীতে তিনি স্থায়িভাবে বাস করতে লাগলেন কিন্তু তাঁর সমগ্র চেতনা জুড়ে রইল আসমুদ্রহিমাচল ভারতের কল্যাণ, ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি । ভারতসন্তানদের হৃদয়ে শৌর্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা জাগাতে নিবেদিতা নিজেকে করে তুলেছিলেন 'স্বামীজীর বজ্র' । নিবেদিতার কর্মকাণ্ডের মূল শাখাগুলি হল : ১) নারীশিক্ষা ২) জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ৩) যুবসংগঠন ও সেবা ৪) জাতীয় শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানসাধনায় অনুপ্রেরণা দান ।

নারীশিক্ষা

১২ নভেম্বর, ১৮৯৮-এ বাগবাজারে বলরাম বসুর ভবনে একটি বিশেষ সভার আয়োজন হয় । সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং স্বামীজী এবং কয়েকজন বিশিষ্ট গৃহী ভক্ত । ভগিনী নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ে ভক্তপরিবারের মেয়েরা যাতে ছাত্রীরূপে যোগদান করে তার জন্য স্বামীজী নিজেই আবেদন জানান । স্বামীজীর আগ্রহাতিশয্যে নিবেদিতাও অনুপ্রাণিত হন ।

পরদিন ১৩ নভেম্বর, রবিবার শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন গোলাপ-মা ও যোগীন-মাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীমা প্রতিষ্ঠাকালীন পূজাদি সম্পন্ন করতে উপস্থিত হলেন বলরামভবন থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের স্বামীজী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এলেন । পূজান্তে শ্রীশ্রীমা কালের ছাত্রীদের উদ্দেশে বললেন : "আমি প্রার্থনা করছি, এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে শ্রীশ্রীমায়ের এই আশীর্বাণী শুনে নিবেদিতার হৃদয়, মন উঠেছিল । তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "ভবিষ্যতের শিক্ষিতা নারীজাতির পক্ষে শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোনও শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করতে পারি না ।"

১৪ নভেম্বর স্কুলের কাজ আরম্ভ হল । স্বামীজী ঐদিন ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন । পল্লীর কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে স্কুলের পত্তন ।

নিবেদিতা কেবলমাত্র পল্লীর কিশোরীদের শিক্ষাদানেই ছিলেন, তা নয় । স্বামীজী তাঁকে বেলুড় মঠের নবদীক্ষিত শিক্ষা দেওয়ার কাজেও নিযুক্ত করেন । নিবেদিতা প্রতি তাঁদের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা এবং শুক্রবার শারীরবৃত্ত দিতেন । তাছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মসমাজে 'শিক্ষা' বক্তৃতা দিতেন এবং প্রতি শনিবার সকালে 'শিক্ষক-শিক্ষণ' আরম্ভ করেন । রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, কেশবচন্দ্র সেনের দুই কন্যা— সুনীতি ও সুচারুদেবী, জগদীশ বসুর ভগ্নী লাবণ্যপ্রভা বসু, 'ভারতী' সম্পাদিকা সরলা প্রভৃতি শিক্ষিতা ব্রাহ্মমহিলারা নিবেদিতার ওই ক্লাসে থাকতেন ।

এরপর নিবেদিতা বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করেছেন পল্লীবাসীদের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে উঠেছেন । সবেমাত্র খেতে বসেছেন, এমন সময় পল্লীর একটি ছোট মৃত্যুর খবর এল । খাওয়া ছেড়ে তক্ষুণি দৌড়ে গেলেন বাড়ি । শোকাকুলা মায়ের মাথাটি নিজের কোলে নিয়ে করলেন তাঁকে । কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে মহিলাটি শোকাবেগে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন : "আমার মেয়ে কোথায় নিবেদিতা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতে লাগলেন : "চুপ ; তোমার মেয়ে এখন মা কালীর কাছে ।" মেয়েটির মা হলেন । ভারতীয় সংস্কৃতির কী অনায়াস আত্মীকরণ ! মা 'কাল-নৃত্য' যেন তিনি সত্য সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন । তাঁরই চিদাকাশে 'মাতৃরূপা' আবির্ভূতা হয়েছিলেন ।

হতাশা, অর্থাভাব, ভবিষ্যৎ আশঙ্কা, সর্বোপরি হিন্দুপরিবার থেকে মেয়েদের স্কুলে নিয়ে এসে শেখানোর মতো কঠিন কাজ, সব মিলিয়ে নিবেদিতাকে

মাঝে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চেয়েছে । কিন্তু তিনি আপন প্রেমময় সত্তা দিয়ে অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরকে দেখে সবকিছু সহ্য করেছেন । সবচেয়ে দুঃখ পেতেন, যখন দেখতেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটি কিশোরীকে হয়তো মনোমত করে গড়ে তুলেছেন— এমন সময় হঠাৎ সেই ছাত্রীটির বিয়ে হয়ে গেল । হারিয়ে গেল তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়েপিঠে তৈরি করা একটি অস্ফুট সম্ভাবনা ।

তিনি মন দিলেন একদল আদর্শ শিক্ষয়িত্রী গঠন করতে, যাঁরা দেশে অশিক্ষা দূরীকরণে জীবনযাপন করতে পারেন । কিন্তু নিদারুণ অর্থাভাব তাঁর দুর্দম গতিকে পদে পদে ব্যাহত করছিল ।

অবশেষে ২০ জুন ১৮৯৯ 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা ভারতভূমি ত্যাগ করলেন । স্থির হল, নিবেদিতা তাঁর স্কুলের জন্য ওই দেশে অর্থসংগ্রহ করবেন ।

আমেরিকা ও ইংল্যান্ড পরিভ্রমণ করে এবং তাঁর ভারতবর্ষীয় কর্মপরিকল্পনা সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে নিবেদিতা দুটি কাজ সমাধা করলেন । একটি হল, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা বিদেশে সর্বত্র প্রচলিত ছিল তার পরিবর্তন এবং অপরটি, ভারতে নারীশিক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহ । যা সংগ্রহ হল তাই নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ । পদার্পণ করলেন মাদ্রাজে । অভ্যর্থনা ও তার উত্তরে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার পর ফিরলেন কলকাতায় । সেই বছর সরস্বতীপূজার দিন আবার মেয়েদের স্কুল চালু হল । নানা ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সেই শিশু বটবৃক্ষটি আজ মহীরুহে পরিণত । রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে এখন সহস্রাধিক ছাত্রী পড়াশোনা করে । বর্তমানে কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয় হিসাবে সর্বত্র এর পরিচিতি । নারীশিক্ষার যে হোমাগ্নি ভগিনী নিবেদিতা প্রজ্বলিত করেছিলেন, আজ তা সহস্রশীর্ষ হয়ে সমাজের বহু অনালোকিত অঞ্চল আলোকিত করছে ।

নিবেদিতা একদিন তাঁর স্কুলের মেয়েদের জ্যামিতি পড়াতে পড়াতে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : "আমার মেয়েরা ! তোমরা লাইন (line) বলিতেছ কেন ? Line কথাটি তো ইংরেজী, ইহার কি কোনও বাংলা শব্দ নাই ?" যখন একজন ছাত্রী বলে উঠল : "আছে দিদি । লাইনের বাংলা হল রেখা ।" উত্তর শুনে নিবেদিতার মুখে কী আনন্দের দীপ্তি ! নিবেদিতা তাঁর মাতৃভাষার স্থানটুকুও বাংলা ভাষা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন । এ এক অসাধারণ আত্মবিলোপ । পরদেশকে ভালবাসার এক অনন্য উদাহরণ ।

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর মেয়েকে ইংরেজী শেখাবার জন্য নিবেদিতাকে অনুরোধ করেছিলেন, তখনও নিবেদিতার একই মত । শিশুদের পক্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানই সর্বোত্তম— এই কথাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন ।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

নিবেদিতা জানতেন, কোনও জাতির সামগ্রিক কল্যাণের প্রাক্ ও প্রাথমিক শর্ত তার স্বাধীনতা । স্বাধীনতার তাগিদ তাই তাঁর কাছে সর্বপ্রথম । এবারে নিবেদিতা ফেরার পর তাঁর ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে দেশের তদানীন্তন বিশিষ্ট নেতাদের যাতায়াত শুরু হয়েছিল । রমেশচন্দ্র দত্ত, মহামতি গোখলে, আবদুর রহমান, আনন্দমোহন বসু, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার আদান-প্রদান হয় ।

স্বামীজী স্বয়ং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্থির করেছিলেন— 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' । রাজনীতির সঙ্গে মিশনের কোনও সম্পর্ক নেই । কিন্তু নিবেদিতা দ্বিতীয়বার ভারতে পদার্পণের পর এবং বিশেষ করে স্বামীজীর দেহান্তের পর নানাভাবে রাজনৈতিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছিলেন । তার ফলে মানবজাতির আধ্যাত্মিক কল্যাণ যে সংঘের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য, সেই অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার যোগাযোগ ছিন্ন হওয়া অবধারিত হয়ে উঠল । স্বামীজীর দুই গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পরও নিবেদিতা নিজে যা সত্য বলে বুঝেছেন তা থেকে বিরত হতে পারলেন না । ১৮ জুলাই ১৯০২ তারিখে মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্রের উত্তরে লিখিতভাবে নিবেদিতা জানালেন : "ব্যাপারটি বেদনাদায়ক, তথাপি আমার পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যে কোনও ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহাতে আমার সম্মতি আছে ।" নিবেদিতা আর রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী রইলেন না— তবু রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ শিথিল হল না । চিঠিপত্রে নিজের পরিচয় লিখতেন : 'Nivedita of Ramakrishna Vivekananda.'

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার ফলে তিনি ধীরে ধীরে ভারতের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে পরিচিত হয়ে উঠলেন । ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে । কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী সকল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল । যে দেশকে তিনি নিজের মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করেছেন, সেই দেশের পরাধীনতা ও নিপীড়ন তাঁর সংবেদনশীল মনকে পীড়া দিত । সেই কারণে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না । সাহিত্যিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিটি প্রাসঙ্গিক । তিনি লিখছেন : "...তিনি (নিবেদিতা) ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়াসী ছিলেন ।" ভারতের যুবশক্তিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । সেই ধারা থেকে নিবেদিতা বিচলিত হননি । কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের ইন্ধন জুগিয়েছিলেন— এই ধারণা সত্য নয় । কারণ 'হোম রুল

আন্দোলন'-এ যোগ দেওয়ার জন্য অ্যানী বেশান্তকে একবছর অন্তরীণ থাকতে হয় অথচ সেই একই ব্রিটিশ সরকার ভগিনী নিবেদিতাকে বিপজ্জনক ভেবেও শাস্তি দেয়নি । এই আচরণই প্রমাণ করে যে, নিবেদিতার কার্যকলাপ সেই পরিমাণে সরকার-বিরোধী বলে গণ্য হয়নি । নবীন যুবকদের ও বিপ্লবীদের মনে গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত করা আর প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র বিপ্লবে জড়িত থাকা সমার্থক নয় । ভগিনী নিবেদিতা মানবকল্যাণমুখী বহু গঠনশীল পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যার ব্রত ছিল 'জাতির গঠন' । 'ধ্বংস' নয় । বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে যে কল্যাণীশক্তি লুকিয়ে ছিল তাকে রক্ষা করবার জন্যই তাঁকে চন্দননগরে পাঠানোর পরিকল্পনা । ডন সোসাইটি ও অনুশীলন সমিতিতে যাতায়াত ছিল ভগিনী নিবেদিতার । এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের বিপ্লবীদের জীবনী, মতবাদ, পন্থা ও বিভিন্ন বিপ্লবের ইতিহাস সম্পর্কিত বইও তিনি সংগ্রহ করে বিপ্লবীদের পড়াতেন । স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কট আন্দোলনে এবং তার পূর্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতি তদানীন্তন মনীষিবৃন্দের সকলেরই উৎসাহ, প্রেরণা ও সমর্থন ছিল । যিনি যেভাবে সক্ষম, সেইভাবে এইসব আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করেছেন ; নিবেদিতাও দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত হয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন ।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পুস্তকে (Sri Aurobindo on Himself) এক স্থানে বলেছেন : "বাংলার বিপ্লবদলগুলিকে সুসংবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন ও রাজনৈতিক নেতা প্রখ্যাত ব্যারিস্টার পি. মিত্রের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করেন । ঐ পরিষদের পাঁচজন সদস্যের মধ্যে নিবেদিতা ছিলেন অন্যতমা ।" কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় চলে গেলে এ পরিষদটি ভেঙ্গে যায় ।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে দোলপূর্ণিমার দিন কলকাতায় প্রথম অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয় । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যারিস্টার পি. মিত্র প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা সমিতিতে নিয়মিত আসতেন । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশাত্মবোধক গান গেয়ে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন । নিবেদিতাও সমিতির সদস্যদের ক্লাস নিতেন । এমনকি স্বামী সারদানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিত আসতেন ও সংযম শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য পালন ও চরিত্রগঠনের উপায় নির্দেশ করতেন । সেইকালে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে দেশবাসীর, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল । বিদেশিনী নিবেদিতার উৎসাহ ও আন্তরিকতা তাতে প্রভূত প্রেরণা সঞ্চার করে । ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে পাটনায় বক্তৃতাকালে যুবকবৃন্দের উদ্দেশে নিবেদিতা বলেছিলেন : "...আমাদের প্রয়োজন শক্তিশালী যুবকবৃন্দের ।... দেশের কল্যাণ যেন তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হয় । সর্বদা স্মরণ রাখিও, সমগ্র ভারতবর্ষই তোমাদের স্বদেশ এবং বর্তমানে এই দেশের প্রয়োজন কর্ম । আর যখন সংগ্রামের আহ্বান আসিবে, তখন যেন নিদ্রায় মগ্ন থাকিও না ।"

স্বামীজীর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে নিবেদিতা বিপ্লবী পিটার ক্রপটকিন ও ম্যাটসিনীর বই উপহার দিয়েছিলেন । নিবেদিতা মনেপ্রাণে চাইতেন, এদেশের তরুণ প্রজন্ম চিন্তায় ও আচরণে ভারতের ঐতিহ্য ও সুমহান আদর্শের ধারক হয়ে উঠুক ।

যুবসংগঠন ও সেবা

স্বাধীনতা অর্জনই নিবেদিতার দৃষ্টিতে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তা নয় । তিনি চরিত্রবান যুবকদের সাহায্যে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরেই উত্তর কলকাতায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' স্থাপনে উৎসাহ দেন । নিবেদিতা 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'তে যুবকদের উদ্দেশে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন । তাঁর ইচ্ছা ছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেকগুলি 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' তৈরি হোক যার মাধ্যমে আঞ্চলিক যুবকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবাদর্শ সঞ্চারিত করা হবে ।

কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবে নিবেদিতা যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা দেখে আরেক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়ে । নিজে হাতে রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া, প্লেগ রোগীর মৃত্যুর পর বস্তীর দেওয়াল চুণকাম করা, রোগীদের নিঃসঙ্কোচে সেবা প্রভৃতি দেখে পল্লীস্থ যুবকেরা সেবাকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে । 'আপনি আচরি ধর্ম, জীবেরে শিখায়'— এ যেন তারই জীবন্ত প্রমাণ ।

জাতীয় শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানসাধনায় অনুপ্রেরণা দান

নিবেদিতার স্বপ্ন ছিল, ভারতবর্ষ তার আপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহায়ে সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি লাভ করবে । দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষের মনে তাই তিনি আদর্শবাদের জোয়ার আনতে চেয়েছিলেন । একসময় দীনেশচন্দ্র সেন ইংরেজীতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একটি বৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন । লেখা শেষ হলে তাঁর মনে হয় নিবেদিতাই পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত বইটি দেখে দিতে । দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ইচ্ছা নিবেদিতাকে জানালে তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন । সময় লেগেছিল বছর খানেক । কিন্তু বইটিকে কেন্দ্র করে দীনেশবাবুর সঙ্গে তাঁর সাহিত্য, কবিতা ও সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয় । সেই আলোচনার ফলে দীনেশবাবু যথেষ্ট উপকৃত হন । দীনেশবাবু নিবেদিতাকে মূলত ইংরেজী ভাষাটা দেখে দিতে বলেছিলেন । কিন্তু নিবেদিতা যত্ন করে ভাষা তো দেখতেন, সেইসঙ্গে অকাট্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন কেন কোনও কোনও অংশে তিনি পরিবর্তন করতে চান । যেমন ধনপতির গল্পে খুল্লনা

প্রতি সমাজের শাস্তিবিধান সম্বন্ধে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল । তাঁর যুক্তি ছিল : "আপনার গল্পে যদি একথা থাকে, তবে পৃথিবীর লোক এটাকে 'কাজির বিচার' বলে আপনাদের (সমাজকে) ঠাট্টা করবে ।" প্রকৃত ইতিহাস সত্যনির্ভর, সুতরাং দীনেশবাবু পড়তেন বিপদে । কিন্তু তিনি বিরক্ত হতেন না । তিনি বলতেন : "তাঁর কষ্ট কথার মধ্যে তাঁর অতি কোমল পুষ্পকোরকের মতো সহৃদয়তায় ভরপুর প্রাণটি (আমি) দেখতে পেতাম ।" এমনকি কাহিনীকারকেও তিনি তীব্র সমালোচনা করতেন । নিবেদিতা ছিলেন 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' । তাই তর্কাতর্কি হলেও তিনি বলতেন : "দীনেশবাবু আপনি সত্যই একজন প্রধান কবি । আপনার লেখা গদ্য হলে কি হবে ? আপনার ভাষা প্রকৃত কবির । আপনার সাহিত্যিক শক্তি অপূর্ব ।" অন্য সময়ে দীনেশবাবুর প্রসঙ্গ উঠলে তিনি দীনেশবাবুর সাহিত্যকীর্তির প্রশংসা করতেন ।

একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন, নিবেদিতা নিজে তখনকার দিনে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার । তাঁর রচনাশৈলী ও ভাবের সৌকর্য ইংরেজমহলে উচ্চপ্রশংসিত হত । তাঁর কাব্যভাবনা ছিল গভীর ও কাব্যবিচারও ছিল তীক্ষ্ণ । গ্রাম্য ছড়ার প্রতি কেউ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলে তিনি যথেষ্ট বিরক্ত হতেন । বলতেন : "লম্বা লম্বা শব্দ লাগিয়ে যাঁরা মহাকবির নাম কিনেছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাঁদের চেয়ে ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে ।" কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবের মূল্যায়নে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি ও কাব্যবিচারের মানদণ্ড সত্যই অপূর্ব ও মৌলিক ।

জাতীয় অর্থনীতির ইতিহাস ও স্বরূপ বুঝবার জন্য তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের কাছে যথেষ্ট ঋণী । সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাশিক্ষায় রমেশবাবুর সাহায্য নিবেদিতা তাঁর প্রথম পুস্তক 'The Web of Indian Life'-এ অকপটে স্বীকার করেছেন । ছাত্রদের জাতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য রমেশ দত্তের 'অর্থনীতির ইতিহাস'টি তিনি পড়তে বলতেন ।

যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করে নিবেদিতা বলেছিলেন : "বিদেশীর কাছে আপনার পতাকা কখনও নিচু করবেন না । যে বিশেষ বিভাগ আপনি গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন, তাতে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার চেষ্টা করুন । ভারতবর্ষ যেন এবিষয়ে প্রথম বলে স্বীকৃতি লাভ করে ।" আচার্য যদুনাথ তাঁর গবেষক-জীবনে নিবেদিতার এই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কখনও বিস্মৃত হননি ।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণার মূলেও ছিল নিবেদিতার মূল্যবান নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা । তারক দাস তাঁর 'জাপান ও এশিয়া' নামক পুস্তকটি নিবেদিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত তাঁকেই উৎসর্গ করেন ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবেদিতার চরিত্রের যে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন— তাঁর মহত্ত্ব, ভারতপ্রেম ও সিংহীসদৃশ সাহসিকতার

ভগিনী নিবেদিতা

পরিচয় দিয়েছেন, তা নিবেদিতা-অনুরাগী সকলেরই পাঠ্য । ছত্রে ছত্রে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা তাতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে ।

ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ্‌, কবি, সাহিত্যিক সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিকশিত হয়ে উঠুন ; সত্য ও সুন্দরের উপাসক হোন— এই ছিল নিবেদিতার মাতৃহৃদয়ের একমাত্র এষণা ।

একদল বিদেশী শিল্পী যখন অজন্তা ও ইলোরা পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন তিনি শিল্পী নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদারকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন— যাতে এদেশের শিল্পীরা পাশ্চাত্য শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের শিল্পের জগৎ ও শিল্পসৃষ্টির দৃষ্টিকোণটি প্রসারিত করতে পারেন । সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য তাঁর কাছে ঋণী । কেউ পাশ্চাত্য শিল্পশৈলীর নকল করলে

তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন । বিদেশীয় শিল্পশৈলীর সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পীরা তাদের নিজস্ব শিল্পরীতি সমৃদ্ধ করুন— সেটাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য । জাতীয় শিল্পবৈশিষ্ট্যের প্রতি শিল্পীদের সজাগ দৃষ্টি থাকুক, জাতীয় শিল্পচেতনায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ হোন— নিবেদিতা অন্তরের গভীরে তাই প্রার্থনা করতেন ।

১৯০২ থেকে ১৯০৭-এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর তিনখানি পুস্তক 'Living and Non-living', 'Plant Response', 'Comparative Electro-physiology', সেইসঙ্গে 'Irritability of Plants', এবং বহু প্রবন্ধ যেগুলি পরে Royal Society পরিচালিত 'Philosophical Transactions' নামক বৈজ্ঞানিক মাসিক গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয় তার সবকটিরই প্রণয়নে ও সম্পাদনায় নিবেদিতার অবদান উল্লেখযোগ্য । বেতার তরঙ্গের আবিষ্কারক হিসেবে তিনি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুকেই সম্মান দিতেন এবং মার্কনীর পূর্বে জগদীশচন্দ্র বসুই যে এটির আবিষ্কারক তা তিনি স্বীকার এবং প্রচারও করতেন । জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল । জগদীশচন্দ্র বসু নিবেদিতার থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় বছরের বড় ছিলেন । নিবেদিতা তাঁকে যেমন 'Man of Science' বলেছেন তেমনি 'Bairn' (অর্থ খোকা) শব্দটিও ব্যবহার করেছেন । অনেক সময় প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলেই জগদীশচন্দ্র বসু হতাশায় ভেঙ্গে পড়তেন । স্নেহশীলা মায়ের মতন নিবেদিতা তখন তাঁকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতেন । এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বলেছেন : "হতাশ ও অবসন্ন বোধ করিলে আমি নিবেদিতার নিকট আশ্রয় লইতাম ।" দীর্ঘ বার বছর (১৮৯৯—১৯১১) নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের কর্মে ও সৃজনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন । জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন— জগদীশচন্দ্র তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতার কাছে । "জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য ।" প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি জাতির গৌরব মনে করতেন । একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক মানের পারদর্শিতা দেখিয়েছেন— এ যেন নিবেদিতার নিজেরই গর্ব । ৩০ নভেম্বর বসুর জন্মদিনে নিবেদিতা যে পত্র লেখেন তার অংশবিশেষ : "চির বিজয় লাভ করুন । জাতির সম্মুখে আপনার জীবন আলোকবর্তিকার মতো পথ দেখাক ; তার কল্যাণে প্রদীপের মতো নিবেদিত হোক । আপনার অন্তর শান্তিতে পরিপূর্ণ হোক ।"

নিবেদিতা চেয়েছিলেন যে সম্পূর্ণ ভারতীয় অর্থে ভারতীয়দের দিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হোক । জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর অনেক আলোচনা হয় । জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বসুবিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারদেশে নিবেদিতার বজ্র আজও শোভা পাচ্ছে । দ্বারপ্রান্তে প্রাচীরের গায়ে খোদাই কর প্রদীপ হাতে কল্যাণময়ী নারীমূর্তিটি নিবেদিতার পুণ্যস্মৃতির ধারক ।

সাহিত্যিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্র বসুর প্রসঙ্গে নিবেদিতার ভূমিকা স্মরণ করে বলেন : "নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা আমরা ধারণা করতে পারব না । দেশ উপযুক্ত হলে তা বুঝবে ।"

বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধনী ভাষণে আচার্য জগদীশচন্দ্র নিবেদিতাকে স্মরণ করে বলেন : "জগৎ যখন সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, তখন এমন কয়েকজন ছিলেন, যাঁদের আমার প্রতি বিশ্বাস মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয়নি । আজ তাঁরা পরপারে ।" নিবেদিতার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে জগদীশচন্দ্র বসু এক লক্ষ টাকা রেখে যান, তাই দিয়ে তাঁর স্ত্রী লেডি অবলা বসু স্বপ্রতিষ্ঠিত বাণীমন্দিরে 'নিবেদিতা হল' তৈরি করে দেন ।

সেযুগে ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাধনায় গৌরববোধের এক বিরল দৃষ্টান্ত ।

রেনেশাঁ

বাংলার রেনেশাঁ তথা ভারতের নবজাগরণের পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ) । রেনেশাঁর দুকূলপ্লাবী প্রবাহে গতিসঞ্চার করেছিলেন অনেক পুরুষ কিন্তু মূলত তিনজন নারীর অবদান অনস্বীকার্য । তাঁরা হলেন রানী রাসমণি (১৭৯৩—১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ), শ্রীমা সারদাদেবী (১৮৫৩—১৯২০ খ্রীস্টাব্দ) ও ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭—১৯১১ খ্রীস্টাব্দ) ।

পাশ্চাত্যের রেনেশাঁর সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের মূলগত একটি পার্থক্য ছিল । পাশ্চাত্যের নিরিখে কবি-শিল্পী-পণ্ডিত-সাহিত্যিকের অবদান তাঁর শিল্প-পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যকীর্তিকে অবলম্বন করেই বিচার করা হয় । সেখানে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত দৈনন্দিন বা সামগ্রিক জীবনধারার মূল্যায়ন রীতি-বহির্ভূত । কিন্তু প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমগ্র মানুষটির মূল্যায়ন হয়, যেখানে তাঁর কর্ম ও জীবন ওতপ্রোত বা একাঙ্গী হয়ে পড়ে । সেই নিরিখে বিচার করলে ভগিনী নিবেদিতা একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সুলেখক, প্রাক্তন ডিরেক্টর, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ।

দেবী-জননী নিবেদিতা

নচিকেতা ভরদ্বাজ

নিবেদিতা— সে তো কোনও মানুষীর নাম মাত্র নয় ।
দেবী-জননী তিনি : মানুষের হৃদয়ের সমস্ত সুন্দর ইচ্ছার
প্রতিরূপ, শুভ্র শুদ্ধ মানবীয় মহাচেতনার
অনিন্দ্য কল্যাণ-মূর্তি, পরিণত পূর্ণের বিস্ময় ।
পাহাড় চূড়ায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে— আলোকিত স্নিগ্ধ সমন্বয়
ঘনীভূত ভালবাসা— মাতৃস্নেহ যেন সে সম্ভ্রান্ত অটল মহিমায়
নির্জন নিবিড় মগ্ন— আকাশ পারের দিব্যচেতনার ধ্যানে :
তার সে মুখের দিকে, তার সে চোখের দিকে তাকালে হৃদয়
ঋজু দীর্ঘ শরীরের স্নিগ্ধ শান্ত অতল জ্যোৎস্নায়
উন্মীলিত হয়ে ওঠে— বের হয় জীবনের সমুদ্র-সন্ধানে ।
যেন সে সূর্যের এক হিরণ্ময় রূপকল্প, আশ্বিনে অঘ্রাণে
অথচ কী অপরূপ হয়ে আছে পরিপ্লাবী সবুজে সোনায় ।

মানুষের ভালবাসা মাঝে মাঝে সমুদ্র হয়,
আকাশ আলোক হয়, বিগলিত করুণায় যমুনা-জাহ্নবী,
প্রতিবাদী শুভ্র ক্রোধ কী ক'রে যে দর্পিত প্রত্যয়ে
শয়তানের সিংহাসন ছুঁড়ে ফেলে,— তুমি সে দুয়ের সমন্বয়
নিবেদিতা লোকমাতা । হে মহান আগ্নেয় বিপ্লবী,
হে জননী, তোমার হৃদয়-ঋণে আমরা যে নন্দিত বিস্ময়ে
নবজন্মে সমুত্তীর্ণ ।— এতো ভালবাসা আমি কোথাও দেখিনি,
এক বুকে এতো সূর্য, এতো ব্যথা, এতো ক্রোধ, স্নিগ্ধ করুণার
মুক্তধারা, এমন সর্বস্বপণ এই রূপনারাণের তীরে !

প্রাক্তন প্রধান, বাংলা বিভাগ, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা ।

আমরা তোমার কাছে কত ঋণী— আজও তো বুঝিনি
আমার রক্তের স্রোতে তোমার সে উজ্জ্বল অপার
আগ্নেয় ব্যথার দান— উষ্ণতা আলোকে শিশিরে
চৈতন্যের শ্বেতপদ্ম ফুটে উঠছে তোমার স্পর্শের
অভিজাত আকাঙ্ক্ষায় । এখনও আকাশ জুড়ে অসহ্য প্লাবন
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ মেঘ । সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত উথাল-পাথাল
অন্ধকার, আর্তনাদ, ঘৃণা, পাপ, ষড়যন্ত্র, অসহায় দুঃস্থজীবনের
রাহুচ্ছায়া : শতবর্ষ পার হয়ে তবু আজ তোমার স্মরণ
তোমার সঙ্গে সম্পর্ক-বোধ আমাদের মথিত, ছিন্নভিন্ন করে ;
দেশজোড়া এ চক্রান্ত— এই হীন বেড়াজাল
ভেঙে ফেলতে উদ্দাম ঝড়ে
আমরা বেরিয়ে পড়ি ;
আবার ফিরিয়ে আনতে লুপ্ত পিতৃধন—
বড় জীবনের দৃপ্ত শঙ্খ বজ্র, অনাহত উজ্জ্বল দর্পণ ।

আঁধারে জ্বেলেছ দীপ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মেয়েরা আঁধারে থাকলে কে যাবে আলোতে ? কেউ যাবে ?
কেউই যাবে না । যদি অন্দরের বন্ধ রাখো দ্বার,
সদরেও কালো রাত্রি হানা দিয়ে সকলকে ডোবাবে,
অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে যাবে সমস্ত সংসার ।
মেয়েরা আঁধারে থাকলে মায়েরা আঁধারে থেকে যায়,
পরিণামে সমাজের সর্বস্তরে আঁধার ঘনায় ।

নিবেদিতা, তুমি এই সত্যকে সম্যক জেনেছিলে ।
তুমি জেনেছিলে, তাই এখন আমরা জেনেছি তা ।
জেনেছি, নিজেকে তুমি নিঃশেষ করেছ তিলে-তিলে,
অন্দরে জ্বেলেছ দীপ নিজেকে জ্বালিয়ে, নিবেদিতা ।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ।

তমোহর তিনিই ভগিনী

দিব্যেন্দু পালিত

নামের মাহাত্ম্যে তিনি চেনা,
আরও চেনা যায় কর্মতে ;
সেই মর্মে পুণ্য হয় দেনা—
সেবা, ত্রাণ, মহানামব্রতে ।

বিদেশও স্বদেশ হতে পারে
যদি লুপ্ত হয় ভেদাভেদ,
জ্বলে নম্র আলো অন্ধকারে—
মানবিক মন্ত্রে নেই খেদ ।

কত যে বছর চলে যায়
ক্ষুধা, জরা, মৃত্যু ও গ্লানিতে—
আশাহত তবু ফিরে পায়
খরায় সমূহ বৃষ্টিতে ।

মাতৃরূপে দেখা দেন তিনি,
স্মরণে চেনান অস্মিতা ;
তমোহর তিনিই ভগিনী—
বিবেক, আনন্দ, নিবেদিতা ।

কবি ও কথাসাহিত্যিক ।

প্রণমি তোমারে

প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপিণী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী নিবেদিতার গুণমুগ্ধ সুধীমণ্ডলী তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন উনিশ শতকের শেষ পাদে। আমরা কিন্তু বলব, মুখ্যত তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী। ভারতে পদার্পণের আগে তিনি এদেশের নারীশিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য, শিক্ষাদানরীতি— কোনও বিষয়েই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করেননি। অথচ বিদেশে শিক্ষয়িত্রীরূপে তাঁর পরিচিতি ছিল এবং নিজেই একটি নতুন শিক্ষালয় স্থাপন করে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ ভাবনা ও পরিকল্পনা ভারতবর্ষে এসে রূপ নিয়েছিল এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। একই সঙ্গে নারীজাতির কল্যাণে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে সুদূরপ্রসারী কর্মের সূত্রপাত হয়েছিল এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই। নিবেদিতা, নিবেদিতা বিদ্যালয় ও নিবেদিতার সাধনা ওতপ্রোত হয়ে আছে।

এই বিদ্যালয় শতবর্ষের যাত্রা পূর্ণ করেছে। আজ ছাত্রী, শিক্ষিকা ও ত্যাগব্রতী কর্মী— সকলেরই আনন্দের দিন। আবার দীর্ঘদিনের কর্মনিষ্ঠা ও কর্মপ্রয়াসের বিশ্লেষণের দিনও বটে। তাঁরা তাদের ভক্তি-অর্ঘ ও প্রার্থনামন্ত্র নিবেদন করে ধন্য হবে। তাঁর পূত জীবনের অনুধ্যান আজকের কর্মীদেরও শিক্ষাব্রত পালনে উৎসাহিত করবে। ভগিনী নিবেদিতার জীবনই আমাদের আদর্শ, আমাদের পন্থা। তাঁর ভাব-ধারণা ও নির্দেশ পালনের যোগ্য যেন আমরা হতে পারি। তিনি ছিলেন স্বামীজী প্রজ্বলিত দিব্য যজ্ঞানলের প্রথম আহুতি। আমাদের মধ্যেও যেন জাগ্রত হয় যজ্ঞানলের হব্যের মতন নিজেকে সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা।

বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের কাহিনী যখন প্রথম পড়েছিলাম, মনে হয়েছিল— হায়, আমি কেন ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রী হলাম না— যাদের আশীর্বাদ করে গেছেন জগজ্জননী শ্রীসারদা দেবী! যুগাচার্য স্বামীজীও স্বয়ং আশীর্বাদ জানিয়েছেন— আমাদের বিদ্যালয় থেকে এমন সব মেয়ে শিক্ষিতা হবে, যারা ভারতের সকল মেয়ে-পুরুষের মধ্যে মনীষায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করবে। গভীরভাবে চিন্তার পর বুঝতে পারলাম, এখানকার শিক্ষিকারাও ছাত্রী— এটি নিবেদিতার সঙ্কল্পিত 'শিক্ষক-শিক্ষণ' মন্দির। এখানে এমন সব শিক্ষয়িত্রী তৈরি হবেন যাঁরা দিকে দিকে সার্থক শিক্ষার প্রচারে ব্রতী হবেন আর অনুরূপ ভাবধারায় নব নব শিক্ষামন্দির গড়ে তুলবেন।

এই শিক্ষায়তনের শান্ত পরিবেশে এমন একটা দৈবীপ্রেরণা আছে, যার ফলে (আমাদের চোখে না পড়লেও, অন্যদের দৃষ্টিতে) এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং শিক্ষিকাদের চালচলন ও চরিত্রে বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। সেটি গতানুগতিক নয়। সেটি বিদ্যালয় পরিচালনার নৈপুণ্যে নয়, সেটি এই প্রতিষ্ঠানের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ ও ভগিনী নিবেদিতার অমোঘ কল্যাণকর্মের গুণে। জাতি, কুল ও মান— সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে তিনি আত্মাহুতি দিয়েছিলেন একটি কল্যাণকর্মের রূপায়ণে। সেই শুচিশুভ্র অম্লান নিবেদনের প্রভায় অন্য সকলেও আলোকিত ও পবিত্র হয়ে ওঠেন।

বারবার মনে হয়, কবে ভগিনীর আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ রূপ নেবে! কবে এই বিদ্যালয় কেবল আমাদের নয়, সমাজের, জাতির পূজামন্দির হয়ে উঠবে? এই বিদ্যায়তন থেকে কবে ছাত্রী ও শিক্ষিকা উভয়েরই লাভ হবে নতুন ভাব, নতুন প্রেরণা, নতুন আলোক! কবে নিবেদিতার ছাত্রীরা হবে তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি! বিদ্যালয়গৃহের ক্ষুদ্র প্রদীপটি স্তম্ভাধারে মহাদীপের মতো বহুজনের

পথ নিরূপণে সহায়তা করবে !

নিবেদিতার জীবন ছিল কর্মবহুল ও বৈচিত্র্যে পূর্ণ । শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন শিক্ষা ও সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত । স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে তার পরিপূর্ণ পরিণতি ঘটল । লন্ডনে সিসেম ক্লাবে স্বামীজী বলেছিলেন : শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষ তৈরি করা, কতকগুলি তথ্য মুখস্থ করানো নয় । নিবেদিতা যেন নতুন আলো দেখতে পেলেন । ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি, ভারতীয় ভাবধারায় সনাতন সত্যের বাণী তাঁর জীবনে এনেছিল রূপান্তর । গ্রহণ করার শক্তি ছিল বলেই ঐ উচ্চভাব নিজের জীবনে রূপ দিতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন ।

স্বামী বিবেকানন্দকে আচার্যরূপে বরণ করে যখন তিনি ভারতীয় নারীর উন্নতিকল্পে নিজের সঙ্কল্পের কথা স্বামীজীকে জানালেন— তখন স্বামীজী স্বীয় আদর্শের সংক্ষেপ রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন তাঁর সামনে— আমার আদর্শ বস্তুত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যেতে পারে । মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নিরূপণ । শিক্ষা হবে man-making education. নারীদের বেলায়ও ঐ একই পন্থা ।

ভারতের কাজে নারীদের শিক্ষার জন্য, উন্নতির জন্য তিনি কী কঠোর জীবনই না বরণ করলেন । এক কথায় সর্বস্ব অর্পণ করলেন— 'কায়েন মনসা বাচা' । হয়তো যে-যুগের সংস্কৃত উল্লেখ করা হল, তখন লেখনীর জোরের কথা প্রচারিত হয়নি । নাহলে আর একটি শব্দের সংযোজন করা যেত— লেখন্যা । অর্থাৎ কায়মনোবাক্যেই নয়, লেখনীর দ্বারাও । শারীরিক কষ্টকে তিনি উপেক্ষা করেছেন । অগণিত বক্তৃতা দিয়েছেন, অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন স্বনামে, বেনামে । স্বামীজী নিবেদিতাকে ভারতপ্রেমে দীক্ষা দিয়েছিলেন । নিবেদিতা তাই সহজেই সন্ধান পেয়েছিলেন ভারতীয় জীবনের মূলসুরের ।

ভবিষ্যৎ ভারতীয় নারীর পরিপূর্ণ রূপ সম্বন্ধে স্বামীজীর ইঙ্গিত নিবেদিতার কাছে এসেছিল আশীর্বাণীরূপে :

মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা
মলয়সমীরে যথা স্নিগ্ধ মধুরতা,
যে পবিত্র কান্তি বীর্য, আর্য বেদিতলে
নিত্য রাজে বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে,
—এ সব তোমার হোক আরও হোক শত
অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্নাতীত
ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে ॥

কেবল নিজের মধ্যেই নয়, প্রত্যেক নারীর মধ্যে ঐ রূপ জাগিয়ে তোলার ব্রতই নিয়েছিলেন নিবেদিতা । তাঁর 'Hints on National Education' গ্রন্থে কী অপূর্ব ভঙ্গিতেই না তিনি ভারতনারীর শিক্ষার কথা একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন । স্বচ্ছ ও উদার, সর্বোপরি সুচিন্তিত সেই ব্যাখ্যাগুলি । লিখছেন "নতুন ধরনে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকের মনেই নানা দ্বিধা । প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে সংশয়ই এর একমাত্র কারণ । আর এ সংশয়ও বাস্তবিক বিবেচনাসঙ্গত । প্রাচীন হিন্দু নারীচরিত্র কি এতই নিন্দনীয় এবং লজ্জার বিষয় যে, সে-আদর্শ ত্যাগ করতে আমরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করব না ? প্রাচীন নারীচরিত্র গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাধুর্য, নম্রতার সঙ্গে পবিত্রতা, সহিষ্ণুতার সঙ্গে শিশুসুলভ সরলতা ও সহানুভূতিতে অলঙ্কৃত ছিল । তার পরিবর্তে আমরা এমন এক পাশ্চাত্য স্থূল আদর্শ গ্রহণ করতে চাইছি যা কেবলমাত্র সামাজিক মর্যাদা আর কতকগুলি তথ্য সংগ্রহের শিক্ষালাভেই সন্তুষ্ট ।" লিখেছেন : "যে শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধন করতে গিয়ে নম্রতা ও কমনীয়তা হরণ করে, তা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না । মধ্য ও আধুনিকযুগে সেই সুকোমল বৃত্তিগুলি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হলেও, তার অনুশীলন সকল যুগেই অনিবার্য । প্রকৃত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন । বুদ্ধির প্রাখর্য আর ব্যবহারনিপুণতা শিক্ষার গৌণ দিক । ভারতের মেয়েদের জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের হৃদয় ও বুদ্ধির সমভাবে বিকাশের সহায়তা হয় ।" নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন : "নারীকে প্রধানত সববিষয়েই নিপুণ হতে হবে । সীতা বা সাবিত্রীর মধুর জায়ারূপ তাঁদের মহান চরিত্রের দ্যোতকমাত্র । জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজই তাঁরা ... দায়িত্বের সঙ্গে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন । সমাজের প্রতিটি দাবিই তাঁরা পূরণ করেছেন— একই সঙ্গে তাঁরা গৃহিণী ও সম্রাজ্ঞী, নাগরিক ও সন্ন্যাসিনী, অনুগত পত্নী ও নিঃসঙ্গ তপস্বিনী । অবার প্রয়োজনবোধে কুশলা বীরাঙ্গনা । জীবননাট্যের প্রতিটি ভূমিকাতেই সমান নৈপুণ্যে অভিনয় করে গেছেন । জায়ারূপে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠ কিন্তু যদি তাঁরা পরিণীতা না হতেন— কন্যা, ভগিনী ও শিষ্যারূপেও তাঁরা অনুরূপ পূর্ণতা দেখাতে পারতেন । এই ... জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান দক্ষতা... নারীত্ব থেকে মানবত্বে উত্তরণের বৈশিষ্ট্য অর্জন— এটি সর্বযুগে সর্বকালে স্ত্রীশিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত ।" শিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতার এই পূর্ণাঙ্গ ভাবনা মেয়েদের সামনে নতুন পথ । স্বামীজী বলেছিলেন : "আমরা আহ্বান করিতে থাকিব, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, অন্তরের দেবতা সাড়া না দেন ।" তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন : "ব্রত উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হওয়া নয় ।"

ব্রত উদ্‌যাপনে নিবেদিতার আত্মবিলুপ্তি দেখে সেদিন সকলে অভিভূত হয়েছিলেন । সাহিত্যিক মোহিতলাল মজুমদার ... অনবদ্য ভাষায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন : "বাংলার মাটিতে ... করিয়া হল কর্ষণের পর যখন নবজীবনের বীজবপন ও বারি...

আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে দিকে কত অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নিবেদিতা আর একটি বীজ। এই বীজ যেন ফসলের কোণে, নিজেকেই ফলপুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়, অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য এমন ফসল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল যাহা বাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না— সে কেবল সার হইবার ফসল। বাংলার মাটিতে তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাংলার উদ্যানে ফলফুলের যে আকস্মিক বাসন্তী শোভা দেখিয়াছিলাম— ভগিনী নিবেদিতার নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন রসধারা গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবে কে ?"

নিবেদিতাও বলতেন : আমরা আশা করি না, নিরাশও হই না, আমরা দৃঢ়নিশ্চয়। আমরা অগ্রগামী মরিয়া দল (band of despair)। নিজের শরীর দিয়ে সেতু প্রস্তুত করব। পরবর্তী সৈন্যদল সেই সেতুর ওপর দিয়ে পার হবে। আবার কখনও বলতেন : আমরা ইঞ্জিন হব, বহু লোককে সঙ্গে করে এগিয়ে নিয়ে যাব।

ভারতের বেদান্তধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের মানুষের সেবাকল্পে তিনি প্রাণপাত করেছিলেন। তাঁর ভারত-আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বামীজীর মন্তব্য আমাদের মনে সম্ভ্রম জাগায়: "ইংলন্ড বহু প্রচারক পাঠিয়েছে, উদ্দেশ্য খ্রীস্টধর্ম প্রচার করে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতাবিহীন অজ্ঞান অন্ধকার হতে ভারতীয়গণকে উদ্ধার করা— মার্গারেটের যাত্রা সেই মূঢ়তার প্রতিবাদস্বরূপ।"

নিবেদিতার কথা বলে শেষ করা যায় না। আর একজন নিবেদিতা এলে হয়তো নিবেদিতার মহিমা বোঝাতে পারতেন।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব শিক্ষয়িত্রী, বর্তমানে শ্রীসারদা মঠের মাদ্রাজ শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষা।

নিবেদিতা ছিলেন বিবেকানন্দের উপসংহার। কিন্তু উপসংহার বলিয়া তিনি ঠিক বিবেকানন্দের প্রতিরূপ ছিলেন না। নিবেদিতার জীবনের সামান্যমাত্রও স্পর্শ যাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই সেই জ্যোতির্ময় জীবনের বিশালতা, গভীরতা ও শক্তিসঞ্চার দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। একটি দুর্লভ সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাই নিবেদিতার মধ্যে। নিবেদিতার চরিত্রে এবং চিন্তায় দেখিয়াছি জাতীয় ভাবধারা এবং সাংস্কৃতিক মহিমার সহিত আধুনিক ভাবধারাও উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়াও নিবেদিতা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন— ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

—ব্রজেন শীল

বাগবাজার পল্লী, নিবেদিতা ও তাঁর স্কুল

স্বাতী ঠাকুর (চক্রবর্তী)

বাগবাজারের বোসপাড়া লেন— কেবল কোনও এক ঠিকানা নয় । শতবর্ষময় এক আলোকায়নের উদ্ভাসের উদ্দেশ নিহিত এই শব্দমন্ত্রে ।

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান আর আশ্বাসে হৃদয় বেঁধে বিদেশিনী মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল এলেন ভারতে । সেই দিনটি ছিল ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি । "প্রথম থেকেই স্থির ছিল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুবিধামত আমি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলব", বলেছেন নিবেদিতা । কলকাতায় আসার কিছুদিন পরেই ১৭ মার্চ মার্গারেট এলেন কলকাতার নেটিভ পাড়া বাগবাজারের ১০/২ নম্বর বোসপাড়া লেনে শ্রীমা সারদাদেবীকে দর্শন করতে । সেই প্রথম তাঁর বাগবাজারে আসা । এই ঘটনার ঠিক আট দিন পরে ২৫ মার্চ স্বামীজী মার্গারেটকে দীক্ষা দিলেন ব্রহ্মচর্যব্রতে । নিবেদিত হলেন তিনি ভারতের কল্যাণব্রতে । হলেন 'নিবেদিতা' ।

স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল যে, ভারতীয় চেতনার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটিনাটি ঘটনার উপর । অতএব হিন্দু নারীদের মধ্যে কাজ করার জন্য হিন্দু জীবনচর্যার একান্ত প্রয়োজন । নিবেদিতারও সেই অভিমত । উত্তরভারত ভ্রমণ শেষে ১ নভেম্বর নিবেদিতা ফিরলেন কলকাতায় । হাওড়া স্টেশন থেকে একাই গিয়ে পৌঁছলেন বাগবাজারে রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়িতে । স্বামীজী ছিলেন সেখানেই । নিবেদিতার ইচ্ছায় স্বামীজী তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ১০/২, বোসপাড়া লেনে । বাগবাজারের সঙ্গে নিবেদিতার আজীবন বন্ধনের সূচনা হল । সেই বাড়ির একতলার একটি ঘরে অসুস্থ অবস্থায় স্বামী যোগানন্দ বাস করতেন । বাংলা শেখার জন্য

নিবেদিতা যেতেন তাঁর কাছে । ছাদ আর বারান্দাসহ
নির্দিষ্ট ছিল মেয়েদের জন্য । কাছেই গঙ্গা । দোতলা থেকে
দেখা যেত । শ্রীশ্রীমার প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছেন : "
ক্ষুদ্র সংসারটির কর্ত্রী সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলেই
হয় । তাঁর কথা সকলেই জানেন ।... তিনি যেন ভারতীয়
আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী ।" এই বাড়িটিতে
মহিলারা প্রায় সর্বদা শ্রীশ্রীমার কাছে বাস করতেন তাঁদের
নিবেদিতা বলেছেন গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-
লক্ষ্মীদিদির কথা । এঁরা সকলেই বিধবা, সকলেই শ্রীরামকৃ
সাক্ষাৎ শিষ্যা । নিবেদিতা প্রথমে এই বাড়িটিতে আট-দশ
বাস করেছেন । পরে আলাদা বাড়িতে চলে গেলেও প্রতি
দুপুরবেলা এখানেই কাটাতেন । এই পরিবারটির সঙ্গে
সহাবস্থানের ফলেই নিবেদিতার পক্ষে ভারত এবং
নারীকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ ঘটেছি
গৃহস্থালির প্রতিটি কাজ, পূজা-পাঠ-ধ্যান পদ্ধতি, দৈহিক
অভ্যাস প্রভৃতি একান্ত ভারতীয় জীবনযাত্রার সব ধারা
নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন তিনি । তাই দেখি
কালে তাঁর রচনার বিষয় হয়েছে— মা কালী, দুর্গাপূজা, দোল
জন্মাষ্টমী, সরস্বতীপূজা, রাস, রথ প্রভৃতি একান্ত ভারতীয়
ও আচার- অনুষ্ঠান । ভারতের অম্লান আত্মা বিবেকানন্দ
চিরন্তনী নারীমূর্তি সারদাদেবী— এই দুই উজ্জ্বল প্রেরণা
করল নিবেদিতার ভারতপ্রেমকে ।

* * *

নিবেদিতার স্কুলের জন্য বাড়ির প্রয়োজন । শ্রী

কলকাতায় এলে বাগবাজার পল্লীতেই বাস করতেন । তাই স্বামীজীর ইচ্ছে নিবেদিতার কর্মকেন্দ্র বাগবাজারেই হয় । কিন্তু আজ থেকে একশ বছর আগে রক্ষণশীল পল্লীতে এক বিদেশিনীর জন্য বাড়ি ভাড়া পাওয়া ছিল দুরূহ । তবে স্বামীজী যাঁর সহায় তাঁর সমস্যা কোথায় ? বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়িটি হল নিবেদিতার ঠিকানা । শুরু হল ইতিহাস রচনা । বোসপাড়া লেনটি রামকান্ত বসু স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে কিছু দূর গিয়ে তিনদিকে ভাগ হয়ে গেছে । যে-রাস্তাটি পশ্চিমদিকে ঘুরে গেছে, তার ঠিক মোড়ে একটুকরো খালি জমি । জমির এক পাশেই বাঁদিকে ১৬ নম্বর বাড়ি । অন্য পাশেই ১৭ নম্বর বাড়ি— যে বাড়িতে নিবেদিতা দ্বিতীয়বার এদেশে এসে শেষ পর্যন্ত বাস করেছিলেন । কয়েকটি বাড়ি পরেই বাস করতেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ । শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার এই বোসপাড়া লেন দিয়ে যাতায়াত করেছেন । নিবেদিতা তাঁর রচনায় যখনই বাগবাজার পল্লী কিংবা সেখানকার বাসিন্দাদের উল্লেখ করেছেন তখনই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অপূর্ব এক মুগ্ধতা । এর কারণ যে কী, তাও তিনি নিজেই বলে গেছেন : "স্বামীজীর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল । যাঁরা তাঁর কাছে থাকতেন, তাঁদের সকলকেই তিনি বড় করে তুলতেন ।... এইভাবে প্রতিপদে তাঁর ভাবরাজিতে অনুস্যূত ও তাঁর প্রগাঢ় স্বজাতিপ্রেমে প্রভাবিত হয়ে আমি যেন কোনও দেবলোকের স্নিগ্ধজ্যোতির মধ্যে বিচরণ করতে লাগলাম, যেখানে প্রত্যেক নরনারীর আকৃতি তাদের স্বভাব অপেক্ষা বড় হয়ে দেখা দিত ।"

নিবেদিতা নিজেও প্রথম থেকেই উন্মুখ ছিলেন ভালমন্দ নির্বিচারে এদেশের সবকিছুকে ভালবাসার জন্য । তিনি সেকালের বাগবাজার পল্লীর যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে সেখানকার জীবনযাত্রার এক শান্ত, ধীর, ছন্দোময় ছবি ধরা দিয়েছে । গঙ্গাস্নান আর দেবপ্রণাম দিয়ে আরম্ভ হত দিন । ক্রমে দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠত গোটা পল্লী । যাতায়াতের মন্থর পথে এলাকার সবাই প্রবল কৌতূহলে একবার তাকিয়ে যেত বাঙালি পাড়ার এই 'সিস্টার'-এর বাড়ির জানালার দিকে । দৈনন্দিন কাজের শেষে বিকেলে বিশ্রামের সময় । ছোট ছোট ছেলেরা ঘরে ফিরত বই-খাতা-দোয়াত-কলম নিয়ে । অস্তরাগে রাঙা সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত করে ঘরে ঘরে বেজে উঠত মঙ্গলশঙ্খ, প্রার্থনার সুর । নিবেদিতার দৃষ্টিতে সবই সুন্দর । তাঁর নিজের সেই ১৬ নম্বর বাড়িটি তার পাঁচ ধাপওয়ালা ছাদ, দুটি উঠোন, দোতলার শোবার ঘর আর একতলার পড়ার ঘর— সব মিলিয়ে তাঁর কাছে ছিল খুব সুন্দর । "আমার বাড়িতে একটি আঙ্গিনা আছে ।... বাড়ির মধ্যে এই জায়গাটি আমার আকাশ ও তারার সঙ্গে মিলনের স্থান । দিনের বেলা এখানে শীতল ছায়া বিছিয়ে থাকে, রাতে এটি হয়ে ওঠে অসীমের পূজামন্দির ।"... তবু বাস্তব সমস্যা ছিলই । বিদেশিনীর বাড়ি কাজ করতে রাজি নয় কোনও হিন্দু পরিচারিকা । অনেক কষ্টে পাওয়া গেল একজনকে । তার শর্ত, নিবেদিতা কখনও ঢুকবে না রান্নাঘরে, ছুঁতে পারবে না উনুন, এমনকি জলও । রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে থাকতে গিয়ে তাঁকে খাওয়া এবং ছোঁয়ার ব্যাপারে বহু বাছবিচার সহ্য করতে হয়েছে । তবু তাঁর আন্তরিক সত্তা সবরকম স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে অপ্রতিহত তেজে, অপূর্ব ভালবাসায় ।

* * *

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর, রবিবার । 'কালীপূজার মহানিশা' বলে নিবেদিতা চিহ্নিত করেছেন দিনটিকে । ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ সেদিন উপস্থিত । গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সঙ্গে এলেন শ্রীশ্রীমা । পূজাপাঠ করে আশীর্বাদ জানালেন তিনি : "আমি প্রার্থনা করি এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক । এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা আদর্শ কন্যা হয়ে উঠুক ।" পরদিন অর্থাৎ ১৪ নভেম্বর শুরু হল স্কুল ।

স্বামীজী পরিতৃপ্ত । নিবেদিতা স্বপ্ন পূরণের আনন্দে অধীর ।

১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের স্কুলবাড়ি

তবু তাঁর দিনলিপিতে লিখলেন মাত্র দুটি শব্দ : "স্কুল খুলল" । হৃদয়ের প্রবল আবেগকে তিনি যে কত সংযত রাখতে পারতেন তার অভ্রান্ত প্রমাণ আমরা পরেও পেয়েছি । সে কথার উল্লেখ করা যাবে যথাস্থানে । এদেশে স্কুল খোলার তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যটি কি ? জাতীয় ভাবধারায় দেশের রক্ষণশীল হিন্দু মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা এবং সম্মানের সঙ্গে তারা যাতে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারে তার প্রয়াস করা— এটিই ছিল নিবেদিতার স্কুল স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য, বলেছেন নিবেদিতা স্বয়ং ।

পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দের রিপোর্টেও এই কথার সমর্থন মেলে । তবে কি বুঝতে হবে যে নিবেদিতাই প্রথম বাংলাদেশে হিন্দুনারীর শিক্ষার সূত্রপাত করলেন ? ইতিহাস সে কথা বলে

না। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে (নিবেদিতার ভারতে আগমন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) ভারতে নারী জাগরণের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ও স্বদেশী আন্দোলনে খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রীস্টান মিশনারিরা এদেশে এসেছেন আগেই, এসেছেন ইংরেজ শিক্ষাবিদ্‌রা, ব্রাহ্মধর্মের প্রসারের ফলে ব্রাহ্ম মহিলারা শিক্ষায়, রুচিতে এগিয়েও গিয়েছেন অনেক দূর। নিবেদিতা আমেরিকাবাসীদের কাছে পুস্তিকা আকারে যে 'Project of the Ramakrishna School for Girls' প্রকাশ করেছিলেন তাতে লিখেছেনও এসব কথা। তবে সেইসঙ্গে উল্লেখ করেছেন এক অমোঘ তথ্যের— প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মেয়ের সংখ্যা জনসংখ্যার শতকরা হিসেবে মাত্র সাড়ে ছয় ভাগ এবং এই হিসেবের ভিতরে গোঁড়া হিন্দু মেয়েদের প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। আর ঠিক এইখান থেকে বিচার করলে উত্তর কলকাতার নেটিভ পাড়া— বাগবাজার পল্লীতে নিবেদিতার স্কুলটির যে কী অপরিসীম মূল্য ছিল তা অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথ 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে এই বিষয়টির সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন: "বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন— সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন।" এই শিক্ষার বিশিষ্টতা কোথায়? সে কথাও বলেছেন রবীন্দ্রনাথ: "অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন— তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই— তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে।... কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই।"

নিবেদিতা তাঁর স্কুলের নাম রেখেছিলেন: 'রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস'। বাগবাজারের মানুষের কাছে স্কুলটির পরিচয় ছিল সিস্টারের স্কুল বলে। নিবেদিতা লিখছেন: "কলকাতার এক গলিতে খাঁটি এদেশীয় এক বাড়িতে মাত্র একটি ভৃত্য নিয়ে আমি আটমাস একেবারে একা বাস করেছি। ঐ বাড়িতেই আমার ছোট বিদ্যালয়টি চালিয়ে যাচ্ছিলাম পরীক্ষামূলকভাবে। বিদ্যালয়ে মেয়ে ছিল প্রায় চল্লিশটি, আমি তাদের পড়াতাম পালা করে— দু'ঘণ্টা করে চারটি ক্লাস নিতাম। আমার বাংলাজ্ঞান ছিল খুব অল্প, তাই ক্লাসের বেশির ভাগ সময়ই আমি ব্যস্ত থাকতাম হাতে কলমে শিক্ষা নিয়ে, ফলে সার্থক বিদ্যালয় গঠনের পথে প্রকৃত বাধা বা অসুবিধা কোথায় এবং এর বাস্তব সম্ভাবনাই বা কতটুকু, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।"

কী পড়াতেন নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের? নিবেদিতা বলেছেন— বাংলা, ইতিহাস, ব্যাকরণ, গণিত, ইতিহাস, ভুগোল, ইংরেজী, সংস্কৃত, জ্যামিতি, ছবি আঁকা, সূঁচের সেলাই। "সোমবার থেকে শুক্রবার স্কুল খোলা থাকত। শনিবার আর রবিবার এই দুটো দিন আমি ছুটির দিন বলে ধরে নিয়েছিলাম। এই ব্যবস্থা আমার ছাত্রীদের মনঃপূত ছিল না বলেই মনে হয়। মনে পড়ে সেই প্রথম শনিবারের সকালটা। ছ'টা বাজতেই ছোট মেয়ের দল হৈ হৈ করতে করতে এসে জড়ো হয়েছে বাড়ির দরজায়— বেশ বোঝা যাচ্ছিল তারা ঢুকে পড়বেই স্থির করেছে। একজন কাজের লোক কিছু কিছু ইংরেজী বলতে পারত; সে ছুটে এল আমার কাছে। বলল, 'মেমসাহেব, ছোট মেয়েরা (বেবী পিপ্‌ল্) এসে গেছে, দরজা খুলে দিই?'"

ক্রমেই বাগবাজার পল্লীর মানুষের আনন্দ-বেদনার সমানুভবী হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। সিস্টার যে তাঁদের কত আপনজন তা পল্লীর মানুষ অভ্রান্তভাবে অনুভব করলেন প্লেগের সময়। স্বামীজী পল্লীর প্লেগ নিবারণের দায়িত্ব সঁপে দিলেন নিবেদিতার হাতে। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১ মার্চ থেকে কাজ শুরু হল। নিবেদিতা যেমন গভীরভাবে আবেগপ্রবণ ছিলেন, তেমন প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন। তিনি নিজের বাড়িটিকেও হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সেবার কাজটি সম্পন্ন হল। পরবর্তী বছরগুলিতেও পল্লীর প্লেগের সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বিখ্যাত ডাক্তার আর. জি. কর লিখেছেন: "এই সঙ্কট-সময়ে বাগবাজার পল্লীর প্রতি বস্তিতে ভগিনী নিবেদিতার করুণাময়ী মূর্তি লক্ষিত হইত। আপনার আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি অপরকে সাহায্য করিতেন।"

এরই পাশাপাশি চলছিল স্কুলের কাজ, লেখার কাজ। ক্রমেই স্কুলের আর্থিক সঙ্কট বাড়ছিল। নিবেদিতা হিসেব করে দেখেছিলেন বছরে সাড়ে সাতশ টাকা হলে পাঁচজন আবাসিক ছাত্রীসহ নিজের খরচ চালানো সম্ভব। কিন্তু সেই অর্থ কোথায়? স্বামীজী এইসময় দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাবার কথা ভাবছেন। তাঁর পরামর্শে অর্থসংগ্রহের জন্য নিবেদিতা অবশেষে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় যেতে রাজি হলেন। আট মাস স্কুল চলার পর ১৮৯৯ সালের গরমের ছুটির আগে ১৬ মে শেষ ক্লাস করলেন নিবেদিতা। তারপর ১৬ নম্বর বাড়ি ছেড়ে উঠলেন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে। "শ্রীমার বাড়িতে আমার সেই পুরোনো ঘরটিতে আমার মেয়েদের তৈরি আসন, তাদের সেলাই, খাতাপত্র সব সাজিয়ে একটা প্রদর্শনীর মতো করেছিলাম। মেয়েদের মা, মাসী ও দিদিমা সকলে দেখতে এসেছিলেন।" জুন মাসের ২০ তারিখে নিবেদিতা স্কুল বন্ধ করে পাশ্চাত্যে রওনা হলেন তাঁর স্কুলেরই জন্য। সেখানে সকলের কাছে তুলে ধরেছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু মেয়েদের প্রকৃত অবস্থান ও সমস্যা, তাঁর নিজের পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনকে। আড়াই বছর পরে ১৯০২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা ফিরে এলেন ভারতে এবং এবারেও সেই বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে। তবে এবারের ঠিকানা ১৭ নম্বর বাড়ি। আবার শুরু হল স্কুল— সরস্বতীপূজার দিন থেকে। আকস্মিক

বজ্রপাত ঘটল এর ক'মাস পরেই । জুলাই মাসের পাঁচ তারিখে ভোরবেলা এল সারদানন্দের চিঠি :

"My dear Nivedita,

The end has come. Swamiji has slept Last Night at nine, never to rise again."

নিবেদিতা অন্তরে বিক্ষত । তবু কী গভীর, কী সংহত তিনি ! দিনলিপিতে লিখলেন, সেই দুটি মাত্র শব্দই— "Swami died."

* * *

স্বামীজীর মৃত্যুর পর কয়েকমাস নিবেদিতা প্রবল বেদনায় অশান্ত হয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে । কিন্তু স্কুলের সঙ্গে যে তাঁর আত্মার যোগ, তাকে ভুলে দূরে থাকবেন কী করে ? ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি থেকে আবার নিয়মিতভাবে স্কুলের কাজ শুরু করেন । তখনও পর্যন্ত স্কুলের পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনও বই ছিল না । কিন্ডারগার্টেন প্রণালীতে মুখে মুখেই শিক্ষা দেওয়া হত । ঐ সময় তাঁর স্কুলের যাঁরা ছাত্রী ছিলেন তাঁদের মধ্যে আটাশ জনের একটি রিপোর্ট তিনি তৈরি করেন । সেই রিপোর্ট পড়লে বোঝা যায় যে প্রতিটি ছাত্রীর পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিষয়ে তিনি কতখানি ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং ছাত্রীরা তাঁর সঙ্গে কতখানি ঘনিষ্ঠ ছিল । এইসময় একটি বিশেষ ঘটনা ঘটল । "১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে সিস্টার ক্রিস্টিন নামে স্বামীজীর জনৈক আমেরিকান শিষ্যা ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা কার্যের সমগ্র ভার গ্রহণপূর্বক প্রণালীবদ্ধভাবে তার পরিচালনা করেন । একমাত্র তাঁর চরিত্র, একনিষ্ঠতা ও উদ্যম আজ এর উন্নতির কারণ"— কৃতজ্ঞচিত্তে একথা স্মরণ করেছেন নিবেদিতা ।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি তাঁর বাড়িতে কয়েকদিন ধরে কথকতা ও চণ্ডীপাঠের আসরের আয়োজন করেছিলেন । বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করলেন পাড়ার মহিলাদের । এরপর থেকে নিবেদিতা যেন তাঁদের আরও আপনজন হয়ে উঠলেন । তাঁরা সন্ধেবেলা আসতেন নিবেদিতার সঙ্গে নানা গল্পগুজব আর আলোচনা করতে । এই মহিলাদের নিয়ে একটি স্কুল খোলার কথা ভাবলেন তিনি । স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের উৎসাহে ২ নভেম্বর শুরু হল স্কুল । ভগিনী ক্রিস্টিন নিলেন সূঁচের সেলাই শেখানোর দায়িত্ব । লাবণ্যপ্রভা বসু রইলেন পড়ানোর দায়িত্বে । শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যা যোগীন-মা দিতেন ধর্মশিক্ষা । গাড়ি করে ছাত্রীদের আনা হত । বাগবাজার পল্লীর বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিবেদিতা বাড়ির বউ আর বিধবা মেয়েদের চেয়ে নিলেন । শুরু হল 'পুরস্ত্রী বিভাগ' । স্কুলের উন্নতি হচ্ছিল, বাড়ছিল ছাত্রীসংখ্যা । তাই ১৭ নম্বর বাড়িতে স্থানাভাবের কারণে আবার ভাড়া নেওয়া হল সেই ১৬ নম্বর বাড়িটি । নিবেদিতা স্কুলের বিবরণ দিচ্ছেন : "১৬ নম্বর বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে স্কুলের কাজে ব্যবহৃত হয় । ঐ বাড়ির বাইরের যে ঘরে আমি প্রথম স্কুল আরম্ভ করি সেই ঘরেই আবার ক্লাস হচ্ছে । তার ওপরের ঘরে ক্রিস্টিন বিবাহিত মেয়েদের জন্য প্রতি সোম ও বুধবার সেলাইয়ের ক্লাস করেন । প্রত্যহ একটি ছোট সেলাইয়ের ক্লাস তো আছেই । ক্রিস্টিন আমার পুরোনো শোবার ঘরে থাকে । ১৭ নম্বর বাড়ির ভিতর দিকে গোপালের মা, ঝি ও আমি থাকি । সামনের দিকে আমার পড়ার ঘর ও ছোট ঠাকুর ঘর । সকালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এই পাঠকক্ষে এসে বসি । বেলা নটার সময় কয়েকজন ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রীকে কিন্ডারগার্টেন ট্রেনিং দিই । ছোট মেয়েদের স্কুল আরম্ভ হয় বেলা বারোটায় । সাড়ে চারটেয় স্কুল শেষ হলে তারা চা খেয়ে পাঁচটার সময় চলে যায় । ক্রিস্টিনের 'বউ'রা প্রতিদিন একটা থেকে চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত থাকে । বিবাহিত মেয়েরা ঘরের বাইরে আসছেন, এই ঘটনা (এদেশের) ইতিহাসে প্রথম । ক্রিস্টিনের ছাত্রীসংখ্যা কুড়ি থেকে ষাট । তার রবিবার ও আমার শনি, রবি— দুদিন ছুটি থাকে ।"

বিদ্যালয়ের ছাদে ছাত্রীদের সঙ্গে নিবেদিতা

নিবেদিতা নিজে সেলাই ও আঁকার ক্লাস নিতেন এবং পরে ইতিহাস ও ইংরেজী পড়াতেন । প্রতিদিন স্কুল আরম্ভের সময় ছাত্রীরা ঠাকুরদালানে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে নানা স্তবগান করত এবং অবশ্যই গাইত 'বন্দে মাতরম্' গানটি ।

ক্রমে নিবেদিতা তাঁর অনন্য প্রতিভায় এদেশের রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন । দেশী-বিদেশী কত গণ্যমান্য ব্যক্তির আগমনে যে ধন্য হয়েছে বাগবাজারের বোসপাড়া লেন তা ভাবলে শিহরিত হতে হয় । 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : "কলকাতার বোসপাড়া লেনে তাঁর বাসস্থান ছিল ভারতের উন্নয়নে ব্রতী মানুষদের আকর্ষণ কেন্দ্র ।" প্রকৃতপক্ষে এই স্কুল বাড়িটিই ছিল তাঁর সবরকম কাজের কেন্দ্রস্বরূপ । অর্থাভাবে ১৬ নম্বর বাড়িটি তাঁকে পরে ছেড়ে দিতে হয়েছিল । কোনও কোনও বন্ধু তাঁকে বাগবাজারের বোসপাড়া লেন ছাড়তেও অনুরোধ করেছিলেন । তিনি রাজি হননি ।

বলেছিলেন : "এই গলি আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, একে ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না ।"

স্কুলের মেয়েদের প্রতি ছিল তাঁর অপার স্নেহ, বিশেষত যারা বিধবা মেয়ে তাদের প্রতি । নিবেদিতা তাদের একাদশীর দিন নিজের কাছে বসিয়ে শরবৎ, মিষ্টি খাওয়াতেন । ভগিনী ক্রিস্টিন যতদিন স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন তখনও নিবেদিতা ছাত্রীদের বিষয়ে সমস্ত খোঁজ রাখতেন । স্বামীজীর আদর্শে চরিত্রগঠনের দিকে জোর দিয়েছিলেন তিনি গোড়া থেকেই । ছাত্রীদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন দক্ষিণেশ্বর, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা । লণ্ঠনের সাহায্যে আলো ফেলে তাদের দেখাতেন চিতোর দুর্গ, পদ্মিনীর ছবি, জ্বলন্ত ভাষায় শোনাতেন ভারতের গৌরবের ইতিহাস । সর্বদা ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতেন ভারতীয়তার আদর্শে । তাঁর স্নেহে প্রয়োজনীয় শাসনটুকুও ছিল । স্কুলের মেয়েদের ভালবাসতেন নিজের মেয়ের মতো । স্কুলে দেখামাত্রই বলতেন : "এই যে আমার মেয়ে, এসেছ ?"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে নিবেদিতার স্কুলটির আরেকটি প্রধান গুরুত্ব রয়েছে । সিস্টারের স্কুলের সহকর্মী সরলাবালা সরকার খুব সংক্ষেপে সুন্দরভাবে তার স্মৃতিচারণ করেছেন : "বোসপাড়ার একটি বাড়িতে নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন একত্রে থাকিতেন, ওই বাড়িতেই মেয়েদের পাঠশালাও বসিত ; সাধারণ হিসাবে বিদ্যালয় বলিলে যাহা বুঝায়, এই বিদ্যালয়টি সেরূপ নহে । স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মচারিণীদের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সঙ্কল্পকে ভিত্তি করিয়াই নিবেদিতা এই বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিয়াছিলেন । এই বিদ্যালয়ের কার্যেই নিবেদিতা তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং এই বিদ্যালয়ের কার্যেই তাঁহার জীবনদানও করিয়া গিয়াছেন ।"

* * *

১৯১১ খ্রীস্টাব্দ । পূজার ছুটি এল । প্রতিবারের ম এবারেও নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যা দার্জিলিঙে । স্বামী সারদানন্দ, গোলাপ-মা আর যোগীন-মার স দেখা করতে নিবেদিতা গেলেন 'উদ্বোধন' বাড়িতে যোগীন-মাকে প্রণাম করে বললেন : "যোগীন-মা, আমি বোধ আর ফিরব না ।" বাগবাজার পল্লী ছেড়ে নিবেদিতার মহাযাত্রা । একটি কাজ তখনও ছিল অসম্পূর্ণ । ৭ অক্টোবর করলেন নিবেদিতা । তাঁর সমস্ত সম্পত্তির আয় দান করলেন ভারতীয় নারীগণের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে, জাতীয় শি প্রচলনের জন্য..." ।

* * *

ভগিনী নিবেদিতার সেই স্কুল আজ শতায়ু । তার পথের বদলেছে কেবল কিন্তু পটের নামটি আজও অপরিবর্তি নিবেদিতার স্মৃতি আর কর্মে ঋদ্ধ সেই বাগবাজার পল্লী নিবেদিতার স্কুলের নতুন ঠিকানা— ৫ নম্বর, নিবেদিতা লেন

প্রাক্তন ছাত্রী, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল ।

ক্রিস্টিন : বিদ্যালয়ের আর এক ধাত্রী

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

ইতিহাস বড় খেয়ালি । বড় নির্মম । কাউকে সে স্মৃতিধার্য করে রেখে অমরত্বের শিরোপা দেয় । আবার কাউকে বা অযৌক্তিক উপেক্ষায় ঝাপসা করে রাখে । নিবেদিতা গার্লস স্কুলের অন্যতর ধাত্রী সিস্টার ক্রিস্টিনকে আজ আমরা প্রায় বিস্মৃত হতে চলেছি । এই প্রজন্ম জানেই না, কত প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর নিষ্ঠা আর সহিষ্ণুতায় ক্রিস্টিন এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্য করে গেছেন, সঞ্চার করে গেছেন মহীরুহের প্রাণশক্তি, গড়ে গেছেন আধুনিক ভারতীয় নারীশিক্ষার আদর্শ রূপরেখা ।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দ ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেলকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেন । সেখানেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ক্রিস্টিন ভারতে কাজ করবে । ক্রিস্টিন সম্পর্কে তাঁর নিজের মূল্যায়ন : "ও বড় পবিত্র, বড় পবিত্র আত্মা । আমি জানি, আমি অনুভব করেছি । কলকাতায় আমার কাজের জন্য ওকে আমার চাই ।"

ওই সহস্রদ্বীপোদ্যানেই একদিন ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষাপ্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি সরাসরি ক্রিস্টিনকে আহ্বান জানান এই কাজে যোগ দেওয়ার ।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? ক্রিস্টিনের আন্তরিক আগ্রহ থাকলেও, ডেট্রয়েটে তাঁর মুখের দিকে যে চেয়ে আছেন দুঃখী মা আর ছোট ছোট পাঁচটি বোন । পিতার অকালমৃত্যুতে মাত্র তেরো বছর বয়সে ক্রিস্টিনকে সংসারের হাল ধরতে হয় । ডেট্রয়েটের এক স্কুলে শিক্ষকতা করে অত্যন্ত পরিশ্রম আর অনটনের মধ্যে তিনি সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করে চলেছেন । তাই স্বামীজীর কাছে সময় চাইলেন ক্রিস্টিন । রুক্ষ বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে চালাতে মনে লালন করতে লাগলেন স্বামীজীর স্বপ্নকে ।

* * *

১৮৯৮-এর নভেম্বরে নিবেদিতা কলকাতার বাগবাজারে স্কুলের সূচনা করেছিলেন । কিন্তু মূলত অর্থাভাবে সে স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয় এবং অর্থসংগ্রহের আশায় তিনি বিদেশযাত্রা করেন । ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতবর্ষে ফিরে নিবেদিতা ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে তাঁর স্কুলের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন । ইতিমধ্যে ক্রিস্টিনের মায়ের মৃত্যু ঘটায় সংসারের কর্তব্য থেকে তাঁর মুক্তি মিলেছে । স্বামীজীকে তিনি জানালেন যে, ভারতের কাজে যোগদানের জন্য তিনি প্রস্তুত । এই সংবাদে নিবেদিতা এবং স্বামীজী দুজনেই খুশি হন । ক্রিস্টিনের মতো স্বার্থশূন্য, অভিজ্ঞ শিক্ষিকাকে সঙ্গে পাওয়া যাবে জেনে স্বামীজী তো ভরসা পাবেনই । ১৯০২-এর ৩০ মার্চ তিনি তাঁর রোগশয্যার ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে প্রিয়শিষ্যা ক্রিস্টিনকে লিখলেন :

> *"You know how welcome you are, I need not express it. This is a land where expressions are studiously subdued. ...Mrs. Bull, Joe and Margo are anxiously awaiting you, and so is VIVEKANANDA."*

৭ এপ্রিল ক্রিস্টিন কলকাতা পৌঁছলেন । পরদিনই বেলুড় মঠে এলেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এবং পরবর্তী কাজকর্ম বুঝে নিতে । বাস্তববাদী স্বামীজী আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ এড়িয়ে ক্রিস্টিন এবং নিবেদিতাকে একটু বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে । সেই মতো ৫ মে মায়াবতীতে

ভগিনী ক্রিস্টিন

মিসেস সেভিয়ারের কাছে তাঁরা রওনা হলেন । নিবেদিতা অবশ্য অল্পদিন পরেই কলকাতা ফিরে আসেন ।

হায়, তখন যদি ক্রিস্টিন বুঝতেন, স্বামীজী আর মাত্র কয়েকমাস দেহধারণ করবেন, তাহলে নিশ্চয় যতশীঘ্র সম্ভব বাগবাজার স্কুলে কাজ শুরু করার চেষ্টা করতেন । স্বামীজী দেখে যেতে পারতেন, ক্রিস্টিনকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা তাঁর স্বপ্নের বিদ্যালয়ে আবার প্রাণসঞ্চার করেছেন— এবার আর সাময়িক কালের জন্য নয়, অনেক অনেক দীর্ঘ পথ চলার জন্য ।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্রিস্টিন মায়াবতীতে স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ পেলেন ।

* * *

স্বামীজীর পূর্ব ইচ্ছামত ক্রিস্টিন ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত হিমালয়ের কোলে থেকে কলকাতায় নেমে এলেন । ক্রিস্টিনকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে নিবেদিতার সুবিধে হল দুদিকেই । প্রথমত, ক্রিস্টিনকে স্কুলের অনেকখানি দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর বিচিত্রমুখী কর্মপ্রবাহে অনেকটা সময় দিতে পারলেন । দ্বিতীয়ত, আধুনিক কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল শিক্ষিকা হিসেবে ক্রিস্টিন এই বিদ্যালয়ের কার্যকরী পাঠ্যসূচী তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেন ।

ছাত্রীদের বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাসের প্রাথমিক পাঠ দেওয়া হত । তার সঙ্গে শেখানো হত ছবি আঁকা, মাটির জিনিস গড়া, সেলাই, নানারকম খেলা ইত্যাদি । স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এবং স্বামী সারদানন্দ মহারাজও নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনকে স্কুলের কাজে সর্বতোভাবে সহায়তা করতেন ।

কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, নারীশিক্ষা প্রসারের যে ব্রত তাঁরা নিয়েছেন, তাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে এই বালিকাদের লেখাপড়া শেখানোটা মোটেও যথেষ্ট নয় । বাল্যবিবাহের কারণে প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও অসমাপ্ত রেখে অধিকাংশ পড়ুয়াকে স্কুল ছাড়তে হচ্ছে । তাই বাড়ির কমবয়সী বধূ এবং বিধবাদেরও এই শিক্ষাপ্রচারের আওতায় না আনতে পারলে স্কুলের মূল উদ্দেশ্যটাই অধরা থেকে যাচ্ছে ।

ক্রিস্টিন উদ্যোগী হলেন । ১৯০৩-এরই ২ নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন গৃহবধূদের বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল । গাড়ি ঠিক করা হল । সেটি বাড়ি বাড়ি ঘুরে উৎসাহীদের ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে পৌঁছে দেবে, আবার স্কুলশেষে যার যার বাড়ি নিয়ে যাবে ।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে রক্ষণশীল বাঙালি বধূদের পক্ষে বাড়ির বাইরে এসে খ্রীস্টান বিদেশিনীদের কাছে লেখাপড়া শেখা এক অভাবনীয় ব্যাপার । নিবেদিতা-ক্রিস্টিনও এ ব্যাপারে অবশ্য সন্দিগ্ধ ছিলেন । তবু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে আন্তরিক চেষ্টার কোনও ত্রুটি রইল না । তাঁরা নিজেরা ভেবে রেখেছিলেন প্রথমদিন দশ-বারো জন মহিলা এলেই তাঁরা তাঁদের সূচনা সার্থক হয়েছে মনে করবেন । সবাইকে অবাক করে দিয়ে ২ নভেম্বর সিস্টারদের স্কুলে এসে পৌঁছলেন পঁচিশ জন এবং খুব শীঘ্রই দৈনিক উপস্থিতির সংখ্যা ঘোরাফেরা করতে লাগল ষাট থেকে সত্তর জনে ।

ক্রিস্টিন বুঝলেন তাঁরা ঠিক পথেই এগোচ্ছেন । বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের বোন লাবণ্যপ্রভা বসু পড়ুয়াদের হস্তাক্ষর ও পাঠের তালিম দিতেন । যোগীন-মা দিতেন ধর্মশিক্ষা । বেলুড় মঠ থেকে স্বামী বোধানন্দ প্রতি মঙ্গলবার আসতেন ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করতে । ক্রিস্টিন তো সামগ্রিক দেখাশোনা করতেনই । তার সঙ্গে তিনি সপ্তাহে দুদিন সেলাই ও সূচীকর্ম শেখাতেন ।

এখানে একটা খট্‌কা জাগতেই পারে— ক্রিস্টিনের মতো একজন অভিজ্ঞ শিক্ষিকা কেন শুধু সেলাই-ফোঁড়াই শেখাতেন ? তাছাড়া বালিকাদের যেখানে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে, সেখানে অপেক্ষাকৃত বড়দের পাঠক্রম কেন এতো সংক্ষিপ্ত ?

এই অতৃপ্তিটা ক্রিস্টিনের মনে পুরো মাত্রায় ছিল । সেলাই শেখানোর সিদ্ধান্তের পিছনে এই চিন্তা ছিল যে, ছাত্রীদের এ

কিছু ঘরোয়া কাজ শিখিয়ে দিতে হবে যার দ্বারা প্রয়োজনে অর্থোপার্জনও করা সম্ভব । তখনকার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার এই পরিকল্পনা সিস্টারদের দূরদৃষ্টিরই পরিচায়ক । অনুমান করতে পারি, ক্রিস্টিন তাই স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব নিজে নিয়েছিলেন । এইজন্য ভারতীয় দর্জির কাছে তিনি সেলাই, কাপড়ের মাপজোক, কাটিং ইত্যাদি শেখেন । ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, স্কুলে সাপ্তাহিক দুদিনের সেলাই ক্লাসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে ক্রিস্টিনকে ছাত্রীদের তিনগুণ পরিশ্রম করতে হত । কিন্তু এই 'তালিম' দেওয়াকে ক্রিস্টিন বলতেন 'Training, not education.' এই সেলাইয়ের ক্লাসকেও শিক্ষামূলক করার জন্য যথাসাধ্য বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করতেন । দুটি মানচিত্র ছিল তাঁদের । একটি ভারতের, অন্যটি পৃথিবীর । তার সাহায্যেই ক্রিস্টিন তাঁর শিক্ষার্থিনীদের ইতিহাস-ভূগোল সম্পর্কে ছোট ছোট ধারণা দিতেন । মরুভূমি, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্বতমালা চেনাতেন । ভারতীয় তীর্থস্থানগুলির বর্ণনা দিতেন । দেশী-বিদেশী নানান বিষয়ে ইতিহাসের কাহিনীও বলতেন : কখনও বৌদ্ধযুগ, কখনও নীলনদ, কখনও বা হজরত মহম্মদ ।

এইটুকু আয়োজনেই তিনি অবশ্য থেমে থাকতে চাননি । তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল পাঠ্যসূচী আরও জ্ঞানগর্ভ, আরও কৌতূহলকর হয় যাতে পড়ুয়াদের মননের বিস্তার ঘটে । কিন্তু নিবেদিতার আশঙ্কা, পাঠ্যতালিকাকে বাড়ালে ঘরোয়া কাজে ব্যস্ত মহিলাদের কাছে তা ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে । এতে বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তাতেও ভাঁটা পড়তে পারে ।

প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল, এ ব্যাপারে ক্রিস্টিনের মূল্যায়নই ঠিক । পড়ুয়াদের কাছেই যখন প্রশ্ন রাখা হল, তাঁদের পড়ার বিষয় আরও বিস্তৃত করতে তাঁরা আগ্রহী কিনা, ক্রিস্টিনকে অভিভূত করে তাঁরা তাঁকেই সমর্থন করলেন । এতদিনের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছেন । এখন পরম আগ্রহে সেই জ্ঞানের আলো তাঁরা আরও আরও সংগ্রহ করতে চান । ক্রিস্টিনকে মধ্যমণি করে তাঁরা বিবিধ বিদ্যাচর্চায় মেতে উঠলেন ।

গোটা এলাকায় মেয়েদের মধ্যে উদ্দীপনার প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল । বাড়ির মেয়েরা, শোনা যায়, তাড়াতাড়ি তাঁদের হেঁসেলের কাজ শেষ করে ফেলতেন, পাছে বিদ্যালয়ে যেতে দেরি হয়ে যায় । নিয়মিত নতুন নতুন মুখ স্রোতের মতো আসতে লাগল । তাঁদের জায়গা দিতে ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ির পাশে ১৬ নম্বর বাড়িটিও ভাড়া নেওয়া হল । পড়ুয়া বধূরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন, তাঁদের পড়ার মেয়াদ আরও বাড়াতে হবে— সাপ্তাহিক দুদিনের ক্লাসে চলবে না । তাঁরা এক কৌশল অবলম্বন করলেন । গাড়োয়ান এবং পরিচারিকার সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করে ছোট মেয়েদের সঙ্গে গাড়িতে ঢুকে সকালবেলাই স্কুলে হাজির হয়ে যেতেন । বোঝাই যায়, অত্যুৎসাহীর এই সচেতন নিয়মভঙ্গ বধূদের শাশুড়ি, স্বামী ইত্যাদি অভিভাবকদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনেই চলত । ক্রিস্টিন প্রায়ই দেখতেন তাঁর উঁচু ক্লাসের পড়ুয়ারা সকালবেলাতেই হাসিমুখে হাজির । তাঁরা জানতেন, একবার এসে পড়লে ক্রিস্টিন ঠিক তাঁদের জন্য একটা ব্যবস্থা করবেন ।

এই সময় ক্রিস্টিন উদয়াস্ত প্রচণ্ড পরিশ্রমে এই পড়ুয়ার দলকে সামলে চলেছেন— তাঁদের পড়াচ্ছেন, পড়ার তদারকি করছেন অথবা কারও ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করছেন । বিশ্রাম নেবার অবসরও তাঁর নেই ।

ইতিমধ্যে গৃহবধূদের আগ্রহ আর গ্রহণক্ষমতা দেখে তাঁদের ইংরেজী শেখানোও শুরু হয়ে গেছে । ছুটিছাঁটায় অল্পদিনের জন্য বাইরে গেলে প্রিয় ছাত্রীরা ক্রিস্টিনকে চিঠি লিখতেন । ক্রিস্টিন সাফল্যের উৎসাহে উদ্ভাসিত হয়ে নিবেদিতা বা অন্যান্য সঙ্গীদের দেখাতেন, এই যে অমুক মেয়েটির ইংরেজীতে লেখা পোস্টকার্ড এসেছে । নিবেদিতা স্মৃতিচারণ করেছেন, মাত্র মাস দেড়েক আগে যিনি ইংরেজীতে নিজের নামটুকুও লিখতে পারতেন না, তিনি এখন লিখেছেন, 'আই অ্যাম সরি টু সে মাই ফাদার আনহেলদি নাও ।' আর এক বধূ লিখেছেন, 'আওয়ার স্কুল ইজ্ কোয়াইট ফুলফিলড ।' হোক ভুলভ্রান্তি । বুঝে নিতে অসুবিধে হচ্ছে না, কত দ্রুত উন্নতি করছেন পড়ুয়ারা । কত দ্রুত উন্নতি করছে নিবেদিতা-ক্রিস্টিনের বিদ্যালয় ।

* * *

অল্পসময়ের মধ্যে সিস্টারদের স্কুলের এই যে অভাবনীয় উত্থান, এর পিছনে কিন্তু রয়েছে চরম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আদর্শের স্থির-লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক নিয়ত সংগ্রাম । স্বামীজীর প্রতি নিশ্চল আনুগত্য আর নিষ্কম্প বিশ্বাসকে সম্বল করে এই দুই নারী তাঁদের ব্রত উদ্‌যাপন করে চলেছেন । হাজারো প্রতিবন্ধের প্রতি তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই— কি শারীরিক, কি আর্থিক কিংবা সামাজিক । কোনও কিছুতেই না ।

তাঁদের শারীরিক প্রতিকূলতার কথাই প্রথমে বলছি বটে কিন্তু এই ব্যক্তিগত অসুবিধের বিষয়টি উভয়েই যথাসাধ্য উপেক্ষা করে গেছেন । অশক্ত শরীরে দিনের পর দিন পরিশ্রম । প্রয়োজনে বিশ্রাম নেই, উপযুক্ত খাবার নেই ; উল্টে আছে তাঁদের পক্ষে অনভ্যস্ত আবহাওয়া, অচেনা প্রেক্ষাপট ।

এর সঙ্গে আর্থিক দুরবস্থা । সিস্টারদের নিজেদের অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা তুলছিই না । স্কুলের নিয়মিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার অভাবের কথাই বলছি । স্বামীজীর বিদেশী শিষ্য-শিষ্যার অনুদান তো ছিলই । বেলুড় মঠের পক্ষে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এবং স্বামী সারদানন্দ মহারাজও কিছু

অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করতেন । রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুরক্ত ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ যথাসাধ্য সাহায্য করতেন । কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রয়োজন আরও অর্থের । নিবেদিতা সেই প্রয়োজন মেটাতেই বই লেখার কাজে তৎপর হন ।

ক্রিস্টিনের মতো এক অভিজ্ঞ শিক্ষিকা এবং সফল সংগঠক স্কুলের হাল ধরায় নিবেদিতা অন্য দিকে মন দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন । স্কুলের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় দায়দায়িত্ব ক্রিস্টিনের ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি মনঃসংযোগ করেছিলেন লেখালেখি এবং বক্তৃতায় । এই কাজে তাঁকে নিয়তই ব্যস্ত থাকতে হত এবং নানা জায়গায় যাওয়ারও প্রয়োজন হত । এই সূত্রে পাওয়া যাবতীয় অর্থ স্কুলের কাজে ব্যয় করা হত । এক লক্ষ্যে দুই সিস্টারের এই ঘরে-বাইরে কর্ম-বিভাজন স্কুল পরিচালনার জন্য বিশেষ কার্যকর হয়েছিল ।

কিন্তু সিস্টারদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা নিশ্চয় এসেছিল তখনকার বাঙালি সমাজ থেকে । আজ ভাবতে অবাক লাগে, রক্ষণশীল তখনকার সমাজের কাছে ঘরের মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার অল্পশ্রুতপূর্ব আহ্বান নিয়ে দুই অন্য দেশের, অন্য ধর্মের, অন্য কৃষ্টির মহিলা কী করে নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তুললেন !

খুব সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, এমন অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল মূলত তিনটি কারণে ।

এক, সিস্টারদের শিক্ষাক্রমে এবং দৈনন্দিন আচরণে হিন্দুধর্ম এবং দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ওতপ্রোত ছিল । নারীশিক্ষার প্রয়োজন তখনকার সমাজ ধীরে ধীরে স্বীকার করলেও, মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশ্চাত্য ব্যবস্থার অন্ধ অনুসরণ, স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা এবং ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস এই কাজে বিশেষ সাফল্য দেয়নি । স্বামীজী-নির্ধারিত সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশজ শিক্ষাপ্রসারের নীতিই এই দুই পুরোদস্তুর মেমসাহেবের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল ।

দুই, সিস্টারদের ব্যক্তিত্বের প্রতি সাধারণ মানুষের সম্ভ্রম । এক্ষেত্রে নিবেদিতা ছিলেন অবশ্যই অগ্রণী । বাগ্মী, লেখক, সমালোচক হিসেবে তাঁর পরিচিতির একটা পরোক্ষ প্রভাব ছিলই । তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, সরোজিনী নাইডু, ডাঃ নীলরতন সরকার, গোপাল কৃষ্ণ গোখেল, 'দ্য স্টেট্‌স্‌ম্যান'-এর সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষদের শ্রদ্ধার সম্পর্ক এবং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্কুলের সম্পর্কে সাবেকি অভিভাবকদের মনে ভরসা জুগিয়েছিল ।

আর সাফল্যের তৃতীয় কারণ, এলাকার নারী-শিশুসহ সমস্ত মানুষের সঙ্গে সিস্টারদের আন্তরিক ব্যবহার ও আত্মীয়সুলভ ঘনিষ্ঠ আচরণ । এই স্থানীয় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সিস্টার ক্রিস্টিনের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাঁর কাছাকাছি যাঁরা আসতেন, নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর সাগ্রহ মনোযোগ দিয়ে তাঁদের কাছে টেনে নেওয়ার এক দুর্লভ ক্ষমতা ছিল তাঁর । সমসাময়িকদের অনেকে স্মৃতিচারণ করেছেন ক্রিস্টিন কিভাবে শিশুদের আদর করতেন, বিরূপ এবং সন্ধিগ্ধ মানুষদের মন তিনি কী আশ্চর্য কুশলতায় জয় করে নিতে পারতেন ! সেই প্রসঙ্গে নিবেদিতার এক স্মৃতিচারণ উল্লেখ করি, সেসময়ে কয়েক সপ্তাহ ক্রিস্টিন একাই বাড়ি দেখাশোনা করছেন । তখন কোনও রাঁধুনিও ছিল না । তাই কোনও এক প্রতিবেশিনী তাঁকে দুবেলা খাবার পাঠিয়ে দিতেন। প্রথম দিন সন্ধে হল, সেই ভদ্রমহিলার পরিচারিকা একটি পেতলের থালায় ক্রিস্টিনের আহার্য নিয়ে উপস্থিত । কিন্তু মনে হল মেয়েটির মধ্যে প্রসন্ন আতিথেয়তার লেশমাত্রও নেই, বরং এই বিদেশিনীর খাবার বহনের দায়িত্ব পেয়ে সে বেশ বিরক্ত । পাত্রটি ক্রিস্টিনের পায়ের কাছে ঠক্ করে নামিয়ে, মুখ ভার করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল । ক্রিস্টিন কিচ্ছু বললেন না । থালাটি তুলে নিয়ে তিনি খাবারগুলি রান্নাঘরে যথাস্থানে রেখে পাত্রটি ধুলেন । তারপর দাসীটির ভাবভঙ্গি হুবহু নকল করে পাত্রটা বিজয়গর্বে তার পায়ের কাছে ঠেলে দিয়ে বিরসমুখে কোমড়ে হাত দিয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন । এই অভিনয় যাদুর মতো কাজ করল । দাসীটি হাসিমুখে পাত্রটি নিয়ে চলে গেল । এরপরও সে ক্রিস্টিনের কাছে এসেছে । প্রথমদিনের দুর্ব্যবহারের কোনদিন পুনরাবৃত্তি হয়নি ।

ক্রিস্টিন একদিন নিবেদিতাকে বলেছিলেন, এই গলির বাসিন্দাদের আমি বুঝিয়ে ছাড়ব— 'ওরা যেমন আর্য, আমিও তেমনি ।' অপরিচিত সংস্কৃতিকে আত্তীকরণের এই দুরূহ প্রয়াসে তিনি ব্যর্থ হননি । তাই তাঁদের এক প্রতিবেশিনী একবার নিবেদিতাকে অভিভূত করে প্রশ্ন করেছিলেন যে, ক্রিস্টিন আমেরিকার ব্রাহ্মণ কিনা । শ্রীশ্রীমাও ক্রিস্টিনের এই সকলকে আপন করে নেওয়া আন্তরিকতার তারিফ করতেন, বিশেষত তাঁর পরিষ্কার বাংলা বলার কৃতিত্বের কথা তিনি বিশেষভাবে বলতেন ।

* * *

নিবেদিতার কথ্য বাংলা ছিল অনেক আড়ষ্ট । তাছাড়া তাঁর রাশভারি ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল । বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ক্রিস্টিনকে 'মুনদিদি' আর নিবেদিতাকে 'সানদিদি' বলে ডাকতেন । এই নামকরণ থেকেই স্পষ্ট তাঁদের প্রতি চারপাশের মানুষের মনোভাব । নিবেদিতা যেখানে তাঁর শৌর্যের দীপ্তিতে শ্রদ্ধেয় ; ক্রিস্টিন সেখানে তাঁর কোমল স্বভাবে কাছের জন ।

নিবেদিতাও নিজে ক্রিস্টিনের স্বভাবের এই সৌন্দর্যের বিষয়ে সচেতন ছিলেন । শিক্ষিকা ও সংগঠক হিসেবে তাঁর নিপুণতার, পরিশ্রমের এবং সেইসঙ্গে তাঁর সবাইকে সহজে আপন করে নেওয়ার এই গুণের কথা তিনি নিজেও মুক্তকণ্ঠে বলেছেন ।

জোসেফিন ম্যাকলাউডকে তিনি ক্রিস্টিন প্রসঙ্গে লেখেন :

> *"(Christine) is so very sweet, but curiously like an Indian woman... The boys love her, and she is nearer to the simple people in some ways than I am."* *অন্যত্র মিস ম্যাকলাউডকেই তিনি লিখেছেন :* *"I never knew how fretted and feverish and ineffective was my life, until I saw Christine. All the things Swamiji dreamt for me she is fulfilling. The women's work is a wonderful success. But SHE is more wonderful. Her whole time is given up to study, work and visiting. She lives here, without fuss, without complexity. I look at her in a vain envy, and feel that I never knew my own measureless inadequacy before..."*

সহকর্মীর প্রতি এতো সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি নিবেদিতার মতো মহাপ্রাণের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। সেইসঙ্গে এ কথাও সত্যি, ভদ্রতার খাতিরেও নিবেদিতা কখনই কাউকে অন্যায্য বা যোগ্যতার অতিরিক্ত প্রশংসা করতেন না। আর তাছাড়া নিবেদিতা-উল্লিখিত ক্রিস্টিনের এইসব অমূল্য গুণের কথা বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও ভাবে প্রকাশ করে গেছেন।

বিদ্যালয়ের ব্যাপারে দুই সিস্টার তাঁদের দায়িত্ব কেমনভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন আমরা জানি। তবে নীতিগত কোনও সিদ্ধান্ত নিবেদিতার অনুমোদন ছাড়া গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। বিদ্যালয়ের সূচনা থেকে তার পরিকল্পনা এবং আয়োজনে নিবেদিতারই পথিকৃতের ভূমিকা। কাজেই স্বামীজীর মতানুসারে স্বাভাবিকভাবে তিনিই ছিলেন অধ্যক্ষা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের সমস্ত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ক্রিস্টিনের কার্যকর উপস্থিতি এবং সেইসঙ্গে তাঁর লোকপ্রিয়তা একসময় বাইরের লোকের চোখে তাঁকেই স্কুলের কর্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

সিস্টার দেবমাতা কিছুদিন বোসপাড়া লেনের স্কুলে নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের সঙ্গে কাটিয়ে যান। 'Days in an Indian Monastery' গ্রন্থে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন : "The real Principal of the school was Sister Christine. Sister Christine had... an exceptionally unselfish character with a rare spirit of service."

ইডা আনসেল (Ida Ansell)-কে পরবর্তী কালে লেখা স্বামী অতুলানন্দের (গুরুদাস মহারাজ) এক চিঠিতেও এই একই বক্তব্য দেখি : "She (Christine) was in charge (of the school) for many years, though nominally Nivedita was at the head."

যদিও দুজনেই স্বামীজীর প্রতি প্রশ্নাতীতভাবে অনুগত এবং তাঁরই নির্দেশে বহু প্রতিকূলতা স্বীকার করেও নিঃস্বার্থভাবে এই বিদ্যালয়ের কাজে লেগে ছিলেন, তবু এখানে কর্তৃত্বের অধিকার নিয়ে দুই সেবাব্রতীর মধ্যে যেন এক সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বের সংঘাত শুরু হয়ে যায়।

অত্যন্ত তেজস্বী ও প্রবল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নিবেদিতার মনে হতে থাকে স্কুলের কাজে তাঁর আর কোনও প্রয়োজন নেই : "I am no longer needed." এরই মধ্যে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে তাঁকে ইংল্যান্ডে যেতে হয়। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ফিরে এসে তিনি দেখেন তাঁর অনুপস্থিতির কালে ক্রিস্টিন শিক্ষয়িত্রী সুধীরার সহযোগিতায় স্কুলকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় : "They (the students) hold themselves under Swamiji and the Holy Mother. They are something of disciples, as well as pupils. All this Christine organised and brought into shape while I was away." তাঁর আক্ষেপের সুরটা ধরা পড়ছে স্পষ্টই। বুদ্ধিমতী ক্রিস্টিনও সে কথা বুঝতে পারেন।

এই সময় ১৯১০-এর এপ্রিলে ক্রিস্টিনের সুযোগ আসে স্কুল থেকে কিছুদিন দূরে থাকার। তিনি যেহেতু জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মার্কিন নাগরিকত্ব বহাল রাখতে ক্রিস্টিনকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আমেরিকায় কিছুদিনের জন্য ফিরতে হয়। এবারে মাসখানেক সেখানে কাটিয়ে তিনি যখন ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে কলকাতায় ফিরে এলেন, বোঝা গেল তখনও নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব কাটেনি। অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি মায়াবতী রওনা হলেন।

নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে নিবেদিতা এবার উদ্যোগ নিলেন। ছ'মাসের জন্য স্কুলের ছুটি ঘোষণা করে মার্চ মাসে তিনিও গেলেন মায়াবতী। কিন্তু সেখানে তিনি কিছুতেই ক্রিস্টিনকে বিদ্যালয়ের কাজে পুনরায় যোগদানের ব্যাপারে সম্মত করাতে পারলেন না। ক্রিস্টিন তাঁকে সরাসরি জানিয়ে দিলেন, বোসপাড়া লেনে তিনি আর ফিরবেন না, কলকাতায় আদৌ কাজ করতে হলে, তিনি হয়তো ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলেই যোগ দেবেন।

তাঁদের দুজনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত বিশেষ কোনও ঘটনা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে জন্ম নিয়েছিল কিনা সে কথা এখন আর জানা সম্ভব নয়। দুই সিস্টারই পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সৌজন্যের কারণে স্পষ্টভাবে কিছু জানিয়ে যাননি।

তবে নিবেদিতার কিছু পত্রাংশ থেকে মনে হয় তাঁর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ক্রিস্টিনের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধাস্বরূপ হয়ে

দাঁড়াচ্ছিল । এরজন্য নিবেদিতার মনে বোধহয় কিঞ্চিৎ অনুতাপও এসেছিল । মিস ম্যাকলাউডকে তিনি লিখেছিলেন : ''(Jagadish Chandra Bose) told me very sweetly the other day that I could not have accepted from Christine, what she has accepted from me.'' মায়াবতীতে বিফলমনোরথ হওয়ার পর ম্যাকলাউডকেই তিনি লেখেন : ''It is not unreasonable that she (Christine) should require freedom and scope.'' অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতিতে ক্রিস্টিনের যে 'freedom and scope' -এর অভাব ঘটছিল, নিবেদিতা তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছিলেন ।

কিন্তু নিবেদিতাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবার পর এবার অনুতপ্ত হবার পালা ক্রিস্টিনের । অল্প কিছুদিন পরেই ক্রিস্টিন খবর পেলেন দার্জিলিঙে প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায় নিবেদিতা মৃত্যুশয্যায় । সব অভিমান ঝেড়ে ক্রিস্টিন তৈরি হলেন শেষ সময়ে নিবেদিতার পাশে থাকার জন্য । কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে । ১৩ অক্টোবর, ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতার অকালপ্রয়াণ । শোকস্তব্ধ ক্রিস্টিন জানতে পারলেন, নিবেদিতা তাঁর উইলে বোসপাড়া লেনের স্কুল পুরোপুরি ক্রিস্টিনেরই দায়িত্বে ছেড়ে গেছেন ।

* * *

প্রাথমিকভাবে অনাগ্রহী হলেও স্বামীজীর নির্দেশ এবং নিবেদিতার শেষ ইচ্ছার প্রতি অনুগত থাকতে ক্রিস্টিন ফিরে আসেন কলকাতায় । ভগিনী সুধীরার সহায়তায় আবার শুরু হয় সিস্টারদের বিদ্যালয়, তাঁদের কর্মকাণ্ড । আবার বহু ছাত্রী সমাগমে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে চলতে থাকে স্কুল ।

আর সেইসঙ্গে প্রচণ্ড পরিশ্রমে ভাঙতে থাকে ক্রিস্টিনের শরীর । সেই ছেলেবেলা থেকে যে মানুষটি ক্রমাগত কৃচ্ছ্রতার মধ্যে জীবন কাটিয়ে এসেছেন, আজ পরিণত বয়সের শরীর আর তা সহ্য করতে পারে না । ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে যখন তাঁর আটচল্লিশ বছর বয়স, স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় তিনি সাময়িক বিশ্রাম নিতে আমেরিকা ফিরে এলেন । স্কুলের দায়িত্ব ছেড়ে এলেন অনুগত সুধীরার ওপর ।

আমেরিকায় কয়েক মাসের বিশ্রাম আর আবহাওয়া বদলেই তিনি অনেকটা সুস্থবোধ করতে লাগলেন । মনে ভরসা এল, আবার কলকাতা ফিরে গিয়ে তিনি চালিয়ে যেতে পারবেন তাঁর বিদ্যালয়ের কাজ । কিন্তু বিশ্ব-পরিস্থিতি তখন দ্রুত বদলাচ্ছে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভেরী বাজতে শুরু করেছে । ক্রিস্টিন আটকে পড়লেন আমেরিকাতেই । নিকট ভবিষ্যতে ভারতে ফেরার কোনও সম্ভাবনাই রইল না ।

এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির কালেও কাগজে কলমে ক্রিস্টিনই ছিলেন স্কুলের প্রধান । ফলে বিভিন্ন প্রয়োজনে নেতৃত্ব নিয়ে নিশ্চয় কি প্রশ্ন উঠেছিল । সুধীরার পক্ষে অস্বস্তিকর এবং অসুবিধাজন হচ্ছিল সুষ্ঠু শৃঙ্খলায় স্কুলের কাজ চালিয়ে যেতে ।

দূরদর্শী ক্রিস্টিন বিষয়টি আঁচ করে সুধীরাকে এক দীর্ঘ চি লেখেন । সে নেহাত কোনও ব্যক্তিগত পত্র নয় । যে উত্তরসূরীকে লেখা দলনেত্রীর অনুপুঙ্খ নির্দেশিকা । একটি জরু অংশ এইরকম :

> *''I want you to consider yourself the permanent head of the school with full and independent authority, just as much as if I had passed out of the body in 1913, as I so nearly did. ...Do not feel that you are bound in any way to carry out my ideas. This is your work and you are free. I mean every word of that. ...We must produce a few women of unusual intellectral and spiritual power who will combine the best and noblest of the East and West without the faults of either... With a few such women we can safely leave the future. Until we have produced them neither you nor I can die... you will find that you have sources of strength and power that you never dreamed of.''*

শুধু এক যোগ্য সংগঠক নয়, এই চিঠি স্পষ্ট করে তুলে এক নিষ্কাম-নির্মোহ কর্মীকে । শিক্ষাদর্শ নিয়ে তিনি যা মত দিয়েছেন তাও নেহাত কথার কথা নয় । এ তাঁর স্থির বিশ্বাস শিক্ষার্থীদেরও তিনি বলতেন : "এস আমরা এক নতুন শিক্ষা গ্রহণ করি— যেখানে আমাদের ধারণাগুলি হবে আরও উদার এ বহুমুখী ।"

নিবেদিতা তাঁর প্রবন্ধে শিক্ষাব্রতী ক্রিস্টিনের যথার্থ মূল্যা করে গেছেন : "(ক্রিস্টিনের) আন্তরিক প্রার্থনা ছিল ভার নারীদের দেশীয় ভাবাদর্শের প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট করে, তা বিশুদ্ধ ও মহত্তর ভারত-ললনায় পরিণত করা । হাবেভাবে ত মার্কিন মহিলাদের অন্ধ অনুকরণ করবে এ তাঁর অভিপ্রেত ছি না । এমন এক চারিত্রিক সুষমা ও মহত্ত্ব তিনি তাদের দান কর চেয়েছিলেন যা তাদের মাতা-মাতামহীদের কাছে সশ্রদ্ধ স্বীকৃ পাবে । তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টার কথা যখন ভাবি, তখন মে

শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি যা কিছু গ্রহণ বা বর্জন করেছেন তা সবই সমান সুবিবেচনা প্রসূত । আমার দিক থেকে আমি এই মার্কিন ভগিনীকে বিদেশীদের শিক্ষাসমস্যার সমাধানে নিয়ত বিশ্বের মহান শিক্ষাব্রতীদের অন্যতম বলে মনে করি ।"

* * *

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ অবধি, দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ক্রিস্টিনকে আটকে থাকতে হয়েছিল আমেরিকায় । এইসময় এবং পরে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকাল থেকে ১৯৩০-এর মার্চে দেহত্যাগ পর্যন্ত সময় তিনি ডেট্রয়েটে ভারতীয় ইতিহাস, কৃষ্টি ও বেদান্তদর্শনের ওপর উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নিতেন । এইসব ক্লাসই ছিল বিনা পারিশ্রমিকে । বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেন এইসময়ের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং বিশ্বাস থাকলে ডেট্রয়েটের মতো (পাশ্চাত্য) শহরেও যে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করা যায়, ক্রিস্টিন তা দেখিয়ে গেছেন ।

বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বগুলি তিনি ব্যাখ্যা করতেন যে ক্লাসে, তারই এক মহিলা শ্রোতা লিখেছেন : "নির্ভুল তাঁর উচ্চারণ, অদ্ভুত সুসংহত কণ্ঠস্বর, সুপ্রাচীন কোনও দেবালয়ের পূজারিণীর মতো তাঁর আকৃতি... তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন ভারতকে জানতে ও ভালবাসতে । আর আলোচনার বিষয় একটিই ছিল । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কথা গীতামুখে অতি সুন্দরভাবে বলেছেন, 'আমি সর্বচরাচর ব্যাপ্ত হয়ে আছি ।' একথাটিই নানা বাস্তব ঘটনা ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে এমনভাবে বোঝাতেন যে শুনলে সেই ধারণার পুরোপুরি বিশ্বাসী না হয়ে উপায় ছিল না ।"

ক্রিস্টিন তাঁর ক্লাসে বলতেন : "এটি এক মস্ত ভুল ধারণা যে, ভাগ্যের ফেরে আমরা চাই বা না চাই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি এবং জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে যায় তার জন্য আমরা নাকি কোনভাবেই দায়ী নই । এই ভ্রান্ত ধারণার জন্যই মানুষ নিজেকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিতে ভয় পায়— ভাবে, তার দুঃখদুর্দশা, সংসারবন্ধন সবই বুঝি ভাগ্যের বিড়ম্বনা । কিন্তু এ এক চরম ভ্রান্তি । আমাদের ভাগ্যের টানাপোড়েন আমরাই নিজহাতে বুনে চলেছি । আমরাই আমাদের নিয়ন্তা ।"

শেষ পর্যন্ত ১৯২৪-এর জানুয়ারি মাসে তিনি বাগবাজারে ফিরতে পারলেন, দেখলেন বিগত এক দশকে তাঁদের স্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক সমৃদ্ধ, অনেক পৃথক । ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে, যেমন ভেঙ্গে পড়েছে স্কুলের সাবেক কালের অনেক রীতিনীতির আগল । ভগিনী সুধীরাও ইতিমধ্যে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে মারা গেছেন । যে চারাগাছকে আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে তাঁরা বড় করেছিলেন, সে আজ পল্লবিত বৃক্ষ । অনেক ঝড়-ঝাপটা সামলাবার ক্ষমতাধারী ।

ক্রিস্টিনের বুঝতে অসুবিধে হল না, এই স্কুলের আর তাঁকে প্রয়োজন নেই । বিদ্যালয়-প্রধানার পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি সরে দাঁড়ালেন ।

* * *

উত্তম শিক্ষক তিনিই, শিক্ষাকাল শেষ হলে শিষ্যের কাছে যিনি নিজেকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে পারেন । সিস্টার ক্রিস্টিন তেমনই তাঁর জীবনীশক্তি নিঙড়ে দিয়ে এক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানকে স্বাবলম্বী করে গেলেন । তার রুগ্ন শৈশব আজ শুধু স্মৃতির পাতায় । বাড়ন্ত প্রাণশক্তিতে সে আজ অমরত্বের দাবিদার ।

চিকিৎসক ও সাহিত্যসেবী ।

নিবেদিতার শিক্ষাভাবনা

সুব্রতা সেন

ভগিনী নিবেদিতার বহুমুখী কল্যাণী প্রতিভা বিচিত্র কর্মপথে সতত সঞ্চরণশীল হলেও মুখ্যত অগ্রসর হয়েছে শিশুশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষাকে উপজীব্য করে । তিনি ইংল্যান্ডে নিজ কর্মজীবন শুরু করেছিলেন শিক্ষিকারূপে, সারাজীবন নিজের পরিচয় দিয়ে এসেছেন : 'আমি একজন শিক্ষিকা' বলে । আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী, যাঁর কাছে তাঁর জীবনের অন্তিমকাল কেটেছিল, সেই অবলা বসুর লেখা থেকেও জানতে পারি, শেষের দিনগুলিতেও নিবেদিতা ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষা এবং সেই শিক্ষা কিভাবে দিতে হবে, সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও চর্চা করে গেছেন ।

নিবেদিতার শিক্ষা ও নারীশিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলির সংখ্যা নিতান্ত কম নয় । ভারতবর্ষে আসার আগে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে North Wales Guardian পত্রিকায় 'Papers on Women's Rights' নামে মননশীল ছ'টি প্রবন্ধ তিনি লেখেন, যার মধ্যে নারীর আদর্শ ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় । এছাড়া ১৮৯৬-৯৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে আসার প্রাক্কালে যখন তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানরত, সেইসময় পেৎস্তালৎসী ও ফ্রবেল-প্রবর্তিত মনস্তাত্ত্বিক কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি, যা New Education পদ্ধতি নামে পরিচিত ছিল, তার নিজস্ব প্রয়োগরীতি বর্ণনা করে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন । তার নাম Teaching the Three R's on Modern Principles. ভারতে আসার পর লিখিত শিক্ষাসংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ Hints on Education নাম দিয়ে প্রকাশিত হয় । সেই প্রবন্ধগুলির সঙ্গে 'Modern Review 'ও 'কর্মযোগিন্'-এ প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ একত্রিত করে National Education নাম দিয়ে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ উদ্বোধন থেকে প্রকাশ করেন । নিবেদিতার রচনাবলীর ৪র্থ খণ্ডে সেই বইটি Hints on National Education in India নামে সংগৃহীত হয়েছে । এই বইটিতে Primary Education: A Call for Pioneers না[illegible] একটি ; 2-7) Papers on Education নামে ছ'টি ; The P[illegible] of Foreign Culture in a True Education নামে এক[illegible] The Future Education of the Indian Women নামে এ[illegible] এবং The Project of the Ramakrishna School for Gi[illegible] নামে একটি— সব মিলিয়ে দশটি প্রবন্ধ আছে । অদ্বৈত আ[illegible] প্রকাশিত রচনাবলীতে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে Modern Rev[illegible]

পাঠরতা নিবেদিতা

ও প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত আরও আটটি প্রবন্ধ । প্রকাশকাল অনুসারে সেগুলি হল :

1) The Education of Woman—Modern Review—1908
2) The Education of Indian Woman— Prabuddha Bharata—1910
3) The Education of Woman—Modern Review—1911
4) Modern Education of Oriental Woman—Prabuddha Bharata—1928
5) Women and the Arts—Prabuddha Bharata—1929
6) The Educational Method—Prabuddha Bharata—1930
7) Hints on Practical Education—Prabuddha Bharata—1930
8) Child Garden Schools for India—Prabuddha Bharata—1931

এছাড়া Occasional Notes নামে রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে প্রবুদ্ধ ভারতে ১৯০৭, ১৯০৮, ১৯০৯ ও ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত যথাক্রমে চারটি প্রবন্ধ— 1) Creative Knowledge; 2) From the Concrete to the Abstract; 3) From the National to the International এবং 4) Fitness of Character. বর্তমান প্রবন্ধে নিবেদিতার ভারতে আসার আগে লেখা সাতটি ও ভারতে আসার পরে লেখা বাইশটি মোট ঊনত্রিশটি প্রবন্ধের সমান প্রাসঙ্গিকতা আছে। বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাব্যগুণসমৃদ্ধ এই লেখাগুলির মধ্যে একদিকে যেমন লেখিকার মননশীলতা ও হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে স্পষ্ট বোঝা যায়, স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হবার আগেই মার্গারেটের চিত্তভূমি তাঁর ভাবী কর্মের জন্য কেমনভাবে প্রস্তুত হয়েছিল । নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয়ের অল্পকাল পরেই স্বামীজী যে তাঁকে 'সিংহিনী' বিবেচনা করে ভারতীয় নারীদের শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করলেন, তা কোনও আকস্মিক ব্যাপার ছিল না । নারীর আদর্শ ও শিক্ষার ব্যাপারে স্বামীজীর সঙ্গে মার্গারেটের কী বিস্ময়কর মানসিক সাযুজ্য বর্তমান !

প্রবন্ধগুলি পরিক্রমাকালে তাই বুঝতে চেষ্টা করেছি কোন পটভূমিকায় মার্গারেট নোবল আপন মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন । স্বামীজী তাঁকে কি দিলেন ? পরিপূর্ণা এবং চরিতার্থা নিবেদিতা আধুনিক ভারতের নারীসমাজের কাছে কোন শিক্ষাদর্শ তুলে ধরলেন ? প্রথমে মার্গারেট নোবলের পটভূমি লক্ষ্য করা যাক ।

* * *

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে মার্গারেটের জন্ম । তাঁর জন্মের একশ বছর আগেই আমেরিকা ও ইউরোপে নবজাগৃতির সূত্রপাত ঘটেছে । ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে আধুনিক যুগে পদার্পণ ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উভয়ক্ষেত্রেই সমগ্র পৃথিবীতে অবিসংবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ ও ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব সাধারণ মানুষের মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছে । মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা এই মত ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে । এই জাগৃতির ঢেউ মেয়েদেরও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করেছে । ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেনের নারীবাদী লেখিকা ওলস্টোনক্রাফট নারীদের জন্য এই অধিকারের সম্প্রসারণ দাবি করলেন । উনিশ শতকে ব্রিটেনে নারী ও পুরুষের একই প্রকার শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় অনেক শিক্ষিত নারী নিজের যোগ্যতায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন । মার্গারেটের নিজের জীবন এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে । ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বস্তুতপক্ষে মার্গারেটের বড় হয়ে ওঠার কালে ব্রিটেনের নারীমুক্তি আন্দোলনে একটি চরমপন্থী ধারা আত্মপ্রকাশ করে । 'New Women' নামে পরিচিত এই নারীরা সমাজে পুরুষ- প্রাধান্য ও নারীর অমর্যাদার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন— এঁরা বিদ্রোহ করেন পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পুরুষের আত্মম্ভরিতা, আধিপত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে । কেবল সংসার সামলানো ও সন্তানপালনের মতো প্রথানুগ কর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে তাঁরা রাজি নন । তাঁরা মেয়েদের ওপর একতরফাভাবে চাপিয়ে দেওয়া ভিক্টোরিয়া যুগের নীতিবোধের অপসারণ দাবি করে পুরুষের মতো নৈতিক স্বাধীনতা দাবি করেন ।

এই নারীবাদী আন্দোলনের পটভূমিকায় আপসহীন, তেজস্বিনী নারী মার্গারেটের লেখা ছটি প্রবন্ধ আশ্চর্যরকম মধ্যপন্থী মনে হয় । এর কারণ খুঁজতে হবে মার্গারেটের পারিবারিক পরিমণ্ডলে । পরাধীন আয়ার্ল্যান্ডের এক আদর্শবান ও উদারনৈতিক যাজক পরিবারে মার্গারেটের জন্ম । জন্মসূত্রে তীক্ষ্ণধী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পরার্থপর ও স্নেহশীল মার্গারেট পরিবারের কাছ থেকে পেয়েছেন ঈশ্বরবিশ্বাস, আদর্শনিষ্ঠা, ঔদার্য ও স্বদেশপ্রেম । পিতার অকালমৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠসন্তান মার্গারেটের মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ । তাঁর মন সর্বদাই সৃজনাত্মক, গঠনমূলক ও আদর্শনিষ্ঠ । ছাত্রীজীবন থেকেই তিনি সমাজ সচেতন, সুবক্তা ও সুলেখিকা । ১৮৮৪ থেকে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কর্মরত । তখনই পেস্তালৎসী ও ফ্রবেলের নতুন শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে এবং এই পদ্ধতির তিনি উৎসাহী সমর্থক মাত্র নন, নিজস্ব প্রয়োগেও তৎপর । সেই প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বহন করছে তাঁর ১৮৯৬-৯৭ খ্রীস্টাব্দের লেখা প্রবন্ধটি । ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিশিষ্ট

শিক্ষাব্রতী মাদাম লিউ-এর সঙ্গে যৌথভাবে এবং ১৮৯৪-এ একক প্রচেষ্টায় একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল খোলেন। ১৮৯৫-এ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি নিজের স্কুলে নিজের পদ্ধতিতে শিক্ষাদানরত। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সমাজসেবা ও শিক্ষানীতি বিষয়ে মার্গারেটের প্রতিভা সমভাবে স্বচ্ছন্দচারী এবং বিখ্যাত সাহিত্যকেন্দ্র 'সিসেমী ক্লাব'-এর সম্পাদিকারূপে তিনি বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষভাবে আদৃত।

মার্গারেটের সদর্থক জীবনবোধ যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের চেষ্টায় তাঁকে সতত সক্রিয় করে রেখেছে তা কখনই New Women-দের মতো নারীকে তার পারিবারিক পটভূমিকা থেকে উৎপাটিত করে তার জন্য নেতিবাচক জীবনাদর্শ তুলে ধরতে সক্ষম ছিল না। মার্গারেটের মাতৃহৃদয় শিশুদের সামান্যতম অকল্যাণ আশঙ্কায় শিহরিত হত। তাঁর আদর্শবাদী ধর্মীয় পরিমণ্ডল তাঁকে দাবি-প্রতিষ্ঠার চেয়ে কর্তব্যসচেতন করেছে এবং ঈশ্বরের কাছে বিনম্র আত্মসমর্পণের মধ্যে তিনি গৌরব খুঁজে পেয়েছেন। মার্গারেটের এই মানসিকতার চমৎকার প্রতিফলন হয়েছে 'নারীর অধিকার' শীর্ষক ছটি প্রবন্ধে। এই ছটি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে যথাক্রমে নারীর সৌন্দর্যের, সেবার, গৃহনির্বাচনের, অগ্রগতির, জ্ঞানের ও শাসনের অধিকার। অধিকার শীর্ষক এই প্রবন্ধগুলিতে মার্গারেট প্রকৃতপক্ষে নারীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কারণ তাঁর মতে অধিকারের অন্য নাম দায়িত্বগ্রহণ।

নারীর সৌন্দর্যরক্ষার অধিকারের অর্থ স্বাস্থ্যরক্ষার কর্তব্যপালন। নারীর স্বাস্থ্যরক্ষা না হলে সমগ্র সমাজের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বিপন্ন হয়, তাই স্বাস্থ্যরক্ষা নারীর অবশ্যকর্তব্য। এই কারণেই প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত গৃহনির্বাচনের এবং এ ব্যাপারে নারীকেই তিনি অগ্রণী হতে বলেছেন। মার্গারেটের মতে, গৃহ নামক কর্মক্ষেত্রে নারী আত্মবিস্মৃত সেবার সুযোগ পায়, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন যে নারী সুষ্ঠুভাবে পারিবারিক জীবন পরিচালনা করতে পারেন, তিনি তাত্ত্বিক মহাপণ্ডিতার চেয়ে অনেক উঁচুদরের নারী এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে নারীর অধিকার বজায় রেখেছেন। এই অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই উত্তরকালে নিবেদিতা অনাড়ম্বর জীবনচর্যার মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের চারিত্রিক মহিমা অনায়াসে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

পুরুষদের সম্পর্কে মার্গারেটের বক্তব্য যেন স্বামীজীর উক্তিরই প্রতিধ্বনি। স্বামীজী বলেছেন : "নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে কোন জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক। তাহাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কথা বলিবার তোমরা পুরুষেরা কে ?" স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগেই নিবেদিতা লিখছেন : "পুরুষরা যখন উপলব্ধি করবেন মেয়েদের মন নামক পদার্থ আছে এবং যখন তাঁরা শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের কার্যক্ষমতার অবাধ সুযোগ দেবেন তখন দেখবেন মেয়েরা কেমন সহজে নিজেদের কাজ নিজেরাই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" নারীর অগ্রগতির ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে মার্গারেট দেখিয়েছেন উনিশ শতকের নারীপ্রগতিও জ্ঞানলাভের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। মার্গারেটের আশ্চর্য সিদ্ধান্ত, আদর্শ নারীর একাধারে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, একটি আত্মমর্যাদা ও অন্যটি আত্মবিলয়। উত্তরকালে নিবেদিতা শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে এই দুর্লভ দুটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন।

জ্ঞানের অধিকারে মার্গারেট বলেছেন, প্রতিভা নারী ও পুরুষ উভয়কেই আশ্রয় করে। প্রতিভাময়ীদের কথা বাদ দিলে সাধারণ নারীর জন্য সেই শিক্ষা প্রয়োজন, যাতে সে লাভ করতে যুক্তিচালিত শৃঙ্খলাপূর্ণ নৈতিক জীবনবোধ, যাতে সে নিজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারে। আমরা জানি স্বামীজীও বলেছেন : "যে শিক্ষায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারা যায় সেই শিক্ষাই শিক্ষা।" New Women-দের দাবি নস্যাৎ করে এই প্রবন্ধে মার্গারেট নারীর নৈতিক নীতিবোধ ও ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের দ্বারা সম্ভাব্য সকলপ্রকার পাপের প্রতিরোধ করতে বলছেন। শাসনের অধিকার প্রবন্ধে নিবেদিতা জানিয়েছেন বহির্জীবনে নারীর অধিকার অস্বীকার করা নয়, গৃহজীবনে অধিকার সংরক্ষণ করা বা দায়িত্ব-সচেতন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই অধিকার-সংরক্ষণ অর্থাৎ পারিবারিক দায়িত্বপালন না করতে পারলে নারীর বিবাহ করা উচিত নয়। মার্গারেট আশা করেছেন শিক্ষিত ও বিবেচক নারীর পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব এমন হবে যাতে নিম্নশ্রেণীর মানুষ উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হতে পারে। লক্ষণীয়, স্বামীজীও নিম্নশ্রেণীর মানুষের উন্নতির উপর জোর দিয়েছেন। ১৮৯৫-এ মার্গারেট স্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন। ১৮৯৬-এ স্বামীজী তাঁকে ভারতীয় নারীদের কাজে সাহায্য করার আহ্বান জানান।

* * *

(১) এতদিন নিবেদিতা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলের উপযোগী করে স্ত্রীশিক্ষার কথা ভেবেছিলেন; স্বামীজী তাঁকে অদ্বৈতচেতনায় অভিষিক্ত করলেন— যে চেতনায় মন্দির, বিদ্যালয়, ক্ষেতখামারে কোনও প্রভেদ ছিল না, সর্বত্রই বহুরূপে অবতীর্ণ একেরই উপাসনা এবং অদ্বৈতবাদীর পক্ষে সর্বাত্মবোধ বা বিশ্বপ্রেমই একমাত্র কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার হেতু। কারণ প্রেমী আপন বোধে সকলের সেবায় রত হয়। কাজেই স্বামীজী ভাবোচ্ছ্বাস বর্জন করে আত্মানুভূতির চেষ্টা করতে বলেছিলেন নিবেদিতাকে।

(২) স্বামীজী চেয়েছিলেন তাঁর মতানুযায়ী যদি কোনও

ইউরোপীয় ভারতের জন্য কাজ করেন তবে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রণালীতে ঐ কাজ করবেন। নিবেদিতা হিন্দুনারীর শিক্ষার জন্য কাজ করবেন বলে তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল : "তোমার জীবন হবে ভিতরে বাইরে যথার্থ নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিণীর মতো। এর সাধনের উপায় তুমি নিজে থেকেই জানতে পারবে যদি যথেষ্ট আগ্রহ থাকে। কিন্তু অতীত জীবন তোমাকে একেবারে ভুলতে হবে এবং অপরেও যাতে ভুলে যায় দেখতে হবে। তার স্মৃতি পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।"

(৩) যদি তাঁকে ভারতীয় নারীর শিক্ষাসংক্রান্ত কোনও সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহলে সর্বাগ্রে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান প্রণালীর অভিজ্ঞতা লাভ তাঁর পক্ষে অপরিহার্য এবং এই কাজের জন্য অনস্বীকার্য যোগ্যতা হল ছাত্র-ছাত্রীর দৃষ্টিতে জগৎ দেখা। ছাত্র-ছাত্রীর স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রতিকূলে শিক্ষাদান হিতের পরিবর্তে অহিতই করে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন পূর্ণ শৃঙ্খলার সঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে স্বামীজীকে তাঁর নিজের কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন স্বামীজীও তেমনভাবেই নিবেদিতাকে গড়ে তুললেন। স্বামীজী জানতেন আধুনিক ভাবকে জাতীয়তাসম্পন্ন এবং প্রাচীন ভাবকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তোলা দুঃসাধ্য কিন্তু যখন এটি করা যাবে তখনই জাতীয় শিক্ষার সূচনা হবে, তার আগে নয়। এই দুঃসাধ্য কর্মই স্বামীজীর কাছ থেকে নিবেদিতা দায় রূপে গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা লিখছেন : "স্বামীজীর মতে যথার্থ স্বাধীনতা হল পরোক্ষ, নীরব ও সাংগঠনিক। প্রথমে সমাজের প্রচলিত আদর্শগুলি নারীদের যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হবে। তারপর যতই তাঁরা অধিকতর গুণের অধিকারিণী হবেন ততই জাতীয়জীবনের নির্দেশ ও সুযোগগুলি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং ঐ নির্দেশপালন ও সুযোগ গ্রহণের দ্বারা তাঁরা আরও অনেক বেশি ভারতীয় ভাবাপন্ন হয়ে উঠবেন। অবশেষে উন্নতির এমন উচ্চশিখরে আরোহন করবেন অতীত ভারত যা কল্পনাও করতে পারেনি। নিবেদিতা শুধু যে স্বামীজীর অভিপ্রায় অনুসারেই কাজ আরম্ভ করলেন তাই নয়, তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিতে এই সমন্বয়ের আদর্শ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হতে থাকল তাঁর নিজস্ব অনবদ্য ভঙ্গিতে।

* * *

এদেশের নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নিবেদিতা তাঁর নিজস্ব রীতিতে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছেন যার মূল কথা হল :

(১) শিক্ষার্থীকে তথ্যসমৃদ্ধ করার চেয়ে তার অন্তর্নিহিত ধীশক্তির বিকাশসাধন।

(২) যাতে সে নিজের মত তৈরি করতে পারে (impression) এবং সেই মত কাজে পরিণত বা প্রকাশ করতে পারে (expression) তার সাহায্য করা।

(৩) শিক্ষণীয় বিষয়ের মূল সূত্রগুলি শেখানোর উপর জোর দেওয়া।

(৪) যতদূর সম্ভব ক্রিয়া ও অনুভূতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে চিন্তা ও যুক্তির মতো অমূর্ত স্তরে উন্নীত করা।

(৫) ক্রমে শিক্ষার্থীকে জানা বিষয় অবলম্বন করে অজানা বিষয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে স্বামীজীর মত ছিল বলে মনে হয় কারণ তিনি ছাত্রাবস্থায় যে কেবল Herbert Spencer-এর Education নামক বইটির বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাই নয় পেস্তালৎসির লেখাগুলির সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন, একথা নিবেদিতার কাছ থেকেই আমরা জেনেছি।

স্বামীজী নিবেদিতাকে মানসিক প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছিলেন। নিবেদিতা বুঝেছিলেন, তাঁকে প্রথমে মেয়েদের প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে হবে, তাঁর স্থান কোথায় সেটা নির্ধারণ করতে হবে এবং যে সমাজের উন্নতির জন্য তিনি তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টা প্রয়োগ করবেন সে সমাজ সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে হবে। আমরা জানি শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে বাস নিবেদিতার সামাজিক বাধা অনেকাংশে অপসারিত করেছিল এবং হিন্দুসমাজের রীতিনীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান-অর্জনে সাহায্য করেছিল।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কালীপূজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণের নামে এই বিদ্যালয়ের শুভারম্ভ হয়। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং এর প্রতিষ্ঠাকালীন পূজা সম্পন্ন করে এই মর্মে তাঁর আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন : "এই বিদ্যালয়ের উপর যেন জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।"

'The Project of the Ramakrishna School for Girls' নামক প্রবন্ধে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন— গঙ্গাতীরে একখণ্ড জমি ক্রয় করে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর তত্ত্বাবধানে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে রেখে কুড়িজন অনাথা ও কুড়িজন বিধবাকে নিয়ে প্রথম কাজ শুরু করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে আর একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে উন্নতমানের শিল্পকলা শেখানো হবে। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শেখানো হবে বাংলা, ইংরেজী, ভাষা ও সাহিত্য, প্রাথমিক গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল। আঠারো থেকে কুড়ি বছরের বিধবাদের সাহায্যে দেশীয় আচার কাসুন্দী, চাটনী ইত্যাদির ব্যবসায়িক সংগঠন করা এবং ইংল্যান্ড, ভারতবর্ষ ও আমেরিকার বাজারে এইগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

স্বামীজী বিশেষভাবে নিবেদিতাকে বলেছিলেন পুরোনো

কলাবিদ্যাগুলির উদ্ধার করতে, নানারকম শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে চেয়েছেন মেয়েরা যেন প্রয়োজন হলে জীবিকা অর্জন করতে পারে, কাজেই এই উদ্দেশ্যেই নিবেদিতা ব্যবসায়িক সংগঠনের কথা ভেবেছেন ।

নিবেদিতা আরও বলেছেন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত বালিকাদের মধ্যে যারা ইচ্ছুক তারা বিবাহ করবে, যারা স্বদেশ ও নারীজাতির সেবার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক তাদের দ্বারা ভবিষ্যতে নূতন নূতন রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় গড়ে তোলা যেতে পারে । এই ধরনের উৎসর্গীকৃত শিক্ষয়িত্রীর কথাও স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, যাদের কর্মক্ষেত্র ছাড়া গৃহ থাকবে না, ধর্মই হবে একমাত্র বন্ধন এবং ভালবাসা থাকবে গুরু, স্বদেশ ও জনগণের প্রতি ।

নিবেদিতা নিজেই বলেছেন, বিদ্যালয়টি তিনি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছিলেন । ভগিনী ক্রিস্টিন এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন । কিন্তু এই বিদ্যালয়কে উপলক্ষ করে ভারতীয় নারীর শিক্ষার বিষয়টি নিবেদিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে উঠল যার ফলে জগৎ পেল নারীশিক্ষা সম্পর্কিত অমূল্য রচনাবলী ।

স্বামীজীর অদ্বৈতদৃষ্টিতে 'মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা বিরাজিত শিক্ষা হল তারই প্রকাশ ।' তিনিই যথার্থ শিক্ষিত যিনি সকলের মধ্যে নিজেকে ও নিজের মধ্যে সকলকে অনুভব করতে পারেন (সর্বভূতেষু আত্মানমাত্মনি সর্বভূতম্) । প্রকৃত শিক্ষকের কাজ তাই মালীর মতো, তিনি শিক্ষার্থীর বিকশিত হবার বাধাগুলি অপসারিত করে দেবেন মাত্র, শিক্ষার্থী নিজেই শিখবে । নিবেদিতাও বললেন : ''None is really taught by another. True teaching is always self-teaching. Real education is self-education.'' ফুল যেমন একদিনে ফোটে না, শিক্ষার্থীর বিকাশও তো একদিনে ঘটে না । নিবেদিতা চেয়েছেন ভারতীয় নারীর প্রকৃতি ও পরিমণ্ডল সম্পূর্ণ বজায় রেখে তার ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটানো এবং এই জাগ্রত ব্যক্তিসত্তার পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সত্তায় ক্রম পরিণতি । কাজেই গ্রহণযোগ্য শিক্ষার মূল কথা নৈতিক চরিত্রগঠন, ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণ কারণ ইচ্ছাশক্তির মহত্ত্বই সংস্কৃতির মাপকাঠি— ''Education is above all a moral function ...in reality (it) means training of the will. The nobility of will is the final test of culture.''

'Fitness of character' প্রবন্ধে নিবেদিতা বলছেন : "মানুষের রুচি তার চরিত্রের পরিচয় বহন করে, রুচিশীল মানুষ কখনও অশালীন হতে পারেন না । তাঁর আচরণ সর্বদাই পরিশীলিত ও শোভন । তিনি নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে সকলকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি মুক্তমনা তাই অপরকে স্বাধীনতা দিতে জানেন । তাঁর আপাতশান্তভাবের অন্তরালে হৃদয় মন তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল থাকে, তাঁর অবসর মুহূর্তগুলিও উচ্চভাবে যাপিত হয়— সর্বদাই তিনি মানুষের কল্যাণকারক । ভারতীয় নারীর ... উপযুক্ত শিক্ষা এমন হবে যাতে তার মানসিক ও আধ... বৃত্তিগুলি পরস্পরের সহযোগিতায় পূর্ণভাবে বিকশিত হ... পারে ।"

ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যে বহু মহিমময়ী নারী... বিদ্যমান । আধুনিক নারী অনায়াসেই সেখান থেকে ... 'পছন্দসই আদর্শ বেছে নিতে পারে । আমাদের সামনে ... বীরাঙ্গনা পদ্মিনী, চাঁদবিবি, ঝান্সীর রানী, আছেন কবি ও ... মীরাবাঈ, সুশাসিকা রানী ভবানী, অহল্যাবাঈ, পাতিব্রত্যে ... সতী, সাবিত্রী, সীতা ; কৌমার্যে পবিত্র উমা, আছেন অতু... গান্ধারী । এই সকল চরিত্রের অনুকরণ করার শিক্ষা না ... তাঁদের মূল চরিত্রের অনুধ্যান করার সঙ্গত শিক্ষাই এ ... ভারতীয় নারী পেয়ে এসেছে । আধুনিক ভারতীয় নারী... জাতীয় ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তার ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে স... করে তুলতে হবে । এটাই আমাদের প্রথম কর্তব্য । ''Our ... duty is to convince the Indian girl in her heart, ... conscience, her intellect and her will that she is In... indeed and not a foreigner.'' শিক্ষা ইচ্ছাশক্তির উপর ... করে, অনুভূতি ও প্রজ্ঞা হয় তার সহায়ক । এই আত্মসংযম, ... ও প্রেম আধুনিক ভারতীয় নারীর শিরোভূষণ হোক : "S... control then, with wisdom and love must be the cr... of educated woman.''

উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত নারীকে জীবনের সকল কাজে ... হতে হবে, জীবনের প্রতিটি কাজ পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে সু... সম্পন্ন করতে হবে । ভারতীয় নারী যেমন যত্নে গৃহদেবতার ... করে অথবা পরিবারের সকলের জন্য রন্ধন করে তেমনই ... শিখে নিক প্রয়োজনীয় জাগতিক বিদ্যা যা অর্জন করে পা... নারী তার ব্যবহারিক জীবনে উন্নতি করেছে । একজন ... সেবিকার কাছ থেকে কেবল স্নেহের উত্তাপ আকাঙ্ক্ষিত ... প্রত্যাশিত সেবাকার্যে উপযুক্ত জ্ঞান ও নৈপুণ্য । নিবে... বলছেন : "জীবনের সকল অবস্থায় দক্ষতা লাভ, পত্নীত্বের ... নারীত্ব, নারীত্বের পূর্বে মানবত্বে আরূঢ় হবার বৈশিষ্ট্য ... নারীশিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত ।"

বর্তমান যুগ প্রত্যেক নরনারীর কাছ থেকে দৃষ্টিভঙ্গির প্রস... দাবি করে । কোনও সমস্যাই কেবল নিজের ক্ষুদ্র ... আবেষ্টনীর কথা ভেবে সমাধান করা যায় না । আমরা যে ... গ্রহণ করি বা যে পোশাক পরি তার সঙ্গে দায়িত্ব আসে ... সম্বন্ধে যারা সেগুলি তৈরি করেছে কারণ তাদের ভালমন্দের ... জড়িয়ে আছে আমাদের সন্তানসন্ততির সুখ-সমৃদ্ধি । ... কুলীর স্বার্থ জড়িয়ে আছে পাঞ্জাবী শ্রমিকের স্বার্থের সঙ্গে । ... বোঝার ও বিচার করার জন্য চাই বৌদ্ধিক প্রস্তুতি । নিবে...

তাই আশা করছেন আধুনিক ভারতীয় নারীর শিক্ষায় কঠোর বৌদ্ধিক সংযম ও তথ্যের সাগ্রহ জ্ঞান সম্মিলিত হোক প্রাচ্য নারীর পেলব রমণীয়তা ও গভীর জননী-প্রজ্ঞার সঙ্গে : "Severe intellectual discipline and anxious knowledge of facts must be added to the delicate grace and deep mother wisdom of the oriental woman."

এই কারণেই কেবল পড়া, লেখা ও সাধারণ অঙ্কের জ্ঞান যথেষ্ট নয়, চাই ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের শিক্ষা যা যথাক্রমে বিশ্বচেতনা, কালচেতনা ও তথ্যনিষ্ঠা গড়ে তোলে । এই শিক্ষা শুরু হবে পরিচিত থেকে অপরিচিত বিষয়ে, জানা থেকে অজানায়, সহজ থেকে দুরূহ বিষয়ে, নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে বিশ্বের সংযোগে । শিক্ষা শুরু হবে প্রকৃতির সজীব সান্নিধ্যে যাতে সহানুভূতি, সত্যবাদিতা ও নির্ভুলতার শিক্ষা হবে ।

নিবেদিতা বারে বারে বলেছেন আধুনিক কালের সমন্বয় হল বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়, এই তিন বিদ্যার পরিধির মধ্যেই আধুনিক মন বিচরণ করে । ভারতবর্ষ এখন যে জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তা আমাদের নানা জাতি, নানা ভাষা ও নানা উপাদানে গঠিত ভারতের ইতিহাস পাঠেরই ফল । তেমনিভাবে আমাদের নবজাগ্রত পৌরচেতনার বিষয়টিও আমাদের দেশের নগরগুলির ইতিহাস পড়ে জানতে হবে । নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে একজন ভারতীয় শিক্ষার্থীকে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে তার শিক্ষা জাতীয় ও পৌরচেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কিনা । এখন শিক্ষার্থীর সামনে কোনও বিবৃতির আধ্যাত্মিক বা আবেগময় দিকটি তুলে ধরলেই তাকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হবে না, তাকে বিশ্লেষণ করতে শেখাতে হবে বিবৃতিটির সীমাবদ্ধতা কোথায় । সজাতীয় ভাবনার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি এবং এই বিশেষ বক্তব্যে উপনীত হবার জন্য জাতিকে কি কি পদক্ষেপ নিতে হয়েছে । এক কথায় শিক্ষার্থীর মানসিক শিক্ষা কেবল বর্ণনাত্মক বা অনুভূতিপ্রবণ হবে না, হবে বিশ্লেষণাত্মক ।

এইরূপ একজন সুশিক্ষিতা নারী একজন অশিক্ষিতা নারীর চেয়ে অনেক বেশি সুগৃহিণী হবে । একজন অশিক্ষিতা নারীর পক্ষে গুরুজনের আদেশের কাছে নতমস্তক হওয়াই মহৎ প্রচেষ্টা, আদেশ শিরোধার্য করে কাজ করতেই তারা অভ্যস্ত । শিক্ষা নারীর মধ্যে যে দায়িত্ববোধ সঞ্চারিত করবে তার বলেই সে কাজ করবে । দেশবাসীর প্রতি তার ভালবাসা ও করুণা, তাদের স্বার্থ বোঝার মতো প্রজ্ঞাই তাকে আধুনিক, পরিশীলিত ও মহৎ মানুষ রূপে চিহ্নিত করবে । "It is her awakened sense of responsibility that constitutes the truly educated woman. It is her love and pity for her own people and the wisdom with which she considers their interests that marks her out as modern and cultivated and great." সমগ্রের মধ্যে সামান্য অংশ পূর্ণ করা ছিল প্রাচীন নারীর বিধিলিপি । নবীন শিক্ষিত নারী সৃজন করবে সেই সমগ্র যার মধ্যে তার নিজের জীবন এক প্রয়োজনীয় অংশ । "To fill a small part in a great whole was the ancient destiny of woman : to create that whole in which her own life is to form a part is the modern demand upon her."

মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করে নিবেদিতা শিক্ষিত ছাত্রদের কাছে আবেদন করেছেন তাঁরা যেন ছুটির সময় নারীশিক্ষার কাজে অংশ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন । অন্যরা মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করতে পারেন এবং যে সকল প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্যালয় নেই সেখানে বইপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন ।

অপরপক্ষে পিতামাতার কাছে নিবেদিতা আবেদন করেছেন তাঁরা যেন মনে না করেন সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠালেই তাঁদের কর্তব্য শেষ হল । ভারতের প্রতি গৃহে জাতীয় আদর্শগুলি যথা পারিবারিক জীবনে সংঘবদ্ধতা, দানশীলতা, মিতব্যয়িতা, মর্যাদাবোধ ও বীরপূজার রূপায়ণ ও কাব্যরসসিক্ত পুরাণকথাগুলির আলোচনা হওয়া উচিত । শিশুরা পিতামাতার আলাপচারিতা থেকেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পেয়ে থাকে । National feeling বা জাতীয়চেতনার অর্থ হল সংঘবদ্ধভাবে নিঃস্বার্থতার অভ্যাস করা । এজন্য চাই পারিবারিক সচেতনতা । শিশু যদি দেখে বাড়ির বড়রা নিজের চেয়ে পরের ভালর কথা বেশি ভাবেন, অন্যায়ের প্রশ্রয় না দেন, পরের ন্যায্য সম্মান রক্ষার জন্য নিজে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন তাহলে গৃহেই সে জাতিগঠনের উপযুক্ত শিক্ষা পায় ।

এশিয়াতে চীন ও ইউরোপে ফ্রান্স জেনেছে জনচেতনাকে কিভাবে ধর্মে পরিণত করতে হয় । জার্মানী জানে জার্মান সমস্যার সমাধানে সমগ্র জার্মান চিত্তকে সংগঠিত করতে । একান্নবর্তী কাঠামোয় আমরা পারিবারিক সংঘবদ্ধতা শিখেছি, জাতীয় জীবনে এই সংঘবদ্ধতা আনতে হবে । কাজেই প্রতি ভারতীয় শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্য হোক কেবল তার নিজের কল্যাণ নয়, জন, দেশ ও ধর্মের কল্যাণ— পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বলতে গেলে যা হল : "The development of the individual for the benefit of the environment." পরিশেষে নিবেদিতা বলছেন আমরা জাতীয় উন্নতির কথা বলি বলে আমরা আন্তর্জাতিকতাবিরোধী নই । সংস্কৃতির যে-কোনও শাখারই দুটি স্তর আছে । একটি বিকাশ অপরটি মুক্তি । আমরা প্রথমে নিজেদের সংস্কৃতির সদ্‌গুণগুলির বিকাশ করলে যে-কোনও সংস্কৃতির সদ্‌ভাবগুলির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারব । এইটি মনের মুক্তি । শিক্ষা মানুষমাত্রকেই মানবতার পূজারী করে মানবাত্মার অর্জিত জ্ঞানের অধিকারী করে । আমাদের নিজেদের ভাবাদর্শে শিক্ষা বস্তুতপক্ষে অন্যসকল ভাবাদর্শের আস্বাদনের প্রস্তুতি ।

প্রধান অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, বেথুন কলেজ ।

একটি পারিজাত পুষ্প

প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা

পারিজাত ! সে তো মর্তের পুষ্প নয় । অথচ স্বামীজী সুদূর আয়ার্ল্যান্ডের সেই অনাঘ্রাত পুষ্পটিকে আহরণ করে এনে অর্পণ করেছিলেন শ্রীশ্রীমার পাদপদ্মে । আশ্চর্য, শ্রীশ্রীমা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন । সাদরে তাঁকে গ্রহণ করলেন । কোন যাদুবলে নিমেষে যেন প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মিলন ঘটে গেল । স্বামীজীও পরম নিশ্চিন্ত । এবার সে পুষ্পের ধীরে ধীরে নিজেকে বিকশিত করার পালা । এখন তো সে ভারতের । ভারতবর্ষই তার ধ্যানজ্ঞান । ভারতের জন্য সে নিবেদিত, বলিপ্রদত্ত ।

* * *

শ্রীশ্রীমা তাঁর এই আদরের কন্যাটিকে 'খুকি' বলে ডাকতেন । খুকির প্রাণের সাধ ভারতবর্ষের মেয়েদের ভারতীয় রীতিতে শিক্ষালাভের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করবেন । স্বামীজী স্বয়ং তাঁকে ঐ কাজে উৎসাহ দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন : "ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারীর... প্রয়োজন ।... তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে ।" সেই আহ্বানেই তাঁর ভারত-আগমন, নিঃশেষে আত্মসমর্পণ ।

স্বয়ং মাতাঠাকুরানী বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করলেন ১৩ নভেম্বর ১৮৯৮, শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন । এ যেন এক অমৃতযোগ— এক আশ্চর্য সমাপতন ।

* * *

কত যত্নে কত স্নেহে এই শিশু বিদ্যালয়টিকে ঘিরে ভগিনীর স্বপ্ন ক্রমে বাস্তবায়িত হয়েছিল । সমাজের শত বাধাবিপদ [illegible] উন্নতিকে স্তব্ধ করতে পারেনি । কী অসাধ্যসাধনের ব্রত [illegible] নিয়েছিলেন এখনও তা কল্পনা করা অসম্ভব । বিবেকের [illegible] দুর্বার গতিতে দিকে দিকে তিনি জাগরণের বাণী [illegible] চলেছেন । এক আধারে এতো প্রতিভা !

কিন্তু সময় তাঁর বড় সীমিত । বিধাতার কী নিষ্ঠুর [illegible] নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েও তিনি যেন তৃপ্ত [illegible] পারছেন না ।

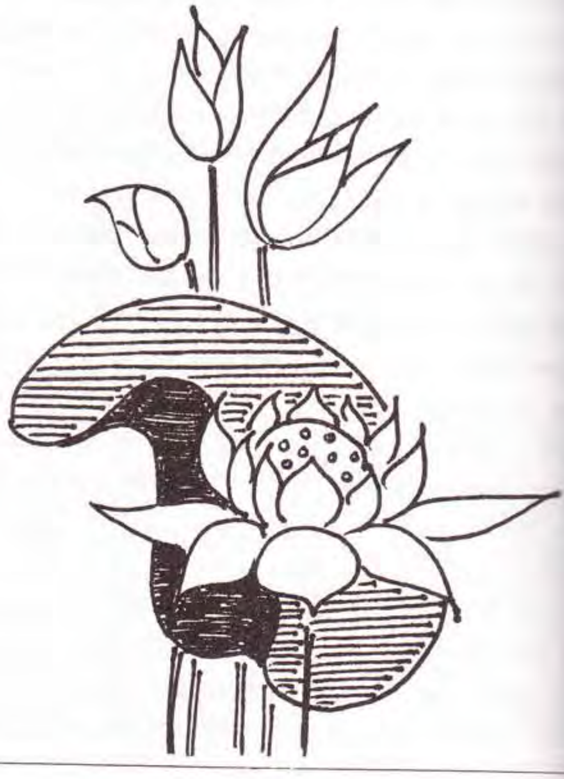

অকস্মাৎ বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত হল । যিনি পৃথিবীতে আসার আগে থেকেই দেবকার্যের জন্য নির্দিষ্ট, অথবা আমরা বলব, ভারতের জন্য নিবেদিত, তাঁর অপার্থিব সত্তাকে পার্থিব জগৎ বেশিদিন আবদ্ধ রাখতে পারল না । ঝরে পড়ল স্বর্গের পারিজাত ।

দেবতাত্মা হিমালয়ের অনন্ত ধ্যানমগ্নতায় নিবেদিতার সত্তা লীন হয়ে গেল । দার্জিলিঙের নিভৃত শ্মশানভূমির স্মৃতিফলকে সামান্য কয়েকটি শব্দে লেখা হল অসামান্য এক শ্রদ্ধার্ঘ্য : "এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিত— যিনি ভারতবর্ষকে তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন ।"

* * *

ওগো দেবী নিবেদিতা, শতবর্ষ পরে ।
তোমার আশিস হতে ফিরায়ো না মোরে ॥

প্রধান পরিচালিকা, শিল্পবিভাগ, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল ।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস আমরা যাহা-কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না । মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড়ো তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না । ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন ; তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই— প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সেজন্য মানুষ যতপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন । এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন— নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না— নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না— ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না ।

এই যে এতবড়ো আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না । এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না । ইহার পশ্চাতে কত বড়ো একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কী বুদ্ধি, কী হৃদয়, কী ত্যাগ, প্রতিভার কী জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে ।...

ভগিনী নিবেদিতা যে-সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনোটারই আয়তন বড়ো ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র । নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড়ো আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে । ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারে সম্ভবপর ছিল না । তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন । যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড়ো করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড়ো করিয়া দেখাইতে হইলে যে-সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয় তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন ।

এইজন্যই এই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মতো একেবারেই নহে ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুন্দরের উপাসনায় নিবেদিতা

প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা

আয়ার্ল্যান্ডের এক আদর্শনিষ্ঠ যাজক পরিবারে জন্মেছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল । উত্তরকালে ইনি ভগিনী নিবেদিতা নামে ভারতে সুপরিচিতা হন । মেধাবিনী ও তেজস্বিনী এই কন্যার মধ্যে শৈশবেই দেখা গিয়েছিল নিসর্গপ্রীতি আর সৌন্দর্যবোধ । তাই ছাত্রীজীবনেই জাগ্রত হয়েছিল শিল্পের প্রতি ঔৎসুক্য এবং গভীর অনুরাগ । তাঁর বোন মিসেস উইলসন এবং ভাই রিচমন্ড নোবলের স্মৃতিচারণ থেকে একথা জানা যায় । প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী বালিকা মার্গারেটের পক্ষে বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষোভ ও কষ্টের কারণ হয়েছিল । কিন্তু ওই একই কারণে তিনি গ্রন্থ, শিল্প ও ধর্মাচরণের মধ্যে তৃপ্তি ও আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন । মিসেস উইলসন লিখেছেন : "সহজাত সৌন্দর্য ও শিল্পবোধের কারণে সে কিছু সময়ের জন্য রোমান ক্যাথলিক মতের প্রতি আকৃষ্ট হয় ।" ভগবান যীশুর জীবন ও বাণীকে অবলম্বন করে ওই সম্প্রদায়ের বহু শিল্পি-রচিত চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের নিদর্শন জগতে বিখ্যাত হয়েছে । হয়তো এইজন্য ওই মতের প্রতি মার্গারেট আকর্ষণবোধ করেছিলেন । পরে তাঁর মানসজগতে বিভিন্ন খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের প্রভাবও পড়ে । রিচমন্ডের মতে ওই সবের মধ্যে তিনি তাদের ঐতিহ্যধারা, ধর্মানুষ্ঠানের শিল্পসুষমা ও নাটকীয়তা লক্ষ্য করেছিলেন । শুধু তাই নয়, "তার মন সর্বদাই শিল্পের ভাবাকুতিতে পূর্ণ থাকত— সে যুক্ত হতে পেরেছিল অতীত সন্তগণের যুগের সঙ্গে ।"

নিজের শিক্ষা শেষ করে মার্গারেট লন্ডনে এসে শিক্ষকতার কাজ নেন । বিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি নানাবিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ছিল ব্যাপক এবং গভীর । ছিল তাঁর স্বকীয় চিন্তাধারা । আর বক্তৃতা বা প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সেগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তরুণী মার্গারেট রীতিমত সক্ষম ছিলেন । আদর্শ শিক্ষাব্রতী হিসাবে তিনি কেবল গতানুগতিক শিক্ষয়িত্রীর কাজে কোনদিন সীমাবদ্ধ থাকেননি । লন্ড গুণিসমাজ তখনই তাঁর রচনাশক্তি ও বাগ্মিতার পরি পেয়েছিল । মনস্বিনী মার্গারেট প্রাচীন ধর্মকেন্দ্রিক চিত্রক অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সমকালীন শিল্প নিয়েও চিন্তা, করতেন । পঁচিশ বছর বয়সে তিনি উইম্বলডনে নিজে এক বিদ্যালয় খোলেন । শিল্পী এবেনজার কুক তখন তাঁর সহকর্মীদের অন্যতম । রঙ ও তুলির সাহায্যে কুক ফ্রবেল পদ্ধ অনুশীলন করতেন । শিক্ষণবিদ্যায় কুকের শক্তির মার্গারেটের অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল । এঁর কাছে তিনি চিত্র সম্বন্ধে সাগ্রহে শিক্ষালাভ করেন ।

জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই মার্গারেট ছিলেন সুলেখি চিত্রধর্মী বর্ণনার গুণে তাঁর রচনাগুলি অনেকসময় হয়ে সুগভীর ভাবপূর্ণ । মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি নারীর অধি বিষয়ক এক প্রবন্ধে শিল্পজগতের একটি বড় কথা লিখেছিলেন তাঁর ভাষায় : "ফ্যাশনের পুতুলের দল বোঝে না আর্টের ফ্যাশনের তফাত কোথায় । আর্ট দিয়েছে— গ্রীক দেবদেবী স্থায়ী লাবণ্য, রাফায়েলের সেন্টদের নারীমডেল, দিয়েছে রুবে সৃষ্টি-সন্ততিদের । আর ফ্যাশন থেকে পাওয়া গিয়েছে ভিক্টো যুগের কোমরে দড়ি বাঁধা পোশাকের খ্যাপামিকে ।"

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ । স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন লন্ড বেদান্তপ্রচারের উদ্দেশ্যে । ধর্মপিপাসু ও সত্যানুসন্ধানী মার্গা তাঁর এক বান্ধবীর গৃহে আমন্ত্রিত হয়ে স্বামীজীর সাক্ষাৎ করলেন । স্বামীজীর চরিত্রের প্রজ্ঞা, সারল্য, পবিত্রতা ও তাঁকে অভিভূত করল । স্বামীজীর ধ্যানপরায়ণ মুখাবয়বে তি দেখতে পেলেন রাফায়েলের আঁকা দিব্যশিশুর মুখের সৌসাদৃশ্য

স্বামীজীর পদপ্রান্তে উপনীত হয়ে মার্গারেটের উত্তরণ হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতায় । সে এক অপূর্ব ইতিহাস । মার্গারেটের স্বভাব ছিল অশেষ সদ্‌গুণে ভূষিত । বিদুষী, প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্না এবং শুদ্ধমনা এই মহীয়সী কন্যাকে স্বামীজী জগজ্জননীর চরণে উৎসর্গ করেন ।

স্বামীজীর কাছেই ভারতপরিচয় লাভের দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয় । দুর্লভতর আন্তরিকতা ও অন্তর্দৃষ্টিসহায়ে তিনি ভারতকে বিশ্বের সর্বোত্তম দেশ বলে, আপন প্রিয় আশ্রয় বলে গ্রহণ করেন । তাঁর অন্যতম প্রধান জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা মাতাজী লিখেছেন : "ভগিনী নিবেদিতার মধ্য দিয়া যে দৈবীশক্তির এক বিশেষ প্রকাশ ঘটিয়াছিল, ভারতের জাতীয় জীবনের নব জাগরণের প্রতি পদক্ষেপে তাহার পরিচয় পাই । শিক্ষায়, সেবায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, রাজনীতিতে তাঁহার অবদান ভারত-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ।"

ভগিনী নিবেদিতা ও কয়েকজন পাশ্চাত্য অনুগামীদের নিয়ে স্বামীজী ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান তীর্থ এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করেছিলেন । সেটি নিবেদিতার ভারতীয় জীবনের প্রথমভাগেই ঘটে । স্বামীজী তাঁদের কাছে পরমাগ্রহে স্বদেশের ঐতিহ্য, গৌরব, যন্ত্রণা ও মহিমার কথা এই ভ্রমণকালে প্রাসঙ্গিকভাবেই আলোচনা করতেন । শিল্পবিষয়ে তিনিও চির অনুরাগী । পরিব্রাজক জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা, বিশাল অধ্যয়ন, গভীর রসবোধ ও বিচারশীলতায় স্বামীজীর জ্ঞানভাণ্ডার ছিল অসামান্য । দেশের ও বিদেশের বহু শিল্পনিদর্শন তিনি স্বচক্ষে দর্শন করেছিলেন । স্বামীজীর কাছেই নিবেদিতার ভারতীয় শিল্পদীক্ষা হয়েছিল । স্বামীজী তাঁদের কাছে কেবল বিখ্যাত স্থানসমূহের চিত্র-স্থাপত্য প্রভৃতির সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতেন তা নয়, এদেশের খেত-খামার ও জনজীবনের অন্তর্বর্তী মাধুর্য ও মহত্ত্বও বুঝিয়ে দিতেন । এইভাবেই নিবেদিতা অজন্তা, ইলোরা, আগ্রা, দিল্লী, কাশী, নালন্দা, চিতোর, উদয়পুরের শিল্প-সৌন্দর্যের মহিমা অনুভব করে শিল্পীর ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনায় সার্থক হয়েছিলেন । ভারতীয় শিল্পসম্বন্ধে কয়েকটি দৃঢ়প্রত্যয় তিনি গুরুর কাছ থেকেই প্রাপ্ত হন । গ্রন্থাদি রচনা করে এবং সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনায় তিনি সমকালীন শিল্পী, শিল্পসমালোচক ও ব্যবস্থাপকদেরও বিশেষ প্রভাবিত করেন । বলতে গেলে আধুনিক ভারতের শিল্প আন্দোলনে নিবেদিতার একটি অবিসংবাদী ভূমিকা ছিল । জাপানী শিল্পবিশেষজ্ঞ ওকাকুরা, কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এ. বি. হ্যাভেল, পণ্ডিত আনন্দ কুমারস্বামী, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নিবেদিতার জীবনেতিহাসে সগৌরবে যুক্ত হয়ে আছেন । আর সেযুগের উদীয়মান প্রতিভাবান শিল্পী তরুণবৃন্দের মধ্যে অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু প্রমুখের জীবনে ভগিনীর ভাবাদর্শ ও স্নেহের প্রভাব কতখানি, তা নিয়ে আজ ফের বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে মহাগ্রন্থ লিখছেন । মোটকথা নিবেদিতা ছিলেন ভারত-উপাসিকা । তাঁর গুরুভক্তি একটা ভাবমাত্র নয় । বরং মননে, কথনে, ক্রিয়ায় সর্বভাবেই তাঁর গুরুভক্তি ভারতপূজায় পরিণত হয়েছিল । স্বামীজী বলতেন, ধর্মই ভারতীয় জীবনের মূল সুর । আর ধর্ম ও শিল্প এদেশে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত । নিবেদিতাও তাঁর সমগ্র বাণী ও রচনায় যা কিছু ভারতীয় তাকেই অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়েছেন । আর ভাবী ভারতসন্তানদের আহ্বান জানিয়েছেন— স্বদেশের মহিমা জানতে ও তার নবায়নে ব্রতী হতে ।

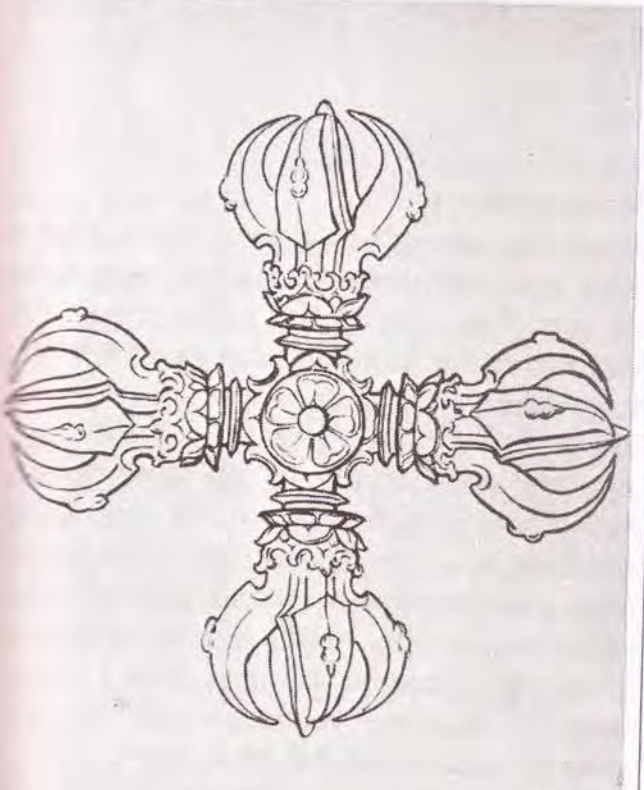

[illegible]রের আঁকা বজ্র

এদেশে আগমনের পরের বছরেই ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে ও মে মাসে কালীঘাটের কালীমন্দির প্রাঙ্গণে নিবেদিতা কালী ও কালীপূজা বিষয়ে দুটি অপূর্ব ভাষণ দান করেন । কলকাতার বিদ্বৎসমাজ তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, বিশ্লেষণী শক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হন । অথচ এসময়ে অনেক শিক্ষিত বঙ্গসন্তানও কালীমূর্তি এবং তাঁর পূজাকে বিকট, উদ্ভট ও অপকারী মনে করে বিরূপ ভাব প্রকাশ করতেন । পাশ্চাত্যভাবানুকারী আধুনিক বাঙালি ও ব্রাহ্মসমাজের অনেকের কাছে 'রুদ্র-মধুরে অপরূপ তারা'র মহিমা অজ্ঞাত বা অস্বীকৃত ছিল ।

কালীরূপের প্রতীকার্থ ভেদ করে নিবেদিতা ঐ মূর্তির অন্তরালে

যে ভয়ঙ্কর সুন্দরের উপাসনা আছে এ বিষয়ে আলোচনা করেন । তাঁর মতে কালীমূর্তি বীভৎস নয়, তাঁর পূজা শিল্প-ভাস্কর্যের অগ্রগতির অন্তরায় মোটেই নয় । প্রসঙ্গত তিনি ডেলফির অদ্ভুত মূর্তির প্রতি গ্রীক শিল্পীদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধার কথাও উল্লেখ করেন । নিবেদিতা বলেন : "ভারতীয়রা নিজেদের পুরাণ-কথা বা সৃষ্টি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য থেকে চোখ সরিয়ে, তাদের সঙ্গে অযথা তুলনাদি ব্যাপারে বিরত থাকলেই ভাল করবেন ।"

শ্রীশ্রীমা ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বরে বাগবাজারের বোসপাড়ায় এসে স্বয়ং পূজা ও প্রার্থনা করে নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন স্বামীজী ও তাঁর কয়েকজন গুরু-ভাইদের উপস্থিতিতে । এই বিদ্যালয়ের সূচনা কাল থেকেই ভগিনী ছাত্রীদের শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন । সমকালে ইংল্যান্ডের শিশুদেরও মাত্র কালোরেখায় ড্রইং শেখানো হত ; রঙ ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল না । অথচ এখানে নিবেদিতার উদার উৎসাহে বালিকারা রঙ, তুলি, কাগজ নিয়ে মনের মতো ছবি আঁকার আনন্দ পেত । ভগিনী নিজে সযত্নে তাদের আঁকা শেখাতেন । সেলাই, মাটির কাজ— এসবও শেখানোতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল । ভগিনী জানতেন, এদেশের মানুষের শিল্পবোধ সহজাত এবং সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এদের ধমনীতে বহমান । তাই গভীর ভালবাসা দিয়েই তিনি লক্ষ্য করতেন, বালিকাদের হাতের কাজ কত পরিণত । বান্ধবী মিসেস বুলকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন : "তুলির কাজ ভাল, আর রঙের ব্যবহার চমৎকার (মেয়েদের) । তারা কি সুন্দরভাবে যে সেলাই ও কারুকাজ করে, কি বলব !" কেবল ছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়া বা অপটুকে অতিপ্রশংসা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না । কারণ পরে অপর বান্ধবী মিসেস লেগেটকে লিখেছেন : "যতক্ষণ না কোনকিছু নিখুঁত হচ্ছে ততক্ষণ অনলস পরিশ্রম করে যেতে হবে । এই গুণকে রামকৃষ্ণ স্কুলের (তখন বিদ্যালয়ের এই নামই ছিল) অন্তর্ভুক্ত আমাদের প্রকাশ করতেই হবে— নচেৎ সবই ভস্মে ঘি ঢালা । সস্তার কারুশিল্প, আজেবাজে হাতের কাজ— সেসব কদাপি টেঁকে না । তাই এক-একটা সময়ে একটা নির্দিষ্ট কাজই করণীয়— আর সে কাজ করবার সময়ে চাই অসীম যত্ন ।"

নিবেদিতা মনে করতেন যে ভারতের কুটীরশিল্পের পুনর্জাগরণে আমাদের মেয়েদের বিরাট ভূমিকা আছে । সূচীশিল্পে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল । মেয়েদের সেলাই ক্লাস নিতে পারলে খুব আনন্দ করতেন । বান্ধবীদের কাছ থেকে এজন্য ছোটখাট উপকরণ সংগ্রহেরও চেষ্টায় থাকতেন । শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা পূজনীয়া ভারতীপ্রাণামাতাজী ছিলেন নিবেদিতার ছাত্রী । তিনি বলতেন : "সিস্টার চাইতেন পাশ্চাত্য পদ্ধতি মতো সূচীবিজ্ঞানে মেয়েরা দক্ষ হোক । রুমাল বা টেবিল-ঢাকার চৌকোণা কাপড়ের ধার মুড়বার সময় তিনি ছাত্রীদের বিপরীত কিনারাগুলি মুড়তে বলতেন । কেউ তাঁর আদেশ না মেনে সুবিধেমত পাশাপাশি

নিবেদিতার রেখাঙ্কনে পদ্ম

কিনারায় হেম করলে ভারি বিরক্ত হতেন । আবার সেলাই ক… হাতের কাজে ভারতীয় অলঙ্করণ বা নকশাকেই সমাদর কর… মন থেকে ।" এই প্রসঙ্গে পূজনীয়া ভারতীপ্রাণামাতাজী এক… মজার গল্পও বলেছেন, সকৌতুকে : "ঢাকার এক মহিলা সিস্টা… কাছে আসতেন । সিস্টার তাঁকে 'ডাকা (ঢাকা) মা' ব… ডাকতেন । তিনি খুব ভাল সেলাই করতেন । সিস্টার তাঁ… একটা বেড কভারের মাঝখানে পদ্ম এঁকে এমব্রয়ডারি কর… বলেন । কোনখানে কি কি রঙের সুতো দিয়ে করতে হবে স… বলে দিয়েছিলেন । স্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেলে একদিন 'ঢাকা-ম… সিস্টারের ঘরে ঢুকে তাঁর খাটের ওপর ওই বেডকভারটি বিছি… আমাদের ডাকতে লাগলেন : 'মাইয়ারা সব আইস, দেইখ্যা যাও … সিস্টারের ঘর । আমরা সব উঁকি মেরে দেখছি । 'ঢাকা-ম… বলছেন : 'দ্যাখছ, ক্যামুন সুন্দর হইছে— হেই পইদ্য (প… দেখছস না ? হেই পইদ্যের উপর বইস্যা মহাদেব কুশনী… (কাশী) তৈয়ার করছিলেন, আমি একদিন হ্যদ্ পইদ্য ধ্যান কর… করতে দ্যাখলাম ।' আমরা তো খুব হাসছি । এমন সময় সিস্… এসে গেছেন । ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় চাদর দেখেই মুখ …

হয়ে গেছে, রেগে গেছেন । দেখলেন, 'ঢাকা-মা' ইচ্ছামত রঙ মিলিয়ে সেলাই করেছেন । তিনি 'ঢাকা-মা'কে বললেন : 'ডাকা-মা, ডাকা-মা, সব নস্ত, সব নস্ত ।' অর্থাৎ সব খুলতে হবে । আমরা হাসতে হাসতে বললাম : 'পইদ্য বেরিয়ে গেছে এইবার ।' সিস্টার সব সেলাই খুলিয়ে 'ঢাকা-মা'কে দিয়ে আবার সেই কাজ করিয়েছিলেন ।"

ভারতের বয়নশিল্পের প্রশংসায় নিবেদিতা পঞ্চমুখ হতেন । কাশ্মীরী শালের নকশার সূক্ষ্মতা ও রঙের বাহার তাঁকে মুগ্ধ করত । ইউরোপে তার কদর ও জনপ্রিয়তা স্মরণ করে তিনি গর্বিত হতেন । আবার সেই বাজার পড়ে যাওয়ায় শিল্পীদের দুরবস্থায় নিদারুণ দুঃখভোগও করতেন । প্রকৃতি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের পটভূমি মনে রেখে তিনি লিখেছেন : "গুনশিল্পীর কাছে ভারতীয় রুচির তিন দাবি— সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি কারুকার্য, ঝলমলে ভাব এবং বস্তুর প্রাচুর্যের গরিমা । এদেশের জলবায়ুর প্রভাবে নিসর্গপ্রকৃতিতে এমন অবিরাম সৌন্দর্যের সমারোহ দেখা যায় যে, শিল্পক্ষেত্রে ঐ প্রকার প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার । পুষ্পৈশ্বর্যভরা উপত্যকাই কাশ্মীরের জাতীয় শিল্পে প্রতিফলিত ।" আর সুযোগমত তিনি এসবের সঙ্গে তুলনায় পাশ্চাত্যের গৌরবহীন ছাপাকাপড় বা তুচ্ছ নকশার গৃহসজ্জার অকিঞ্চিৎকরতার উল্লেখ করতেন । ব্যক্তিমানুষ যেমন আপন পরিবারের কৃতিত্বে জাঁক করে তেমনই একটা মনোভাব তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত ।

ভারতের চারু ও কারু উভয় শিল্পবিষয়েই নিবেদিতার প্রীতি ছিল প্রবল । ভারতীয় অলঙ্কারসমূহের শিল্পমূল্য নিরূপণ করে কত আবেগপূর্ণ কথাই তিনি বলতেন । সরু রুপোর তারের কাজ তাঁর বড় প্রিয় ছিল । ভারতের দৈনন্দিন জীবনের সৌন্দর্যের কথা তিনি তাঁর 'দি ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ' এবং 'স্টাডিস ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম' নামের রচনামালায় গভীর আন্তরিকতায় বলে গেছেন । আমাদের পরিবার ও সমাজজীবনটাই যে কত মাধুর্যে ভরা তা তাঁর রচনায় সদা পরিস্ফুট । ভারতীয় শাড়ির এমন আবেগময় ব্যাখ্যা আধুনিক ভারতীয় নারীর মনেও হয়তো এভাবে জাগবে না । তিনি লিখছেন : "কেউ জানে না শাড়ি কত পুরাতন । রামের সীতা বনগমন করছেন— পরনে শাড়ি । কাশ্মীরীয় ছবিতে দেবীদের অঙ্গে একফালি সেলাই না করা কাপড় ; গ্রীক ভাস্কর্যেও তেমন দেখা যায় ।" ভগিনী মনে করতেন শাড়ির সৌন্দর্যই এদেশের মেয়েদের রূপ, লাবণ্য ও মর্যাদার যথার্থ প্রকাশক । প্রথম প্রথম তিনি পাড়ের বাহার তত বুঝতেন না । পাড়হীন শাড়িই তাঁর পছন্দ ছিল । তিনি বলতেন যে, অনেক সময় নিত্যদৃষ্ট বস্তুর সৌন্দর্যমহিমা প্রথমেই বোঝা যায় না । কিছুদিন লক্ষ্য করে তিনি রমণীশরীরে শাড়ির পাড়ের আঁকাবাঁকা রেখাকে 'মহাশিল্পীর তুলির টান' বলে বুঝতে পেরেছিলেন । শাড়ির বর্ণবৈচিত্র্য মনোহারী ঠিকই কিন্তু অধ্যাত্মমূল্যবোধে আলোকিতপ্রাণ ভগিনী পরম শ্রদ্ধায় লিখেছেন : "বিধবানারীর সাধারণ শুভ্রবসনের মতো সমুজ্জ্বল পবিত্রতায় পূর্ণ আর কোনও জিনিস আছে কি ? পূজার জন্য তাঁরা রেশমী বস্ত্র পরেন, আর দৈনন্দিন কাজকর্মে সূতী বস্ত্র । সেগুলি সর্বদাই শুভ্র, কোনও রঙের ছোঁয়া তাতে নেই । হয়তো অনুষঙ্গই এদের মহিমার মূলে । কঠোর সংযমে ভরা সরলতা সর্বোচ্চ আদর্শের স্মারক । তাতে আছে সমগ্র বিশ্বকে বরণ করার মতো হৃদয় এবং উৎসর্গীকৃত জীবন । পশ্চাৎপটে রয়েছে অতীতের শোক, যা বর্তমানকে প্রস্তুত করেছে কেবলই দানের জন্য । বৈধব্যের শুভ্রবসনে উচ্চারিত হয়েছে এই তাৎপর্য-কথা ।"

আমরা দেখি, নিবেদিতা আশ্চর্য শক্তিতে আপাতসাধারণ অথচ অলোকসামান্যা শ্রীশ্রীমার মহিমা অনেকখানি ধারণা করেছিলেন । শ্রীশ্রীমা তাঁকে আপন কন্যাজ্ঞানে 'খুকী' সম্বোধনে পরমস্নেহ প্রদর্শন করতেন । কখনও বলতেন : "আমার প্রাণের সরস্বতী ।" ভগিনী এর অনেকদিন পরে এক অসামান্য পত্রে শ্রীশ্রীমায়ের অপার চরিত্রসৌন্দর্যের গভীর চিত্ররূপ রচনা করেন । তিনি লিখেছেন : "সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি । শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র ।" মায়ের পবিত্র, কোমল ব্যক্তিত্বের দিব্যতা তিনি সতত অনুভব করতেন । মায়ের বাড়িতে তাঁর শয়নকক্ষে নিবেদিতা কিছুদিন বাস করার সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন । পরে অন্যত্র বাস করলেও মায়ের শান্ত মাধুর্যে ভরা কক্ষখানি ভগিনীর জীবনে 'ধ্রুবমন্দির' ছিল । শ্রীশ্রীমায়ের প্রাত্যহিক জীবন ও ওই ভবনের অনাড়ম্বর, পবিত্র পরিবেশের কথায় তাঁর মন ভরে থাকত ।

স্নেহভাজন শিল্পী নন্দলাল বসু অঙ্কিত 'দশরথের মৃত্যু' নামক চিত্রটির কিছু ত্রুটির উল্লেখ করেছিলেন নিবেদিতা । কিন্তু চিত্রের কক্ষটি শান্তির মহিমায় পূর্ণ থাকায় তিনি সেটিকে মায়ের শয়নকক্ষের মতো সুন্দর বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন । মাকে তিনি পরমসমাদরে বহুবার নিয়ে গেছেন তাঁর আবাসে তথা স্কুলবাড়িতে । মায়ের শুভাগমন কল্পনায় ও তার আয়োজনে তিনি অধীর হতেন আনন্দে । বাড়িটিকে পরিপাটিভাবে পরিচ্ছন্ন করে সাজাতেন আলপনায়, পল্লবে, পুষ্পে, মঙ্গলকলসে । মায়ের বাড়ির একটি ঘরেই তিনি একবার তাঁর বালিকাদের হাতের কাজ সাজিয়ে ছোট্ট প্রদর্শনী করেছিলেন । উদ্দেশ্য, সেসব মা দেখবেন ও কন্যাদের আশীর্বাদ করবেন । এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য তিনি আর ভাবতে পারতেন না । প্রসঙ্গত স্মরণীয় একটি ঘটনা । নিবেদিতা একবার লক্ষ্য করেন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির পাঁচিলে দাসী ঘুঁটে দিয়েছে । এমন লক্ষ্মীছাড়া কাজ যে কমলার আলয়ে হতে পারে তা তাঁর ভাবনার অতীত । কিন্তু দাসী অতশত জানে না । ভগিনী মায়ের সেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কড়া আদেশ দেন যেন এটি নিষিদ্ধ হয় । কয়েকদিন পরে সেখানে তিনি ঐ অপকর্মের পুনরাবৃত্তি দেখে মহাবিরক্ত হন । শ্রীসারদা মঠে সংরক্ষিত একটি

পোস্টকার্ড আছে যা ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজকে লিখেছেন নিবেদিতা। পত্রের একমাত্র সংবাদ : 'ঝি'কে যেন বলে দেওয়া হয়, ও কাজ যেন আর সে না করে। দু-তিন ছত্রে চিঠির পঙ্‌ক্তি শেষ হয়েছে।

Never! Never! Never!!!

Furious 'N'.— ইতি অগ্নিশর্মা নিবেদিতা।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ ন'জন স্বদেশী বীর যেদিন কারামুক্ত হন, সেদিন ভারতপ্রেমিকা নিবেদিতার আনন্দোচ্ছ্বাস দেখেছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ সরলাবালা সরকার। তিনি লিখেছেন : "সেদিনও বিদ্যালয়ের দ্বারে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত ও কদলীবৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল।" ভারতের শিল্পসুন্দর মাঙ্গলিক কৃত্যই তাঁর প্রাণের প্রিয় ছিল।

ভারতের সকল কলাবিদ্যার মূলে আধ্যাত্মিকতার বীজ নিহিত আছে একথা তিনি অন্তরের গভীরে বিশ্বাস করতেন। বাহ্য-সৌন্দর্যযুক্ত অন্তঃসারশূন্য কোনও ছবির চেয়ে ভাবপূর্ণ অনাড়ম্বর সৃষ্টিগুলি তাঁর সমাদর পেত। বিদেশী শিল্পের অনুকরণে গড়া কোনও ভাল ছবি অপেক্ষা মূল্যবান ছিল মেয়েদের হাতে আঁকা পিঁড়ি, আলপনা ইত্যাদি। সরলাবালা লিখেছেন, একটি মেয়ের হাতে আঁকা আলপনা তিনি তাঁর শয়নঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন। ঐ আলপনার মাঝখানে একটি বড় শতদল পদ্ম ও চারিপাশে ছোট ছোট যুঁই ফুলের মতো ফুল আঁকা ছিল। ঐ আলপনা তাঁর এতো ভাল লেগেছিল যে শিল্পরসিক কেউ অতিথি এলেই দেখাতেন। একদিন তিনি মহানন্দে ছাত্রীদের কাছে এসে বললেন : "কুমারস্বামী আজ এই আলপনার অনেক প্রশংসা করলেন।" এ আনন্দ আর যেন তাঁর রাখবার জায়গা নেই। পদ্মফুলের ছবি, বিশেষত সহস্রদল শ্বেত পদ্মের চিত্র তাঁর অতি প্রিয়। তিনি বলতেন : "এই ফুল ভারতীয় চিত্রকর ছাড়া আর

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আঁকা ছবি

কেউ আঁকতে জানে না।"

আকৃতি, প্রকৃতি ও পরিচ্ছদসহ নিবেদিতা স্বয়ং ছিলে[n] শিল্পসুষমামণ্ডিত। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে 'চন্দ্রকান্তমণি দি[...] গড়া অলৌকিক সুন্দর, কাদম্বরীর মহাশ্বেতা'— বলে ম[...] করেছিলেন। তুষারশুভ্র দীর্ঘ পরিচ্ছদ, উঁচু করে বাঁধা কেশরা[...] গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালায় তাঁকে বহু অভিজাত রমণী[...] মধ্যেও অসামান্য লাগত। তেজ ও মাধুর্যের সমন্বয়ে তি[...] চিরসুন্দর।

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন।

নিবেদিতার চোখে ভারতের পৌরাণিক চরিত্র

পূর্বা সেনগুপ্ত

প্রাচীন হয়েও যা নবীনতায় সতেজ তাই পুরাণ । পৃথিবীর প্রতিটি দেশেরই লোকচেতনার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর একটি সুসংবদ্ধ সম্পর্ক রয়েছে । ভারতবর্ষ পূজাপার্বণ ও তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ । অধ্যাত্মভাব এদেশের প্রতিটি অণুপরমাণুতে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে । আধ্যাত্মিক চেতনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়ে চলে এই পৌরাণিক কাহিনীগুলি— যুগের তারতম্যভেদে পুনঃপুনঃ কথিত হয়, কিন্তু তাদের প্রাসঙ্গিকতা, আধুনিকতা হারিয়ে যায় না । সংস্কৃতির এই দৃঢ় প্রচারমাধ্যমটিকে নিবিড়ভাবে জানলেই আমরা দেশের মাটির সঙ্গে আপন চেতনাকে সংযুক্ত করতে পারি ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের কালে প্রাচীনকে নবীন করে দেখার যে প্রবণতা, সেই প্রবণতার ঝোঁকে ভারতীয় পুরাণের পুনঃকথন হয়েছিল । নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' এর সার্থক উদাহরণ । কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরাণের প্রয়োজনীয়তা ও তার সমাজতাত্ত্বিক রূপকে নিবেদিতা যেন ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপিত করেছেন ।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনীগুলির তাৎপর্য নিবেদিতার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি । আমরা জানি, শিশুশিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে নিবেদিতার নিজস্ব ধ্যানধারণা ছিল । ভারতবর্ষে এসেও তিনি কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলাকে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির বিষয়ে শিক্ষা দিতেন । তাঁর স্বপ্নের স্কুলটিতেও প্রয়োগ করেছিলেন এই পদ্ধতি । তাঁর এই নিজস্ব শিক্ষাধারায় যে কিছু মৌলিকতা ছিল তা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি, স্বামী অখণ্ডানন্দ সারগাছিতে অনাথ আশ্রমের সূচনা করেছেন এবং সেই আশ্রমের ছেলেদের জন্য নিবেদিতার কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন ।

নিবেদিতার লেখা 'ক্র্যাড্‌ল টেল্‌স অব হিন্দুইজম্' মূলত একটি শিশুসাহিত্য । সেখানে ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে কয়েকটি কাহিনী সংগ্রহ করে নিবেদিতা তাদের পুনর্বিন্যাস করেছেন । এ যেন পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে প্রাচ্যের পুরাণকে দেখা । স্বামীজী তাঁকে ভারতীয় নারীর কল্যাণসাধনে নিবেদন করেছিলেন । সেই মহান ব্রত উদ্‌যাপনে নিবেদিতার পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের মানুষ, বিশেষ করে ভারতীয় নারীসমাজকে জানার । স্বামীজী তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন মাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর কাছে । সেখানে স্ত্রীভক্তদের মধ্যে প্রায় সবরকম মানসিকতাসম্পন্ন মেয়েদের দেখেছিলেন নিবেদিতা । যোগীন-মা, গোলাপ-মা, গোপালের মার মতো আধ্যাত্মিক-অনুভূতিসম্পন্না মহীয়সী, গৌরীমার মতো কর্মবীর আবার রাধুর মতো অবুঝ সংসারী— এঁরা সকলেই শ্রীশ্রীমার পূতসান্নিধ্যে ছিলেন । কিন্তু নিবেদিতার অনুসন্ধানী দৃষ্টি সবকিছু বৈচিত্র্য, বৈষম্যকে ছাড়িয়ে মূলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল । তিনি দেখেছিলেন ভারতীয় নারীর ধর্মপ্রাণতা ও একনিষ্ঠতাকে । ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজকে নিবেদিতা ভাল করে চিনে নিন, স্বামীজী তা চেয়েছিলেন । তাই তীর্থভ্রমণের মাধ্যমে ভারতবর্ষের প্রাণসত্তাকে বারবার তাঁর কাছে তুলে ধরেছিলেন । ভারতীয় আচার-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য জানার বিষয়ে নিবেদিতার ছিল আন্তরিক আগ্রহ•। ঘটে সিঁদুর দেয় কেন, যজ্ঞে ঘি দেওয়া হয় কেন— এ ধরনের নানা প্রশ্ন তাঁর মনে জাগত । নিবেদিতার ভারত-পরিচয়ের অভিযানে স্বামীজী যেমন শিক্ষক ছিলেন, তেমনি 'মায়ের বাড়ি'র ভক্তমহিলাদের কাছ থেকেও তিনি অনেক জিজ্ঞাসার সদুত্তর পেয়েছিলেন । 'ক্র্যাড্‌ল টেল্‌স অব হিন্দুইজম্'-এ বর্ণিত কাহিনীগুলির নির্বাচন ও উপস্থাপনা দেখে মনে হয় নিবেদিতা এই কাহিনীগুলি নিজেই পড়েছিলেন । কিন্তু সংস্কৃত বা বাংলা ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল না । তাই তাঁকে গ্রন্থের সাহিত্যরস উদ্ধারে ইংরেজী ভাষার সাহায্য নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে

'রাতে ভারতীয় কথক'

হয়েছিল, তবে তাঁর লেখা এই বইটির ভূমিকা দেখে মনে হয়, পড়ার চেয়ে শোনার প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল বেশি । এক্ষেত্রে তিনি যোগীন-মার প্রসঙ্গ এনেছেন । কাহিনীগুলি তিনি যোগীন-মার কাছেই বিস্তারিতভাবে শুনেছিলেন, ভূমিকায় যোগীন-মার প্রতি কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করেছেন । শুধু তা-ই নয়, বইয়ের সঙ্গে কথিত কাহিনীর যখন পার্থক্য ঘটেছে তখন নিবেদিতা কথিত-কাহিনীকেই গুরুত্ব দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন ।

নিবেদিতার মতে কথকতার একটি নিজস্ব মাত্রা আছে । তিনি রামায়ণ, মহাভারত সম্পর্কে বলেছেন : "এই দুটি মহাকাব্য একত্রে ভারতীয় জীবনের অসাধারণ শিক্ষক । সারা দেশের প্রত্যেকটি প্রদেশে, বিশেষত শীতকালে রাত্রিবেলায় হিন্দু-মুসলমান শ্রোতারা ব্রাহ্মণ-কথকের চারদিকে বসে অতি মনোযোগ সহকারে এই প্রাচীন কাহিনী শোনে ।... হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের শিশুদের জীবনে এমন একসময় আসে যখন সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, পিতামহীরা তাদের এইসব প্রাচীন স্মৃতিকথা শোনায় ! গ্রামদেশের মানুষ (এভাবেই) মহাভারত সম্পর্কে সামগ্রিক ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করে ।"

প্রথম যখন 'ক্র্যাড্‌ল টেল্‌স অব হিন্দুইজম্' প্রকাশিত হয় তখন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'রাতে ভারতীয় কথক' এবং 'দুর্গার বজ্র'— ছবি দুটি তাতে সংযুক্ত ছিল । ভূমিকায় নিবেদিতা লিখেছিলেন : "কখনও কখনও দুটি বক্তব্যের মধ্যে আমি পাওয়া কাহিনীর পরিবর্তে মুখে শোনা গল্পকে বেছে নিয়েছি ।"

'ক্র্যাড্‌ল টেল্‌স অব হিন্দুইজম্' বইটি মূলত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ থেকে নেওয়া প্রায় তেত্রিশটি কাহিনীর সংকলন । বইয়ের ভূমিকায় নিবেদিতা জানিয়েছেন : "এক এক করে গেলে, সর্পকাহিনীগুচ্ছ পাওয়া যাবে মহাভারতের প্রথম সতী ও উমার গল্পের প্রাসঙ্গিক ভূমিকারূপে শিবের সন্নিবেশিত । ভাগবতপুরাণ থেকে সতীর কাহিনী এবং উমার কাহিনী রামায়ণ ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য গ্রহণ করা হয়েছে । ভারতীয় অ্যালসেস্টিস্ সাবিত্রীর এসেছে রত্নখনি মহাভারত থেকে, নল-দময়ন্তীর কাহিনীও এসেছে সেখান থেকেই । কৃষ্ণকাহিনীগুচ্ছের সাতটি আমাদের ধর্মগ্রন্থ, কিংবদন্তী ও পুরাণ থেকে নেওয়া শেষ তিনটি নেওয়া হয়েছে মহাভারত থেকে । ধ্রুব আর গল্প বিষ্ণুপুরাণের কাহিনীর প্রচলিত সংস্করণ এবং গোপাল রাখাল ভাইয়ের গল্প, আমার মনে হয়, বিক্রমাদিত্যের গল্পের মতোই প্রচলিত কাহিনীমাত্র । এই বইয়ের শিবি ভরত এবং শেষ দুটি গল্প মহাভারতের । রামায়ণকাহিনী চারটি গল্প সম্পর্কে একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এগুলি হল রামায়ণ মহাকাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ, যে- মহাকাব্য চরিত্র ও ব্যক্তিত্বগঠনের ক্ষেত্রে চার হাজার বছর ধরে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে । মহাভারতকে ভারতের জাতীয় বলে মনে করা হয়, কিন্তু রামায়ণ হল ভারতীয় মহাকাব্য । ভারতীয় চেতনায় সীতা তার কেন্দ্রীয় চরিত্র ।"

পাঠকের এক্ষেত্রে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক যে, ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে কোন কাহিনীগুলিকে নিয়েছিলেন । 'ক্র্যাড্‌ল টেল্‌স অব হিন্দুইজম্' বইটির মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে সর্পসভ্যতার মহাভারতের বিনতা ও কদ্রুর গল্প, সর্পজাতির অভিশাপ ইত্যাদি । এগুলির সঙ্গে নিবেদিতা উতঙ্ক, তক্ষকের কাহিনী এবং সর্পযজ্ঞ, পরীক্ষিতের মৃত্যু, অস্তিকের সর্পযজ্ঞ নিবারণ নিয়েও আলোচনা করেছেন । মহাভারতের অন্যতম চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিবেদিতা । এই চরিত্রের বিতর্কিত দিকটির কথা তুলে তাঁর ভুল হয়নি । বর্তমান প্রবন্ধে প্রতিটি কাহিনীর আলোচনা করা সম্ভব নয়, আমরা তাই নিবেদিতার বিশ্লেষণ অবলম্বনে কেবলমাত্র নারীচরিত্রগুলির মূল্যায়নে প্রয়াসী হব ।

'ক্র্যাড্‌ল টেল্‌স অব হিন্দুইজম্'-এ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, হৈমবতী, সতী, গান্ধারী, সুভদ্রা প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র সেইসঙ্গে পদ্মিনী, সংযুক্তার মতো ঐতিহাসিক চরিত্র ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ আদর্শকে তুলে ধরবার সময়

স্বদেশমন্ত্রে' স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন : "হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ।" এতগুলি পৌরাণিক নারীচরিত্রের মধ্যে স্বামীজী কেন কেবল এই তিনটি চরিত্রকে নির্বাচন করেছিলেন তার বহু বিশ্লেষণ আমরা দেখতে পাই । একনিষ্ঠতা, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও সর্বোপরি প্রেমময় হৃদয়ের জন্য এঁরা বরেণ্য ।

সীতাচরিত্রকে নিবেদিতা ভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে চিহ্নিত করেন । সীতার সম্পর্কে নিবেদিতার মূল্যায়ন কত গভীর ছিল তার উল্লেখ আমরা পাই নিবেদিতার অন্যতম ছাত্রী প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর স্মৃতিচারণে । একদিন নিবেদিতা তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বলেন : "ভারতবর্ষের রানী কে জান ।" ভারত তখন ব্রিটিশের অধীন, রাজনৈতিকভাবে মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্রী । তাই প্রশ্নের উত্তরে বালিকারা সমস্বরে উত্তর দিল : "সিস্টার, আমাদের রানী কুইন ভিক্টোরিয়া ।"

উত্তর শোনামাত্রই প্রতিক্রিয়া হল তীব্রভাবে । "মনে হল কে যেন তাঁর শঙ্খশুভ্র মুখে সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে । ভারতবর্ষের মেয়েরা তাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রমণীরত্নের নাম জানে না !... তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন : 'তোমাদের রানী কে তাও তোমরা জান না ?' " প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী বলেন : "আমাদের বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় দেখে তিনি নিজেই উত্তর দিলেন : ইংল্যান্ডের অধীশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া কখনই তোমাদের রানী হতে পারেন না । তোমাদের রানী সীতা ।' সীতা শব্দটিতে অত্যন্ত জোর দিয়ে তিনি বারবার উল্লেখ করতে লাগলেন ।"

ভগিনী নিবেদিতা ভারতের জাতীয় আদর্শ নিরূপণকালে বলেছেন, আদর্শের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতীয় নারীর জীবন ভারতের মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি একটি মহাকাব্য । ভারতীয় নারীজীবনের বৈচিত্র্য ও মৌলিকতা নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করেছিল । তিনি বিবেকানন্দের কথায় সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী চরিত্রের গুণগান করেননি । তাঁর গ্রহণের পশ্চাতে ছিল মননশীলতা । তিনি দেখেছিলেন, নারীচরিত্রগুলির সাহস ও নিষ্ঠা । সীতা সব দুঃখ সহ্য করে স্বামীর অনুবর্তিনী হয়েছিলেন, গভীর দুঃখের মধ্যেও তাঁর স্থিরতার বিচ্যুতি ঘটেনি । সাবিত্রী রাজকুমারী হয়েও বনচারীকে স্বামিরূপে বরণ করেছিলেন । কেবল তাই নয়, তাঁর প্রেমের তীব্রতা ও সাহসিকতায় স্বয়ং মৃত্যুদেবতাকে পরাজিত হতে হয়েছিল । আর দময়ন্তী ? এই নারীর জীবন তো বিশ্বের রোম্যান্টিক কাহিনীর জন্ম দিয়েছে । ভালবাসার প্রেরণায় দেবতাকে ছেড়ে মানবত্বের জয়গান গেয়েছেন দময়ন্তী । নিবেদিতা এই তিন নারীর কাহিনী ও তাঁদের একমুখী ভালবাসাকে সহজভাবে বিবৃত করেছেন । সাবিত্রীর উপাখ্যানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে তিনি তুলে ধরেছেন । সাধারণভাবে আমরা জানি যে সাবিত্রী সত্যবানের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন । এঁদের নম্রতার সঙ্গে যে বীরত্ব ও আধুনিকতা মিশেছিল তা বোঝাবার জন্য নিবেদিতা সাবিত্রীর দেশ পর্যটনের কথা উল্লেখ করেছেন । স্বামিনির্বাচন ও সংসার আশ্রমে প্রবেশের আগে সাবিত্রী দেশভ্রমণ দ্বারা বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে এবং সাধুসন্তদের আশীর্বাদ পাথেয় করতে চান— সাবিত্রীর এই ইচ্ছাপ্রকাশকে নিবেদিতা সেই মহীয়সীর চরিত্রে একটি উজ্জ্বল ও আধুনিক সংযোজন বলে মনে করেছেন ।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ছাড়াও মহাভারতের আরও কয়েকটি নারীচরিত্র সম্বন্ধে নিবেদিতা তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন । সরলাবালা সরকার তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন : "মহাভারত অথবা রামায়ণের যে-কোন অংশ হইতে মাঝে মাঝে মেয়েদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইত । 'কচ ও দেবযানী'র উপাখ্যানের আলোচনায় কচের প্রসঙ্গ উত্থাপনমাত্র নিবেদিতা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন ; বলিতেন, 'কচ মহাবীর ছিলেন, এমন বীর হওয়া কত আনন্দের বিষয় ।' আবার দেবযানী যে অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, সে লজ্জা যেন তাঁহারই । বলিতেন, 'শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী কেমন করিয়া এমন দুষ্ট হইলেন ! জানি না, মেয়েরা কেমন করিয়া এমন ব্যবহার করিতে পারে !' একদিন নিবেদিতা তাঁহার ছাত্রীগণকে প্রশ্ন করিলেন, 'মহাভারতে বর্ণিত রমণীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বীর কে ?' এই প্রশ্নে দ্রৌপদীর নামটিই বেশির ভাগ মেয়েদের মনে আসিয়াছিল । সুভদ্রা যাদবসমরে অর্জুনের রথরজ্জু ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ সুভদ্রাকেও বীর বলিয়া মনে করিয়াছিল ; বকযুদ্ধে ভীমকে পাঠাইবার কথা স্মরণ করিয়া কুন্তীর কথাও দুই-একজন বলিয়াছিল কিন্তু গান্ধারীর কথা কাহারও মনে আসে নাই । নিবেদিতা আশান্বিতভাবে একে একে সকল ছাত্রীরই মুখের দিকে চাহিয়া কাহারও নিকট মনোনীত উত্তর না পাইয়া অবশেষে নিজেই বলিলেন, 'মহাভারতে রমণীগণের অনেকেই বীর, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠা বীররমণী ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী দেবী' ।" মহিষী গান্ধারীর প্রসঙ্গে নিবেদিতা আরও বলেছিলেন : "জীবনে একবারমাত্র কুন্তীর সৌভাগ্যে (তিনি) ঈর্ষান্বিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত জীবনের আচরণে সেই অন্যায় একেবারেই ধৌত হইয়া গিয়াছিল ।" নিবেদিতার বিচারে এই নারীজীবনের মহত্ত্ব সেখানেই যেখানে তিনি স্নেহশীলা মাতা হয়েও অধর্মাচরণকারী পুত্রকে নির্ভীকভাবে বলতে পেরেছিলেন, 'পুত্র, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়'— পুত্রের প্রতি আসক্তিহীন এই উক্তি চিরদিন তাঁকে বরেণ্য করে রাখবে । নিবেদিতা বলেছেন : "তিনি বীর, এইজন্যই তিনি জানিতেন যে, যুদ্ধে জয়ী হওয়া পুত্রের পক্ষে আনন্দের বিষয় বটে, কিন্তু যথার্থ ন্যায়ের ও ধর্মের জয় হওয়া তদপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় এবং পুত্র জয়ী হউক অথবা যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হউক তাহার পক্ষে এবং সকলের পক্ষেই কল্যাণকর ।" এইভাবে ভারতীয় নারীর ব্যক্তিকল্যাণ অপেক্ষা সমাজকল্যাণের প্রতি অধিকতর আগ্রহকে নিবেদিতা সুন্দরভাবে চিহ্নিত করেছেন ।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পরবর্তী কালে দেশে যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হতে লাগল তখন সমাজের অধিকাংশ মানুষ এই শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন । তাঁদের ধারণা ছিল, পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতীয় নারীর মৌলিকতা হারিয়ে যাবে । কিন্তু তখন কে ভেবেছিলেন যে, পাশ্চাত্য নারীই ভারতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে এইভাবে তুলে ধরবেন ! ভারতীয় নারীর বর্ণনায় নিবেদিতার লেখনীতে কবিত্বের প্রকাশ ঘটেছে । আদর্শপত্নী 'সতী'র প্রসঙ্গে নিবেদিতা লেখেন : "জগতের আদ্যাশক্তিরূপে শিবের চিরসঙ্গিনী হলেন মহাশক্তি । সতী, উমা এবং মহাকালী রূপে সেই মহাশক্তির নানা চিত্র ও কাহিনী প্রচলিত আছে । তিনিই গৌরী, হেমাঙ্গিনী, সুন্দরী— গিরিতুষারে প্রতিফলিত নবোদিত সূর্যের কিরণচ্ছটা সদৃশ । অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতিমূর্তিস্বরূপ মহাদেব, যিনি মানবসমাজে শিব নামে পরিচিত, তাঁরই পত্নী এবং অনুগতা পূজারিণীরূপে উমা চিরকাল কৈলাসে বসবাস করেন ।"

ঠিক এইরকমই আরেকটি অংশ হল উমা-হৈমবতীর উপাখ্যান । সতী পৃথিবীতে আবার জন্মালেন রাজকন্যা উমারূপে । মর্তে আমাদের যা দীর্ঘ সময় স্বর্গের বিচারে তা একদিন । সুতরাং উমার শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বছরগুলো যেন খুব দ্রুত অতিবাহিত হল । উমা নিজের পরিচয় বেশ ভালভাবেই জানতেন । ফলে তাঁর এটাও মনে ছিল যে, তিনি শিবকে আবার নিজের করে পেতে এবং তাঁর সঙ্গে চিরদিন কাটাতেই এ পৃথিবীতে এসেছেন ।

"এবার তিনি যাঁকে পিতারূপে নির্বাচন করেছেন সেই হিমালয় মহাদেবকে খুবই ভালবাসেন, তিনি তাঁকে জামাতারূপে পেলে নিজেকে সম্মানিত বোধ করবেন । উমা শিশুবয়স থেকেই অসাধারণ সদ্‌গুণের অধিকারিণী । শুধু যে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দৈনন্দিন কর্তব্য এবং শিবের প্রিয় পবিত্র অনুষ্ঠানগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন তা-ই নয়, পূজা ও অত্যধিক কঠোরতার সঙ্গে উপবাসের দীর্ঘ সময়ও অতিবাহিত হত । স্বাস্থ্যভঙ্গ, এমনকি, জীবনের আশঙ্কায় ভীত জননী এমন কৃচ্ছ্রসাধন থেকে বিরত হবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতেন । কিন্তু রাজকুমারী উমা আপন নিষ্ঠায় অবিচল । তিনি জানেন, অপরূপ লাবণ্যময়ী হলেও এ জন্মে তাঁর সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, মহাদেব যাতে সতীকে ভুলে তাঁর প্রতি মন দেন— এমন এক (অনুকূল) অবস্থার সৃষ্টি করা ।"

ভারতের প্রতি নিবেদিতার প্রেমকে অনেকেই পর্বতকন্যা হৈমবতীর তপস্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন । সুতরাং কেবল বুদ্ধিতে নয়, বোধিতেও নিবেদিতার সত্তায় ভারতীয় নারীর জননী উমা হৈমবতী ।

মহাভারতের বনপর্বের নল-দময়ন্তীর বিরাট কাহিনীটি নিবেদিতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন এবং দময়ন্তীর একনিষ্ঠ প্রেমের উল্লেখ করেছেন । ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণের প্রতি নিবেদিতার যে গভীর অনুরাগ ছিল তা আমরা জানতে পারি প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে সেখানে বলা হয়েছে :

"প্রায়ই দেখা যাইত প্রবাসী অফিস হইতে ছবি কিংবা প্রব প্রুফ লইয়া কেহ তাঁহার নিকট বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বাড়ি চলিয়াছে ।... ভগিনী নিবেদিতার নিকট যাঁহারা কাজ লই যাইতেন তাঁহাদেরও তিনি শুধু পত্রবাহক হিসাবে দেখিতেন না রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের কতটা জ্ঞান, দেশের বি তাঁহারা কিছু জানেন কিনা সব খোঁজ লইতেন । যদি দেখিতে হিন্দুর ছেলে হইয়াও হিন্দুর মহাকাব্য সম্বন্ধে ইঁহারা তেমন কি জানেন না, তাহা হইলে নিবেদিতা চটিয়া যাইতেন । এই অফিসের কেহ কেহ তাঁহার কাছে যাইতে চাইতেন না ।"

মহাভারতের কাহিনী নিবেদিতা কতখানি মনোযোগের স পাঠ করতেন তার প্রমাণ মণ্ডূকরাজকন্যা দর্দুরকুমারী বা সুশোভ উপাখ্যানকথনে । ছলনাময়ী রাজকন্যা মানবীরূপে রাজপুত্র মন ভোলাতেন এবং অকস্মাৎ তুচ্ছ কারণে কুৎসিত ব্যাঙের আ ধারণ করে রাজ-অন্তঃপুরে ফিরে আসতেন । অবশেষে রা পরীক্ষিতের কাছে তাঁর পরাজয় ঘটল । পরীক্ষিতকে বি করলেন সুশোভনা । প্রাচীন ভারতের স্বাধীনচেতা এই নারী মানসিকতা আজও আমাদের সমাজে বহু মেয়ের আচরণে পড়ে । মহাভারতের ক্ষুদ্র অথচ অসাধারণ এই কাহিনী নিবেদিতা তাঁর অনবদ্য ভাষায় 'ক্র্যাড্‌ল টেল্‌স অব হিন্দুইজম'- সংযোজন করেছেন ।

কেবল পৌরাণিক বা মহাকাব্যিক চরিত্র নয়, নিবেদি গ্রন্থভুক্ত হয়েছে ঐতিহাসিক কিছু নারীচরিত্র । ইতিহাসের প্র স্বামীজীর মতো নিবেদিতারও বিশেষ আকর্ষণ ছিল । বিদ্যাল ছাত্রীদের সপ্তাহে এক বা দুইদিন তিনি ইতিহাসের পাঠ দিতেন এইসময় ঐতিহাসিক কাহিনীর বর্ণনায় নিবেদিতা যেন তন্ময় হ যেতেন— দেশকালপাত্রের ভেদরেখা মুছে গিয়ে প্রাচীন ঘটনা তাঁর কাছে সজীব হয়ে উঠত । সরলাবালা সরকার তাঁ স্মৃতিকথায় লিখেছেন : "একদিন রাজপুতানার ইতিহাস বলি বলিতে, তিনি স্বয়ং যখন চিতোর গিয়াছিলেন তাঁহার সেই সম ভ্রমণকাহিনী বলিতেছিলেন, 'আমি পাহাড়ে উঠিয়া পাথরের উপ হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পদ্মিনী দেবীর কথা স্ম করিলাম'— বলিতে বলিতে নিবেদিতা যথার্থই চক্ষু মুদ্রিত করি হাতজোড় করিয়া বসিলেন । নিবেদিতার তখনকার মুখের ভ যিনি দেখিয়াছেন, তিনি কখনও আর তাহা ভুলিতে পারিবেন না নিবেদিতা বলিতে লাগিলেন, 'অনলকুণ্ডের সম্মুখে পদ্মিনী দে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছেন । আমি চোখ বুজিয়া পদ্মিনীর শে চিন্তা মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম । আঃ কি সুন্দর ! কি সুন্দর ইহা বলিতে বলিতে ভাবাবেশে মুগ্ধা নিবেদিতা কিছু মুদ্রিতনেত্রে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন । তিনি যে স্কুল-ঘ বালিকাদের সম্মুখে বসিয়া তাহাদের ইতিহাস-পাঠ দিতেছেন, ত

আর তখন তাঁহার মনে নাই, পদ্মিনীর শেষ চিন্তায় তন্মুহূর্তে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছে ।" রাজপুতানার বীর নারী পদ্মিনীর কথা আমরা কে না জানি, যিনি নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য নির্ভয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন । ভারতীয় নারীর নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা ও বিনয় ইত্যাদির মধ্যে যে বীরত্ব রয়েছে, যা বর্তমানের তথাকথিত আধুনিকতায় আমরা মূল্যহীন মনে করি, নারীচরিত্রের সেই নম্র অথচ ঋজু ভাবটির মধ্যে বীরত্বের পরিচয় নিবেদিতার কাছে উন্মোচিত হয়েছিল । তিনি ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্যে নারীদের যে বীরগাথা শুনেছিলেন, ইতিহাসে তারই বাস্তব রূপায়ণ দেখেছিলেন । এভাবেই তিনি সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের অপূর্ব ঐতিহাসিক কাহিনীকে তুলে ধরেছেন । নিবেদিতার মনে হয়েছিল এই প্রেমকাহিনীর সঙ্গে সেক্সপীয়রের রোম্যান্টিক রচনা 'রোমিও ও জুলিয়েট'-এর একটা তুলনা হতে পারে ।

কাব্যিক সুষমামণ্ডিত সুন্দর কয়েকটি ক্ষুদ্র কাহিনীও 'ক্র্যাড়ল টেল্‌স অব হিন্দুইজম্‌'-এ স্থান পেয়েছে । বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন-এর কাহিনীটি একসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত আবশ্যিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল । বিক্রমাদিত্যের কাহিনীর সঙ্গে নিবেদিতা কথকতার ভঙ্গিতে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, রাজর্ষি শিবি ও ভরতের কথাও শুনিয়েছেন ।

'টুনটুনির বাসা' গল্পটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এবং বড়ই মনোরম :

"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তখন আরম্ভ হয় হয় । দুই পক্ষে বিরাট সৈন্যবাহিনী তাদের রথী-মহারথী নিয়ে উপস্থিত । কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রাঙ্গণে ছিল ছোট্ট এক টুনটুনির বাসা । সে তার ক্ষুদে ক্ষুদে ছানাগুলিকে নিয়ে পরমসুখে বাস করত । যুদ্ধের বিরাট আয়োজন দেখে সে ভাবল, হায় আমি ছানাগুলিকে নিয়ে ওই বিশাল হাতির পায়ে পিষ্ট হব । কে আমায় রক্ষা করবে ! কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসযুদ্ধের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের কানে সেই আর্তনাদ পৌঁছতে দেরি হল না । তিনি টুনটুনি পাখির ছোট্ট বাসাটির উপর পরমযত্নে হাতির গলায় বাঁধা বিরাট এক ঘণ্টা চাপা দিলেন । এরপর শুরু হল ভয়ানক যুদ্ধ । কত রথী, মহারথী প্রাণ হারালেন কিন্তু ঘণ্টার তলায় টুনটুনি তার ছানাদের নিয়ে আগের মতোই সুরক্ষিত রইল ।"

'ক্র্যাড়ল টেল্‌স অব হিন্দুইজম্‌'-এর সমস্ত কাহিনীই পাঠকদের পরিচিত কিন্তু উপস্থাপনার গুণে তারা অনবদ্য হয়ে উঠেছে—পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে প্রাচ্য লোককথাকে আমরা পুনরাস্বাদনের দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছি । নিবেদিতা যে সময় এইসব পৌরাণিক কাহিনী লিখেছেন, সে সময় পরাধীন ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির অনেক অপব্যাখ্যা হত । নিবেদিতার মৌলিক প্রয়াস তাই নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে ।

* * *

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর দেশে এক বিদেশিনী এসেছিলেন আদর্শের খোঁজে । ভারতীয় নারীর প্রায়বিস্মৃত সত্তাকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করলেন । উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পথিকৃৎ পুরুষেরা প্রত্যেকেই ভারতীয় নারীর উন্নতির স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা দিয়েছিলেন একটি সঠিক রেখাচিত্র । পাশ্চাত্যের নারীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের নারীর উপস্থাপনা এখানেই সার্থক হয়ে ওঠে । কবি সরলাবালা সরকারের ভাষায় আমরা সেই মহীয়সীর চরণে প্রণাম জানাই—

পুণ্যব্রতে দেবব্রতে,　　ব্রত আজ হল পূর্ণ
　　　　পূর্ণ মনোরথ ।
ভারতে গিয়াছ মিশে,　　পেয়েছ প্রাণের মাঝে—
　　　　তোমার ভারত ।

লেখিকা, গবেষক, ইনস্টিটিউট অব কালচার ।

নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

বন্দিতা ভট্টাচার্য

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমাকে বলেন : "দেখ গা, আমি একদেশে গেছলুম— সেখানকার লোক সব সাদা সাদা । আহা, তাদের কি ভক্তি !" অবতারবরিষ্ঠের এই দর্শন তাঁর লীলাসংবরণের পরবর্তী এক যুগ অর্থাৎ বারো বছরের মধ্যেই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল । অন্তরঙ্গ পার্ষদ নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে রূপান্তর, পাশ্চাত্যবিজয় এবং বিদেশী বহু ভক্তের আগমনে সার্থক হল শ্রীরামকৃষ্ণের 'সাদা সাদা' ভক্তসমাগম-এর অভূতপূর্ব অভিলাষ । সেই ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে আয়ার্ল্যান্ডের মিস মার্গারেট নোবল ভারতের জন্য সর্বস্বত্যাগে, সেবায়, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিতে সমগ্র জাতির বন্দিতা ও নমস্যা হয়ে আছেন । বলা বাহুল্য, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা, শ্রীশ্রীমায়ের আদরের 'খুকি' ও ভারতবাসীর ভগিনী ও লোকমাতা নিবেদিতা ।

বিশ্বের যে কোনও প্রান্তেই শ্রীরামকৃষ্ণের টান কী অপ্রতিরোধ্য ! উত্তরকালে শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে বসে নিবেদিতা বলেছিলেন : "মা, আমরা আর জন্মে হিন্দু ছিলুম । ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি ।"

ভারতের মাটিতে নিবেদিতার প্রথম পদার্পণ ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এবং এখানেই দেহান্ত হয় ১৯১১-এর অক্টোবরে । এই তের বছরে তাঁর জীবনে ঘটে গেছে কত বিচিত্র ঘটনা । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা এবং গুরু-আদিষ্ট ব্রতের সফল উদ্‌যাপন । শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্বকথা তিনি শুনেছিলেন স্বামীজীর কাছে । নিবেদিতার হৃদয়সাম্রাজ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ যে চির-অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ছিলেন তা তাঁর গ্রন্থ, প্রবন্ধ, অজস্র চিঠিপত্র এবং কয়েকটি ঘটনায় সুস্পষ্ট হয়ে আছে ।

'The Master as I Saw Him' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখছেন : "স্বামীজী তাঁর... গুরুদেবের প্রসঙ্গে প্রবেশ করলেন । তাঁর কথা সেই প্রথম (লন্ডনে, ১৮৯৬) শুনলাম ।" ঐদিন থেকেই নিবেদিতার জীবনপথের ধ্রুবতারা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ।

নিবেদিতা তাঁর গুরু, গুরুভাই, অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ এবং অসংখ্য গৃহী ভক্ত ও অনুরাগীর কাছ থেকে কতভাবেই না শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনেছেন, জেনেছেন ও পড়েছেন । আর যত দিন এগিয়েছে ততই তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধির পদ্মটি স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত হয়ে শতদলে বিকশিত হয়েছে । জীবনের প্রতিটি পর্বে— চিন্তায় ও কর্মে— শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃশ্য অথচ অমোঘ প্রভাব অনুভব করেছেন নিবেদিতা ।

কেমনভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণকেই নিবেদিতা তাঁর জীবনপথের দিশারী রূপে নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করে গেছেন তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও অসংখ্য চিঠিপত্রে ।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ জন্মোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত বাসকক্ষ-দর্শনের ব্যাপারে নিবেদিতার স্বেচ্ছা-সিদ্ধান্তগ্রহণ উল্লেখযোগ্য । নিবেদিতা প্রাণের টানেই তো সেদিন গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে— কে কী বলবে বা ভাববে তার কোনও তোয়াক্কা না করেই । শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ছোট্ট ঘরখানি তার সমস্ত শান্তি, পবিত্রতা ও স্বর্গীয় সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর সমস্ত সত্তাকে অভিভূত ও পরিপ্লাবিত করল । "ভবিষ্যৎ জীবনসাধনার সূচনাতেই সেই পরমপুরুষের বিদেহী স্পর্শ অন্তরে অনুভব করে নিবেদিতা কৃতকৃতার্থা ।" ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ মার্চ স্টার থিয়েটারে 'ইংল্যান্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব' সম্পর্কে বক্তৃতার শেষে নিবেদিতার 'রামকৃষ্ণো জয়তি' মন্ত্র

সত্যিই যুগান্তকারী ঘটনা । কারণ তখনও তিনি রামকৃষ্ণ-সংঘভুক্তা নন । অথচ দেখা যাচ্ছে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণায় রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ।

নিবেদিতা কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী তাঁর বাংলা শেখার ব্যবস্থা করেন । প্রথমদিনই তিনি হাতে পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-সম্বলিত দুটি পুস্তক । বাংলা শেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় বাণীর স্পর্শ । পরবর্তী কালে শ্রীম-র লেখা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের ইংরেজী-ভাষান্তর করার ইচ্ছে তিনি অনেকসময় প্রকাশ করতেন । বলতেন : "আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ও-কাজটা আমি করি ।" কিন্তু কোনও অজ্ঞাতকারণে নিবেদিতা ঐ কাজে হাত দিতে পারেননি ।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৮ মে নিবেদিতা কালীঘাটে কালীরহস্য বিষয়ে কিছু মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন । সেখানে এক জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার প্রগাঢ় উপলব্ধির পরিচয় স্পষ্ট— "শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি কালীর অবতার বলে সবসময় মনে করি । ভবিষ্যতে মানুষ কি তাঁকে এইভাবেই গ্রহণ করবে না ?"

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি 'দি স্টেট্‌সম্যান'-এ ম্যাক্সমূলারের 'রামকৃষ্ণ : হিজ লাইফ অ্যান্ড সেয়িংস' গ্রন্থের সমালোচনা— যেটি নিবেদিতা নাম না দিলেও স্বয়ং রচনা করেছিলেন— সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার স্বচ্ছ, প্রণময় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় । এখানে নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব ও সর্বধর্ম-সমন্বয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করে উপসংহারে মন্তব্য করেছেন : "কলকাতার নিকটবর্তী এক মন্দিরের অখ্যাত কালীপূজক কুড়ি কি তিরিশ বছর আগে এমন এক সর্বজনীন ধর্মীয় সত্যে উন্নীত হয়েছিলেন, যা বর্তমান কালের সকল আগ্রহী ভাবুক পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকের মনোযোগের বস্তু ।" নিবেদিতা 'কালী দি মাদার' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে 'টু সেইন্টস অব কালী'-র শেষার্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনার মর্মগ্রাহী বিশ্লেষণ করেছেন । অনুভূতির গভীরতা এবং রসবোধের মাধুর্যে এর প্রতিটি ছত্র শিল্পিত ব্যঞ্জনায় অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদিতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন । কিন্তু মূলত শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বমাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতার জন্য নিবেদিতা তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে চিরপ্রণতা । নিবেদিতার ভাষায় : "প্রায় নিরক্ষর এই মানুষটি কিন্তু মৌলিক চিন্তা ও ব্যাপক অনুশীলনের হিসাবে বিরাট পণ্ডিত ।"

সামগ্রিক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে বিচার করে নিবেদিতা তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত জানালেন যে, তিনি শুধুমাত্র ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক ছিলেন না, তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির চিন্তা ও অনুভূতি । তাই এই পৌত্তলিক কালীসাধক বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি ।

আবার দেখি, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ৩ অক্টোবরে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা একটি চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধির প্রগাঢ় প্রত্যয় : "শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি এতো দৃঢ়ভাবে ধরেছি যে, যদি কোনও জায়গায় আমার ভুল হয়ে থাকে, তবে সে ভুল তাঁর, আমার নয় ।" প্রসঙ্গত বলা যায়, নিবেদিতা আমৃত্যু আত্মপরিচয়ে লিখতেন : ''Nivedita of Ramakrishna Vivekananda.'' এই দুটি নামের রক্ষাকবচ তাঁকে স্বনির্ভর করেছিল । তিনি জানতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আধ্যাত্মিকতার দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যা কখনও ছিন্ন হওয়ার নয় ।

বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিদিনকার কাজ আরম্ভ হবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে প্রণাম জানিয়ে— এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিবেদিতা । নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন তা লেখিকা সরলাবালা সরকারের একটি উদ্ধৃতিতে সুপরিস্ফুট : "মেয়েদের পড়িবার ঘরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র ছিল । তাহার অপরদিকের দেওয়ালে একখানি পৃথিবীর মানচিত্র টাঙানো থাকিত । নিবেদিতা একদিন ঐ মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নীচে টাঙাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন— রামকৃষ্ণদেব জগদ্‌গুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলে থাকাই উচিত ।"

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ, কলকাতা ।

নিবেদিতার রচনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

নিবেদিতার সাহিত্যজীবনকে আমরা দুটি অংশে ভাগ করে নিতে পারি— প্রথম পর্বে অর্থাৎ স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের পূর্বে, তিনি সংবাদপত্রে প্রধানত নারীবাদী আন্দোলনের সপক্ষে কিছু কিছু লিখেছেন, সেইসঙ্গে খনি অঞ্চলের শ্রমিকবস্তী, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখবিষয়ক কিছু কিছু রচনা এবং বিজ্ঞানসংক্রান্ত (ফ্রেনোলজি) প্রবন্ধেরই প্রাধান্য দেখা যায়। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যপ্রেমিক, বিজ্ঞান-অনুরাগী ও ধর্ম-অনুসন্ধিৎসু চেহারাটাই স্পষ্ট। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর নিবেদিতার নবজীবনে উত্তরণ ঘটেছে— তিনি বেদান্ত সম্পর্কে তখন শুধু কৌতূহলী নন, বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কাজেও আত্মনিয়োগ করেছেন। এই পরিবর্তনের যুগে তাঁর সাহিত্যিক পরিচয় অস্পষ্ট।

নিবেদিতার সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে ভারতে আগমনের পরে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নিবেদিতা ভারতে পৌঁছলেন ভারতের কাজে আত্মনিয়োগের অভিপ্রায় নিয়ে। প্রথমে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল একটি হোটেলে। তখন রামকৃষ্ণ মঠ অস্থায়িভাবে নীলাম্বরবাবুর বাগানে। কলকাতায় কয়েকদিন অবস্থানের পর মার্গারেট নোবলের থাকার ব্যবস্থা হল বেলুড় মঠের জন্য সদ্যক্রীত জমিতে অবস্থিত একটি জীর্ণ কুটিরে, তাঁর সঙ্গে আরও দুই শ্বেতাঙ্গিনী মিসেস সারা বুল এবং মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড। স্বামীজী নিবেদিতাকে আহ্বান করে এনেছিলেন ভারতবর্ষে কাজের জন্য। তাই প্রয়োজন ছিল তাঁর ভারতীয়ত্বে দীক্ষা। স্বামীজী প্রথম থেকে লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট রেখে নিবেদিতার শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তাঁকে বাংলা শেখাবার জন্য নিযুক্ত করলেন মিশনের তৎকালীন সহ-সম্পাদক শরৎচন্দ্র সরকারকে। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও তিনি স্বয়ং ভার গ্রহণ করলেন প্রকৃত শিক্ষার— ভারতীয় ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ, কাব্য, দর্শন, পুরাণ এবং জীবনের সর্ববিধ বিষয়ে। প্রতিদিন বেলু… সেই কুটিরে স্বামীজী যেতেন প্রাতরাশের সময়।

আকৈশোর লেখিকা তাঁর চিন্তার ও ভাবপ্রকাশের স্বভূমি খুঁ… পেলেন ভারতে এসে, স্বামীজীর সান্নিধ্যলাভের ফলে। নি… বক্তব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন না হলে সমস্ত রচনাই … দাঁড়ায় ক্লান্তিকর পরিশ্রম। স্বামীজীর সান্নিধ্যেই তিনি তাঁ… বক্তব্যের সঠিক নিশানা খুঁজে পেয়েছেন, তাঁর চেতনা … আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে, হৃদয় উন্মোচিত হয়েছে। নিজে… আবিষ্কারের আনন্দবার্তা বান্ধবী ম্যাকলাউডকে জানিয়ে এক… চিঠিতে তিনি লিখেছেন : "দিনের পর দিন আমি কলম নি… বসেছি কিছু বলব বলে কিন্তু কিছুই বলতে পারিনি। আর এখন … আমার কথার যেন শেষ নেই। নিশ্চিতভাবে আজ আ… পৃথিবীতে আমার নিজস্ব স্থানটিতে এসেছি। পৃথিবীও … আমারই প্রয়োজনে অপেক্ষা করেছিল। আমার ধনুকে তীরটি … উপযুক্ত স্থান খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু যদি তিনি (বিবেকানন্দ) … আসতেন অথবা বিচক্ষণ ক্যাপ্টেন সেভিয়ার তাঁকে যেমন দেখ… চেয়েছিলেন সেইরকম হিমালয়ের চূড়ায় বসে ধ্যান কর… তাহলে আমি আজ যেখানে, সেখানে কিছুতেই পৌঁছতে পার… না।"

২৫ মার্চ নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়ির অস্থায়ী মঠে স্বামী… মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দিলেন এবং তাঁর নাম দি… নিবেদিতা। ভারতীয় তথা বাঙালির সহজ জীবনযাত্রার … পরিচিত এবং অভ্যস্ত করে তোলার জন্য স্বামীজী তাঁর … বিদেশিনী শিষ্যাকে নিয়ে উত্তরভারত ও কাশ্মীর পরিভ্রমণে … করেন। প্রথমে বেলুড় মঠ ও পরে ভারতের বিভিন্ন স্থান … নৈনিতাল, আলমোড়া, কাশ্মীরে অবস্থানকালে স্বামীজী নিবেদি… শিক্ষার জন্য মুখে মুখে ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস অনু…

করে নিবেদিতাকে ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করার কাজে স্বয়ং আত্মনিয়োগ করলেন । নিবেদিতার মনে এগুলি যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে জানতে পারা যায় । ১৮৯৯-এর ১১ নভেম্বর স্বদেশ প্রত্যাগত ম্যাকলাউডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা কালীর ব্যাখ্যায় স্বামীজীর ভূমিকার উল্লেখ করে একদিনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন : "ভাবগম্ভীর পবিত্র পরিবেশ— যা ধারণার অতীত । প্রথমে তিনি দুষ্টুমিভরা শিশুর মতো ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর পরিচয়ে কালীমায়ের কথা শুরু করলেন । তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুলে গেলেন— ক্রমশ কোমলতা ও প্রার্থনায় পূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর বক্তব্য :

That Mother who is manifest in all beings--
Her we Salute.
She whom the world declares to be the great Maya
Her we Salute.

(যা দেবী সর্বভূতেষু...)

আবার পরক্ষণেই :

The breeze is making for righteousness.
The seas are showering blessings on us--
Our Father in Heaven is blissful,
The trees in the forest are blissful, so are the cattle.

(মধুবাতা ঋতায়তে...)

কখনও কখনও রামপ্রসাদী সঙ্গীতের মাধ্যমে কালীতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন :

Who knows what Kali is
The Six darshanas (Systems of philosophy) have not obtained Her darshan (sight)
Kali is Atman (Self) of the Atma-rama (Enjoyer of the Self)
Innumerable are the wonderful evidence
And administration of Her...

(কে জানে কালী কেমন/ ষড়দর্শনে না পায় দরশন...)

ভারতীয় সাহিত্য ও ধর্মাচরণে প্রকৃতির স্বীকৃতি ও প্রভাব দেখে নিবেদিতা মুগ্ধ । স্বামীজী অনুবাদ করে সেগুলি তাঁর সামনে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন এবং নিবেদিতাও তাঁর ডায়েরীতে 'নোট' রাখছেন । হিমালয়ের তুষারধবলবক্ষে বনরাজি-নীলার অবলুপ্তিতে কালিদাসের অনুভূতি, স্বামীজীর ভাষায় : 'Nature is making eternal Suttee on the body of Mahadeva.' আবার ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের অনুবাদ :

O mother earth, father wind,
Friend light, sweetheart water,
Brother sky,
Here take my last salutation
With folded hands!
For to-day, I am melting away into Brahman,
Because my heart became pure,
And all delusion vanished
Thro' the power of your good company.

[মাতর্মেদিনী তাত মারুত সখে তেজঃ সুবন্ধো জল
ভ্রাতর্ব্যোম নিবদ্ধ এব ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ ।
যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতস্ফারস্ফুরন্নির্মল-
জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরব্রহ্মণি ।]

উচ্ছ্বসিত নিবেদিতা লিখেছেন : "And nowhere are we more impressed by the completeness of Eastern Idealism than in this, its relating itself to Nature.''

* * *

এইভাবেই নিবেদিতার শিক্ষা ব্যাপক আকারে ভারতীয় জীবনবোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছে । নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে নিজের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে লিখেছেন : "যদি তুমি গভীরভাবে এর মধ্যে (দি ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ) ডুব দিয়ে স্বামীজীকে খুঁজে পাও তবেই আমাকে সবচেয়ে তৃপ্তি দেবে । আমি অন্যের হাতে যন্ত্র হিসাবে কাজ করেছি— তিনিই (স্বামীজী) চেয়েছিলেন আমার সমগ্র অন্তর, মস্তিষ্ক ও সত্তাকে তাঁর কাজে ব্যবহার করতে ।"

॥ দুই ॥

শুধু 'ওয়েব'-এ নয়, নিবেদিতার ভারত-আগমনের পর যে কোনও রচনা ও বক্তৃতাতেই স্বামীজীকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য নয় । আচার্য বিবেকানন্দ তাঁর প্রবল অনুসন্ধিৎসু শিষ্যা নিবেদিতাকে সম্পূর্ণ ভারতীয় করে গড়ে তুলেছিলেন । এই ভারতীয়তা যে কোনও সাধারণ ভারতীয়ের চেয়ে অনেক বেশি । রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা সম্পর্কে লিখেছেন : "তিনি (নিবেদিতা) যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না ।" এবং "আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ওইরূপ কোন একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি, তাহার কারণ আছে । আমরা এইরূপ ব্যাপক সত্তাকে মন দিয়াই দেখি, চোখ দিয়া দেখি না ।" এই চোখ দিয়ে দেখার মধ্যেই রয়েছে একাত্মতার অনুভূতি । সেই অনুভূতির পরিচয় নিবেদিতার দ্বিতীয় পর্বের রচনার ছত্রে ছত্রে ।

১৩ ফেব্রুয়ারি (১৮৯৯) এলবার্ট হলে নিবেদিতা 'কালী' বিষয়ক

বক্তৃতা দিলেন । সে বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া হল মিশ্র । ব্রাহ্মসমাজ স্বভাবতই সে বক্তৃতা অপছন্দ করলেন কিন্তু কালীঘাট মন্দিরের পক্ষ থেকে তাঁকে 'কালী' বক্তৃতা পুনরায় সেখানে দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল । সেদিন তিনি কালীপূজার বিরুদ্ধবাদীদের মূল তিনটি যুক্তিকে খণ্ডন করলেন : (১) এটি প্রতিমা পূজা, (২) প্রতিমাটি আকারে বীভৎস এবং (৩) এই পূজায় বলিদান প্রথা প্রচলিত ।

নিবেদিতা এই তিনটি অভিযোগ খণ্ডন করে বললেন : (১) "হিন্দুদের তথাকথিত পৌত্তলিকতা নিয়ে... এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, পৃথিবীর সকল সাধকই শব্দপ্রতিমা ব্যবহার করেন, হিন্দু ঋষিরা তার অতিরিক্ত মাতৃমূর্তি রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বোঝার সুবিধার জন্য । তার ফলেই তাঁদের মধ্যে প্রতিমা পূজার প্রচলন ।" (২) "যে অনন্ত পরমচৈতন্যের কাছে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ অলীক বলে প্রতীয়মান হয় বেদান্তে তা-ই ব্রহ্ম নামে অভিহিত এবং যে শক্তি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগদ্ রূপে ব্যক্ত হয় তার নাম 'মায়া' । প্রাচীন ঋষিরা এই মায়াকে প্রতীকরূপ দিতে চেয়েছেন, তাকে স্পষ্ট আকারে প্রকাশ করেছেন কালীমূর্তিতে ।...

"তিনি যে ভয়াল ভয়ঙ্করী, প্রথমেই তা চোখে পড়ে । তিনি উলঙ্গিনী । স্বামীর বক্ষে নৃত্যপরা । কণ্ঠে নৃমুণ্ডমালা । সদ্য নিহতদের তপ্ত রক্তপানে ব্যাদিত রসনা । খড়্গধারিণী । নিক্ষিপ্ত অস্ত্রমধ্যে এবং পিশাচদলের মধ্যে বিরাজমানা । সর্বনাশা মেঘপুঞ্জের মতোই তিনি কৃষ্ণবর্ণা । মুক্তকেশ ছড়িয়ে আছে পদতলে । হা হা হাসিতে লজ্জা পায় বজ্রধ্বনি । তিনি স্বয়ং ত্রাস ।... কালী হিন্দুনারীর বিপরীত প্রতিচ্ছবি ।

"ঠিক এইভাবেই ঋষিরা তাঁকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন । আর আমাদের বলতেই হবে, তাঁরা সফল হয়েছেন । তাঁদের নির্মিত কালীমূর্তির চেয়ে অ-নারীজনোচিত, বিশেষত অ-হিন্দুজনোচিত আর কিছু হতে পারে না ।

"ব্রহ্ম ভিন্ন মায়ার পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যেমন সর্প ভিন্ন রজ্জুতে সর্পবোধ সম্ভব নয় । সুতরাং হিন্দুরমণী, সনাতনী নারীপ্রকৃতির নমুনা যিনি, স্বামী ভিন্ন তাঁর পৃথক অস্তিত্ব নেই । কিন্তু মায়া দেখালেন... সর্বদা পিছন থেকে নিজের আদর্শভূমিকা পালন করার পরিবর্তে তিনি ব্রহ্মকে অধিকার করেছেন, আচ্ছন্ন করেছেন, নিজেকে প্রকাশ করেছেন অগণ্য, ভয়ঙ্কর, নারীত্ব-বিরোধী, মাতৃত্ববিরোধী উপায়ে । অনন্ত, অম্লান, তরঙ্গোৎফুল্ল অমৃত সমুদ্রের পরিবর্তে আমরা পাচ্ছি আপেক্ষিক জগতের বহুধা ব্যক্ত রূপকে, পাচ্ছি দুঃখ ও মৃত্যুর অশান্ত ক্রন্দনকে, আত্মসংরক্ষণের উন্মত্ত সংগ্রামকে— যে সংগ্রাম নীহারিকা থেকে মানবজীবন পর্যন্ত সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায়কে আকারিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে । যদি আত্মপ্রবঞ্চনা না করি, স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে না থাকি, আমরা কখনই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সকল পর্যায়ের মধ্যে বিস্তারিত, জীবনের অগ্রগতির নিয়ামক ঐ নীতিটিকে অস্বীকার করতে পারি না, যার নাম আত্মসংরক্ষণের সংগ্রাম ।

"কালীমূর্তির এই ব্যাখ্যা শোনার পর মনে প্রথম যে- প্রশ্ন জাগবে তা হল, যদি কালী এমনই হন, তাঁকে পূজা করা কেন? তিনি অন্তত কোনমতে পূজার্হ হতে পারেন না ।

"কিছু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এই প্রশ্নের পিছনে রয়েছে উপাসনার মূল অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতারই প্রতিক্রিয়া । হিন্দুদের কাছে পূজার অর্থ, নিত্য স্মরণ-মনন ।

"তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে মোক্ষলাভের পক্ষে এই যে প্রতীয়মান জগৎ, যা তার অগণ্য ভয়ঙ্কর রূপে আমাদের আতঙ্কিত করছে, তা আসলে মিথ্যা আকার ছাড়া আর কিছু নয় ; এর পিছনে আছেন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম— এই বোধের মধ্য দিয়ে সঞ্জীবিত থাকা ছাড়া এ জগতে গুরুত্বপূর্ণ আর কি থাকতে পারে ?...

"তাই কালীকে ভেদ করে দৃষ্টি প্রেরণ করতে হবে । তাঁকে অতিক্রম করে যেতে হবে । সেক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা, তাঁর উপাসনা ছাড়া গত্যন্তর কি ?"...

(৩) বলিদান সম্পর্কে নিবেদিতার বক্তব্য : তাঁর কানে এই কথাটা খুবই কপট ঠেকে যখন শোনেন, নিজের জন্য বলি চলবে কিন্তু দেবীর কাছে নয় । কালীপূজায় লুকোচুরির ভাব নেই । তথাপি কালীপূজার রীতি অনুসারে অপরকে নয়, নিজেকেই শেষ পর্যন্ত উৎসর্গ করার কথা আছে— এতে তিনি আনন্দিত । এই জন্যই শক্তিপূজায় এতো শক্তিলাভ হয় । ত্যাগের দ্বারাই মাত্র শক্তি আসতে পারে, আর কালীকে কখনই ত্যাগ ভিন্ন পূজা করা সম্ভব নয়— ত্যাগ, আরও ত্যাগ চাই তাঁর পূজায় । আত্মোৎসর্গের জীবনধারণের যে অভিপ্রায় একদা খ্রীস্টধর্মে প্রবল হয়েছিল, কালীপূজার মধ্যে সেই ভাবের পুনর্জন্ম হয়েছে ভারতীয়দের মনে, কারণ এই ভাবের তুল্য আর কোন ভাবই এত স্থায়ী ও শক্তিশালী নয় ।

'কালী দি মাদার'-এ স্থান পেয়েছে (১) কনসার্নিং সিম্বল (২) দি ভিসন অব শিব (৩) টু সেইন্টস অব কালী (রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ) (৪) ভয়েস অব দি মাদার (৫) এ ভিজিট টু দক্ষিণেশ্বর (৬) অ্যান ইন্টারসেশন (৭) দি স্টোরি অব কালী ফর এ ওয়েস্টার্ন বেবি । ১৮৯৮ থেকে ১৮৯৯-এর মধ্যে লেখাগুলি পড়ে বোঝা যায়, অতি অল্পসময়ের মধ্যে স্বামীজীর শিক্ষা নিবেদিতা কালীতত্ত্ব কত গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন । সবশেষে স্বামীজীর 'কালী দি মাদার' কবিতাটি যেন মূল বক্তব্যের সারমর্ম । এই পুস্তকের অন্তর্গত রামপ্রসাদকে নিবেদিতা গ্রহণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকারূপে । রামপ্রসাদের গানের অনুবাদগুলি মূলত স্বামীজীর হলেও নিবেদিতারও কিছু কিছু সংযোজন আছে ।

রামপ্রসাদ সম্পর্কে নিবেদিতার মূল্যায়ন : "কবিদের মধ্যে শ্রে

কবি, ঋষি। প্রেম, বেদনা অথবা বীরত্বের দীপ্তোজ্জ্বল খণ্ডাংশকে নির্বাচন করে বহু লোকের করতালির প্রলোভনে সেগুলিকে মণিখণ্ডের মতো সাজিয়ে রত্নমালা গেঁথে তোলা ঋষিকবির কাজ নয়— তিনি জীবনকে দেখেন সামগ্রিকভাবে, যে জীবন মূলত তুচ্ছ, পাংশু, মলিন উপাদানে গঠিত; সেইসঙ্গে কৃষ্ণতম ও উজ্জ্বলতমকেও তিনি দেখেন এবং সমস্তের উপর নতুন আলোকসম্পাত করেন যার ফলে দেখা যাবে জীবন যাদের যাতনা দিয়েছে তারাও সুন্দর দেখেছে তাকে। যিনি শুধুই নাট্যকার, তিনি বেছে নেন শুধু নাটকীয় ভাবটিকে কিন্তু ঋষিকবির কাছে সবকিছুই নাটকীয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ সুদীর্ঘ। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী, তাঁর সাধনার অভিনবত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব বর্ণনার শেষে নিবেদিতার মূল্যায়ন: "ভারতের প্রাচীন প্রজ্ঞা যে মিথ্যা নয়, সেটারই প্রমাণ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ)। এটা অবশ্যই সত্য যে ভারত ভিন্ন অন্য কোনও দেশে তাঁর নির্মিতি সম্ভব ছিল না কিন্তু এটা সত্য নয় যে, তিনি কেবল, এমনকি প্রধানত ভারত-আত্মাকে প্রকাশ করেছেন কারণ তাঁর মধ্যে সমগ্র মানবসমাজের চিন্তা ও চেতনাই মিলিত হয়েছে। কালী-উপাসক শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বমানবতারই প্রতীক।"

রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণের সম্পর্ক নির্ণয় করে নিবেদিতা বলেছেন: "রামপ্রসাদ... জগন্মাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসার ভাষ্যকার, রামকৃষ্ণ... সন্তানের জন্য পরম মাতৃচৈতন্যের পূর্ণাবতার।"

'কালী দি মাদার'-এর সব রচনাগুলিই মূল্যবান। তবে সর্বশেষ রচনাটি 'দি স্টোরি অব কালী' অন্যদিক থেকে তাঁর রচনানৈপুণ্যের সাক্ষ্য। বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে আসার আগে বেশ কিছুদিন নিবেদিতা শিশুদের শিক্ষাদান কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। শিশুদের জগৎ ও তাদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর চেতনা তখনই গড়ে উঠেছিল। কালীকাহিনীতে তাঁর সেই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত। অতি সহজ-সরল ভাবে একটি শিশুকে ধর্ম ও সংস্কৃতির মূলকথাগুলি কিভাবে বোঝাতে হয় এই রচনাই তার বলিষ্ঠ নিদর্শন।

নিবেদিতার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি 'দি মাস্টার এ্যাজ আই স হিম' (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি)। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁকে যখন স্বামীজীর জীবনী রচনার দায়িত্ব দেন তখন দ্বিধাগ্রস্ত নিবেদিতা একটি চিঠিতে বান্ধবী ম্যাকলাউডকে লিখেছেন: "...to be properly written— Swamiji's Life should be all Swamiji. He should move through it, like Jesus through the Gospels—alone, unfettered, unshadowed. But I feel incapable of this, and capable only of telling what I have seen in Him.''

জীবনীরচনার গতানুগতিক পথ না ধরে নিবেদিতা কথামৃতের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এটিকে 'বিবেকানন্দ-কথামৃত' বলা যায়। স্বামীজীর আচার-আচরণ, চিন্তাভাবনা, অনুরাগ-বিরাগের অনুপুঙ্খ বিবরণের মধ্যে দিয়ে, তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে— যা অন্য জীবনীগ্রন্থে দুর্লভ। নিবেদিতা বলেছেন, জীবনীগ্রন্থে 'Life must move'—এই চলমানতা, জীবনের স্বচ্ছন্দ স্পন্দন উপলব্ধি করা যায় প্রতিটি পৃষ্ঠায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বাঁধা ছকে জীবনীগ্রন্থের সাহিত্যমূল্য যখন লুপ্ত হতে বসেছে তখন নিবেদিতা এক নতুন আদর্শের সন্ধান দিয়েছেন। সর্বত্র তিনি আছেন অলক্ষ্যে, শ্রোতা বা নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে। গ্রন্থটি প্রকাশের পর 'হিবার্ট জার্নাল'-এর সমালোচনায় টি. কে. চেনী মন্তব্য করেছেন: ''It may be placed among the choicest religious classics, below the various Scriptures, but on the same shelf with the Confessions of Saint Augustine and Sabatier's Life of Saint Francis.''

'নোটস অব সাম ওয়ান্ডারিংস উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ' (স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে) 'দি মাস্টার' গ্রন্থেরই পরিপূরক। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনকালে স্বামীজী কর্তৃক ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে আলাপচারিতায় তাঁর জীবনই প্রতিফলিত। এই গ্রন্থে পরিত্যক্ত ডায়েরী অংশ বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর সম্পাদনায় 'আনপাবলিশ্‌ড নোটস অব সাম ওয়ান্ডারিংস উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ' নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত। সেখানে স্বামীজী কর্তৃক অনূদিত 'বৈরাগ্যশতকম্'-এর ছত্রিশটি শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯০৪ সালে প্রকাশিত 'দি ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ' পাশ্চাত্যে রীতিমতো ঝড় তুলেছিল। ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারার সুষ্ঠু পরিচয় মিশনারিপন্থী সাময়িক পত্রিকাগুলির গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল। বিশেষত ভারতীয় নারীসমাজের অন্তর্লীন মহত্ত্বের আলোচনাকে তারা একদেশদর্শী, অনভিজ্ঞতাজনিত ভ্রান্তিবিলাস বলে অভিহিত করেছিল। কিন্তু নিরপেক্ষ পত্রিকাগুলি নিবেদিতাকে সাধুবাদই জানিয়েছিল। 'কুইন' পত্রিকা মন্তব্য করে: মানুষকে বোঝার প্রাথমিক গুণ যদি ভালবাসা হয় তাহলে বলতেই হবে লেখিকা সেই গুণের যথার্থ অধিকারী, কারণ তিনি প্রাচ্যজগৎ সম্বন্ধে সেইভাবে লিখেছেন যেভাবে একজন প্রেমিক তার প্রেমাস্পদ সম্পর্কে লেখে।... যাঁরা পূর্বসিদ্ধান্ত-নিপুণ, সহানুভূতিহীন মিশনারি বা পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য রচনা পাঠ করে অথবা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের কচকচি থেকে ভারত সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলেন, তাঁরা এই ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ মাধুর্যমণ্ডিত গ্রন্থ থেকে নিজেদের ধারণা সংশোধিত করলে ভাল হয়।

১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'অ্যান ইন্ডিয়ান স্টাডি অব লাভ অ্যান্ড ডেথ'-এর উৎসর্গপত্রে উল্লিখিত হয়েছে, 'বিকজ অব সরো' (শোকের কারণে)। স্বামীজীর বিয়োগজনিত বেদনাতে নিবেদিতা সংস্কৃত সাহিত্যের মৃত্যু ও প্রেম সংক্রান্ত কিছু প্রার্থনামন্ত্র ও স্তোত্র অনুবাদ করে কাব্যিক গদ্যে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এই

গ্রন্থে—স্বদেশবাসীর সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্য দিয়ে আমরা নিবেদিতার কোমল চিত্তবৃত্তিরই পরিচয় পাই ।

পূর্বে প্রকাশিত কিছু রচনা তাঁর মৃত্যুর পর (১৯১৩) 'স্টাডিস ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় । বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের উৎসব যথা দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রার মধ্যে প্রাণের যে-প্রকাশ তিনি দেখেছিলেন সেগুলির পরিচয় দানের সঙ্গে চিতোর প্রভৃতি স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে এই পুস্তকে । 'ক্র্যাড্‌ল টেলস অব হিন্দুইজম'-এ (১৯০৭) রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীগুলি গল্পচ্ছলে পরিবেশিত হয়েছে । 'ফুটফলস্ অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি' (১৯১৫) নিবেদিতার ইতিহাসচেতনা ও ভারতপ্রেমের উজ্জ্বল সাক্ষ্য ।

এছাড়াও তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে ভারতীয় শিল্পের মহত্ত্বপ্রচার সম্পর্কিত রচনা এবং জাতীয়তাবাদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক রচনাবলী ।

॥ তিন ॥

নিবেদিতার ভারতীয়জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন স্বা বিবেকানন্দ । স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা তাঁর জীবনে দ্বিতীয় পর্বে স্বামীজীর চিন্তা ও চেতনাকেই রূপ দিয়েছেন স্বত দৃষ্টিকোণ থেকে । তাই তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে বিবেকানন্দই যে প্রতিফলিত সে কথা স্বয়ং ঘোষণা করেছেন ম্যাকলাউডকে লে একটি পত্রে "...that it is all Swamiji, all Swamiji, a Swamiji and outside Him I have nothing whatsoever."

শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ থেকে নিবেদিতা—একই চিন্তাস্রোত শিষ্যপরম্পরায় প্রবাহিত ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী প্রবীণ সাহিত্যিক, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ ।

দীর্ঘ ছয় হাজার বৎসর ধরে রক্ষণশীল হয়ে থাকবার আশ্চর্য নৈপুণ্য আপনাদের আছে । কিন্তু এই রক্ষণশীলতা দ্বারা আপনাদের জাতি বিশ্বের সর্বোত্তম অধ্যাত্ম সম্পদগুলিকে এতকাল ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষা করতে পেরেছে । এইজন্যই আমি ভারতবর্ষে এসেছি— জ্বলন্ত আগ্রহে তাঁর সেবা করব বলে ।

—নিবেদিতা

নিবেদিতার মনোলোকে সারদা মাতা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

এ কোথায় এলাম আমি !
শান্তিসায়রের অতলে অপরূপা আনন্দপ্রতিমা ।
জ্যোৎস্নার আলোয় টানা স্নিগ্ধ দুটি চোখ,
মমতার আভায় মাখা মুখখানি,
জলতরঙ্গের সুরে সুরে শুনলাম,
'এসো বাছা এসো, আমি তোমাদেরই মাতা ।'

এলাম কোথায় !

আমি !
রক্তে আমার আগুন, নয়নে আমার বিদ্যুৎ, কণ্ঠে রণধ্বনি,
হাতে ধরা আগুনের পতাকা, মর্মের ঝঙ্কৃত সঙ্গীত—
'ধাও ধাও, শুধু ধেয়ে চলো, অর্জন করো অভীষ্ট জীবনমূল্যে ।'
আচার্যের অমোঘ নির্দেশ,
'জাগো মহাপ্রাণ জাগো, জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে,
তোমার কি নিদ্রা সাজে ?
সিংহিনী তুমি, বাণ-বিদ্ধ গর্জন তোলো,
ছড়িয়ে পড়ুক প্রান্তরে নগরে অরণ্যে ।'

ঐশ্বর্যের মায়াদ্বীপে বসতি ছিল মোর,
সৃষ্টিতে আর স্বপ্নে জড়িত ছিল ভবন ভুবন,
সে দ্বার খুলেছি । ছিঁড়েছি বন্ধন,
জননীর মৌন বেদনা, ভ্রাতা ও ভগিনীর অশ্রু-আঁখির অভিমান,
ক্ষুব্ধ ধিক্কার বন্ধুজনের— আর্তনাদ—

কোথায় চলেছ আলোকিত জীবনে কালো পর্দা টেনে,
অশিক্ষা আর কুশিক্ষা, কুসংস্কার আর অনাচার,
হিংস্র শ্বাপদ, সরীসৃপ, ধর্মের নামে বীভৎসের অর্চনা,
শুধু অন্ধকার, অন্ধকার ।— যাবে সেই দেশে ?

থামো তোমরা !
কঠিন প্রতিজ্ঞার দণ্ডে সরিয়েছি সকল বাধা,
এসেছি ভারতবর্ষে, চিরন্তনী সভ্যতার মাতৃদেশে,
ডাক দিয়েছেন আচার্য আমার,
পরমজ্যোতি বুদ্ধ— নবজাত ।

কোথায় এলাম !
রঙ্গময়ী চৌরঙ্গীর বিরামভবন হতে
নগরী-উত্তরে জীর্ণ কটুগন্ধ গলিতে,
আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বেয়ে গুহাহিত এ কোন্ কক্ষে ?

খুলে গেছে দ্বার শব্দহীন আহ্বানে,
প্রবেশ করেছি— একি ! কোথায় আঁধার ?
তনু-মন-প্রাণের শ্রান্তি নেমে গিয়ে
নীরব শিশির শান্তি ছেয়ে দিল মর্মমূল !
বিরাজিতা প্রশান্তির পরমা প্রতিমা ।
মুখের হাসিতে, নয়নের চাহনিতে, কণ্ঠের ললিত ঝঙ্কারে
ডাক এল,
'দ্বিধায় কেন মা, এসো এসো, আমি তোমার মা ।'

হারিয়ে গেলাম, একেবারে হারিয়ে গেলাম !
কোথায় গেল আমার আমি !
কী অসহ্য আনন্দ, সইছে না, সইছে না, বুক ফেটে যায় বুঝি,
হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে কান্নার স্রোত— মা ! মা ! মা !

মা ?
কী বলছ য়ুম,✧ এঁকে ডাকব মা বলে ?
কেন আমার নিজের জননী নেই ?
ব্যথাতুর আঁখি মেলে প্রতীক্ষায় আছেন দূর সমুদ্রপারে,
নাড়ি-ছেঁড়া কন্যা আমি, বড় আশার আশ্বাসের সন্তান ।
তাঁকে করব বঞ্চনা, কেড়ে নেব তাঁর নিঃসঙ্গ প্রহরের আশ্রয়
দুটি স্পন্দিত শব্দের অধিকার থেকে— 'কন্যা মোর' !

কী বললে ? তিনি আছেন, তিনি থাকবেন এঁরই মধ্যে ?
বিশ্বমাতা ভরে নেবেন তাঁকে নিজের মধ্যে ?
তোমার জননী হয়ে যাবেন বিশ্বজননী ।

হয় নাকি ?

হয় না ? ঐ শোনো কণ্ঠস্বর :
'আমি তোমাদের মাতা ; গুরুপত্নী নই, পাতানো মা নই, কথার কথা মা নই,
সত্যকার মাতা । সত্য সত্য সত্য ।'

হেরে গেলাম ।
পরাজয়ের আনন্দে ভাসছি একটি শব্দের কোলে—
'মা' ।

কতদিন কাটল এই দেশে ।
দেখলাম, জানলাম ভারতবর্ষকে,
বিবেক-আঁখির আলোয় উজ্জ্বল ভারতবর্ষ ।
কেন সেখানে শোনা যাবে শৃঙ্খল-ঝঙ্কার,
কেন ব্যাহত হবে জীবনের যাত্রা পদে পদে
যারা নগণ্য, যারা প্রণম্য— সকলেরই ?
সাড়া দিয়েছি আচার্যের ডাকে, রণধ্বনি তুলেছি কণ্ঠে,
সংগ্রাম সংগ্রাম, অবিরাম সংগ্রাম,
সদা পরাজয়, তবু সংগ্রাম ।

✧ মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা 'য়ুম' সম্বোধন করতেন ।

তবুও ক্লান্তি । কেন ক্লান্তি !
কোথায় তিনি, আমার আচার্য, আমার ঈশ্বর ?
পৃথিবীর জীর্ণ বসন ছেড়ে এখন নয়নের পরপারে
কঠিন দায়িত্ব চাপিয়ে আমার উপরে ।
কাছের মানুষগুলিকে হারাচ্ছি একে একে ।
কোথায় বিরাম— আশ্রয়— বিশ্রাম !

না-না-না— । আশ্রয় আছে, চির আশ্রয়
মায়ের স্নেহের সুধায় ।
কেন তবু এতো ব্যবধান আমার এই রক্তকর্দমের ভূমি থেকে
মায়ের শান্তি-নিবাসের ?

মা, মাগো, আমি যেতে চাই কেবল তোমারই কাছে,
চুপটি করে বসতে, তোমারই পায়ের নীচে ।
একেবারে চুপ না, গোলমাল করব বৈকি, মাঝে মাঝে দুষ্টুমি,
তুমি তো শাসন করবে না, শুধু ভালবাসবে,
বলবে, 'আমার খুকি, এসো আমার কাছে ।'
টেনে নেবে নিজের বুকে মাগো আমার যত যন্ত্রণা ।
মাগো, খ্রীস্টান ঘরের মেয়ে আমি, ছেড়েছি অনেক সংস্কার-বন্ধন,
শুধু মেরী-মাকে পারিনি, অকলঙ্ক কুমারী জননী ।
সেই মাও হারিয়ে গেল তোমারই মধ্যে ।

তুমি দিয়েছ ঢেকে মনের আকাশ নিঃশব্দ সঞ্চারে
যেন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আর কোমল পুষ্পগন্ধ,
মৃদুল বাতাস আর নিঃশব্দ শিশির ।
তোমাকে দেখি আর দেখি— শুধু দেখি অফুরন্ত চোখে ।
দিনের শতকার্যে অচঞ্চল, উন্মুক্ত ভালবাসায় দীনতমের,
সঘন প্রজ্ঞায় মহিমান্বিতা, প্রদোষের ছায়ালোকে ধ্যানাসনে—
নিষ্কম্প দীপের শিখা ।

দেখি আর দেখি— অফুরন্ত চোখে চেয়ে থাকি ।

আকাশ নেমেছে মাটির কুটিরে,
দুটি চোখে চাঁদের ফালি, ললাটে ধ্রুবতারা, অঙ্গে শুভ্রমেঘের আবরণ,
তারই প্রান্তে প্রেমের রক্তরেখা মুখখানি ঘিরে,
পাদমূলে সকল সাধনার সমাপিত নিবেদন ।
কী ঐশ্বর্য আর গরিমা— অনন্য অপরূপ ।

তবু কী সহজ !
যেমন সহজ বাতাস, আলো, অরণ্যের শ্বাস,
নিত্যের বর্ণহারা বিস্তার ।

তাই তো আমাদের তুমি— আমার তুমি ।
আমার আশ্রয়— চির আশ্রয় ।
তোমারই কোলে আমি দেখব নবজাত শিশুর চোখে
প্রথম সূর্যের আলো ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে স্বনামধন্য গবেষক ও বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ।

নিবেদিতার সমাজচেতনা ও সমন্বয়ভাবনা

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

॥ এক ॥

নিবেদিতার সমাজচেতনার উৎসে পাওয়া যায় উনিশ শতকের তিন মনীষীর প্রভাব । অবশ্য সমাজতত্ত্ব নিয়ে তাঁর পড়াশুনাও ছিল ব্যাপক । উল্লিখিত তিন মনীষীর মধ্যে প্রথম জন হলেন প্রখ্যাত রুশ নৈরাজ্যবাদী চিন্তানায়ক প্রিন্স ক্রপটকিন, যাঁকে নিবেদিতা 'আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে রাজা' (King of Modern Sociologists) বলে আখ্যা দিয়েছেন । দ্বিতীয় জন হলেন অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস— প্রখ্যাত ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী, যাঁর কাছে নিবেদিতা দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে সমাজতত্ত্বের বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষা করেছিলেন । নিবেদিতা তাঁর 'The Web of Indian Life' গ্রন্থে এ বিষয়ে গেডিসের প্রতি তাঁর ঋণ স্বীকার করে লিখেছেন : ''In sending this book out into the world, I desire to record my thanks to Prof. Patric Geddes, who by teaching me to understand a little of Europe indirectly, gave me a method by which to read my Indian experience.'' তৃতীয় জন হলেন তাঁর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর ইতিহাসচেতনা ছিল অসামান্য এবং বিভিন্ন দেশের জনসমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে যাঁর জ্ঞানভাণ্ডার ছিল সমৃদ্ধ । স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকার অভিজ্ঞতা-প্রসঙ্গে মেরী লুইস্ বার্ক প্রচুর আলোকপাত করে বলেছেন : ''...he acquired the greatest familiarity with the institutions of this country, religious, political and social. Nor was this familiarity acquired through contacts with intellectuals alone ; he spoke also with the labourers and farmers ; his finger was, as it were, on the pulse of the nation.''

কেবল আমেরিকায় নয়, ভারত বা পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ বহু বিচিত্র জনগোষ্ঠীর একান্ত নিক[ট] সংস্পর্শে এসেছিলেন । ফলে সেইসব দেশের বিচিত্র জনজীবনে[র] আচার-নিয়ম, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস-ধর্মাচরণ, আর্থিক সং[গঠন] প্রভৃতির অনুপুঙ্খ জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন । এ[ভাবে] আধুনিক সমাজতত্ত্ব, যা এদেশে তখন প্রায় অবিদিত ছিল, তা[ও] তাঁর অজানা ছিল না । তার পরিচয় পাওয়া যায় মূলত 'Arya[ns] and Tamilians' রচনা এবং অন্যান্য লেখার মধ্যে । এ বিষয়ে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Swami Vivekananda— The Patriot Prophet' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে একটি সমী[ক্ষা] করেছেন । সেখানে সমাজতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিবেকানন্দের বিপুল জ্ঞানের একটি সামগ্রিক পরিচয় পাও[য়া] যায় ।

নিবেদিতার গুরু এই বিপুল জ্ঞান ও বিদ্যা তাঁকে অকাতরে দা[ন] করেছিলেন । কখনও বেলুড়ে গঙ্গাতীরে বৃক্ষতলে বসে, কখন[ও] হিমালয়ের পথে পথে ভ্রমণকালে, কখনও অর্ধপৃথিবী পরিক্রম[ার] সময় সমুদ্রবক্ষে অর্ণবপোতে— চলমান বহ্নিমান গুরুর সান্নি[ধ্যে] নিবেদিতা আত্মজ্ঞানই নয়, শিক্ষা করেছিলেন ইতিহাস, সমাজত[ত্ত্ব], পুরাতত্ত্ব, দর্শন ও আরও অনেক বিষয় । নিবেদিতা তাঁর লেখা দু[টি] গ্রন্থে (The Master as I Saw Him এবং Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda) সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন । সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে দিয়েছিলেন এক অখণ্ড মানবতাবোধ । এই অখণ্ড মানবতাবোধ[ই] নিবেদিতার সমাজচিন্তার ভিত্তিস্বরূপ হয়েছিল ।

বিবেকানন্দের অখণ্ড সর্বাত্মবোধের পশ্চাতে ছিল বেদান্তদর্শন । নিবেদিতার সমাজচিন্তারও মূলে ছিল এই বেদান্ত— যা তিনি তাঁর গুরুর নিকট শিক্ষা করেছিলেন । নিবেদিতার একটি রচনা— 'The Sociological Aspects of the Vedanta

Philosophy'- তে দেখা যায়, বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি দিগন্তবিসারী অসীম অনন্ত আকাশের মতো, যেখানে সমগ্র মানবজাতি ও তার সমগ্রিক প্রচেষ্টা একত্র গ্রথিত। বেদান্তকে নিবেদিতা বলেছেন : 'The Science of Religion.' এর মূল সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি লিখছেন : ''Not universal toleration merely but universal inspiration.'' তাঁর মতে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যেভাবে দেখেছেন তাতে 'বহু' ও 'এক' একই সত্যের বিচিত্র প্রকাশ। সুতরাং সব ধর্মই সত্য। তাহলে অন্যের ধর্মকে কেবল সহ্য করে নেওয়াই নয়, সব ধর্ম থেকেই প্রেরণা নেওয়াই হল আসল কথা। ধর্মে ধর্মে সংঘর্ষের মূল উৎপাটিত হয়েছে এখানে। সেজন্য এই ভাবনা অনুসরণ করলে সমাজের একটি গ্লানি— ধর্মে ধর্মে সংঘর্ষের হাত থেকে মানুষ চিরতরে মুক্তি পেতে পারে। নিবেদিতার ভাষায় : ''With the increase of reverence for other systems, each member of the community would be likely to choose his own religious ideal, and this must bear fruit in the development of individuality, the increase of religious culture, and the indefinite extension of the sense of Human Brotherhood.''

নিবেদিতার মতে, বেদান্তভিত্তিক সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে হিংস্রতা, স্বার্থপরতা কমাবে এবং সচেতনভাবে সকল মানুষের প্রতি সেবার মনোভাব জাগাবে এবং তাতেই হবে সভ্যতার উচ্চতর বিকাশ : ''Wherever this sense of Humanity deepens, brutality and the struggle for selfish ends must decrease,... it is impossible to suppose that the conscious service of all would prove a less powerful civilising motive than the pursuit of private wealth or power.''

মূলে এই বৈদান্তিক সর্বাত্মবোধের জন্যই যেখানে মানবতার নিপীড়ন ঘটেছে, সেখানেই নিবেদিতা দেখেছেন... বিবেকানন্দের মধ্যে বিপুল অগ্নি উদ্গীরণ। কোটি কোটি দুর্গত মানুষের বিপুল দুঃখের ভার অন্তরে বহন করে বিবেকানন্দ বলেছেন : "তাদের জানতে দাও যে তাদের মধ্যে সেই আত্মা আছেন— অজ্ঞ, অশক্ত নরনারী সকলেই শিখুক— কেউ দুর্বল নয়। আত্মা অনন্ত শক্তিমান, সর্বব্যাপী। ওঠ দাঁড়াও, নিজেকে জোরের সঙ্গে প্রচার কর, তোমার মধ্যে যে ভগবান আছেন তাঁকে ঘোষণা কর ; তাঁকে অস্বীকার করো না।" বেদান্তে নিহিত এই 'অভীঃ' বাণীতে তাই কেবলমাত্র ধর্মাচার্য বা পণ্ডিত বিদ্বজ্জনেরই অধিকার নয়, অধিকার প্রতিটি মানুষের। বিবেকানন্দের ভাষায় : "এই মহান ভাবধারা উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা অশিক্ষিতরা, শক্তিশালী অপেক্ষা দুর্বলেরা অধিক চাহিতেছে।"

মানব-দুঃখে যন্ত্রণাদগ্ধ শ্রীগুরুর অন্তরের পূত পাবকস্পর্শে নিবেদিতারও অন্তর অগ্নিময় হয়ে উঠেছিল। তাঁর বিপ্লবের পথে চলার গূঢ়তম কারণ এই অগ্নিস্পর্শ। গুরুর এই শিক্ষার ফলেই আমরা তাঁকে দেখতে পেলাম দুঃখী-আর্তের বন্ধুরূপে, সর্বপ্রকার অবিচারের বিরুদ্ধে অসি হস্তে সৈনিক-রমণীরূপে। নিবেদিতার এই বিদ্রোহিণী মূর্তির একটি চিত্র পাওয়া যায় র‍্যাটক্লিফের বর্ণনায় : ''They (friends) think of her as tending the victims of famine and plague, or ministering day by day among the humble folk with whom her lot was cast: putting heart into the heartless and the defeated, and showing to the young and perplexed the star of a glowing faith and purpose ! নেভিনসনের বর্ণনায় এ মূর্তিটি আরও স্পষ্ট— ''For a spirit like hers but battle in this world, and it is as a soldier in the war of liberation that I remember her—a soldier with a flaming sword.''

নিবেদিতার জীবনের কেন্দ্রশক্তি বিবেকানন্দের এই প্রজ্বলন্ত আত্মা। গুরুর বাণীকে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের হাতে তুলে দেবার মাধ্যম রূপেই তিনি নিজেকে বিবেচনা করতেন, সেজন্য বলেছিলেন : ''I know that here I was but the transmitter, but the bridge between him and the countless host of his own people, who would yet arise and seek to make good his dreams.'' ভবিষ্যদ্‌বংশধরেরা বিবেকানন্দের মহান স্বপ্ন সফল করে সমাজের 'আমূল রূপান্তর' ঘটাবে— এই বিশ্বাস নিয়ে নিবেদিতা ভারতের সমাজ-জীবনের মর্মে প্রবেশ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

॥ দুই ॥

নিবেদিতা একটি দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন— সেটি হল, গেডিসের ভাষায়, স্থূল ও সূক্ষ্মকে একই সঙ্গে দেখবার ক্ষমতা : ''She was open at once to the concrete and the abstract, to the scientific and philosophic.''নিবেদিতা তাঁর ভারত অনুসন্ধান প্রয়াস অন্তে ভারতের বাহ্যজীবনের অন্তর্লীন যে অন্তরতম জীবন তার সত্য পরিচয় লাভ করেছিলেন। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃত আলোকপাত করে বলেছেন : ''The mental sense by the help of which we feel the spirit of a people, is like the sense of sight or of touch-- it is a natural gift. It finds its objects, not by analysis, but by direct apprehension. Those who have not this vision merely see events and facts, and not their inner association. Those who have no ear for music, hear sound, but not the song. Sister Nivedita had uttered the vital truths about Indian life.'' অর্থাৎ মানুষ মনের যে

শক্তির দ্বারা একটি জাতির অন্তরাত্মাকে দেখতে পায় তা দর্শনশক্তি বা স্পর্শশক্তির মতোই প্রকৃতিদত্ত একটি ক্ষমতা । দেখার এ ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে দেখে না, গোটা জিনিসটা প্রত্যক্ষ দেখে । যাদের এ ক্ষমতা নেই তারা ঘটনাগুলিকে দেখে কিন্তু সেগুলির মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ তাকে দেখতে পায় না । যাদের সঙ্গীত বোঝার কান নেই তারা শব্দগুলি শোনে মাত্র, সঙ্গীতটি উপভোগ করতে পারে না । [নিবেদিতা সেই ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন ।] সেজন্য ভারত সম্পর্কে তিনি খাঁটি সত্যগুলি উচ্চারণ করেছেন ।

ভারতে অনন্ত বৈচিত্র্য— ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, জনজাতির বৈচিত্র্য ; ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ— সব কিছুতেই বৈচিত্র্য । কিন্তু নিবেদিতার অসামান্য গভীর দৃষ্টি এর মধ্যেই এক শৈলদৃঢ় ঐক্যের সন্ধান পেয়েছে অনায়াসে । ভারতের ভৌগোলিক ঐক্যের কাব্যময় প্রকাশ দেখি তাঁর অনবদ্য রচনার একটি ছত্রে— ''Around Her feet the saphire seas, with snowclad mountains behind Her head, She sits enthroned.''

আর ভারতের অনন্ত জন-জাতিবৈচিত্র্যই ভারতীয় মহাজাতির ঐক্যের প্রমাণ বলে মনে করেছেন নিবেদিতা । বলেছেন : ''I find an overwhelming aspect of Indian unity in the fact that no single member or province repeats the function of another.''

নিবেদিতার মতে একটি জাতির ঐক্য একটি যান্ত্রিক ঐক্য নয়, এ ঐক্য জৈবিক । তাও শুধু নয়, জাতীয় ঐক্য উচ্চতর জীবদেহের ঐক্যের মতো । ''It is not like the unity of a lobster''— এ ঐক্য চিংড়িমাছের ঐক্যের মতো নয় । চিংড়িমাছের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই একইরকম । কিন্তু মানবদেহের ক্ষেত্রে তা নয়— হাত, পা, মুখ, চোখ, কান, মাথা প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে কিন্তু তৎসহ সমগ্র দেহটির মধ্যে একক একটি সত্তা বর্তমান । জাতীয় ঐক্য ঠিক সেইরকম । তার উপাদান বৈচিত্র্য থাকুক কিন্তু তার মধ্যে একটি আত্মিক ঐক্য বর্তমান ।

নিবেদিতার মতে, বিচিত্র উপাদানের মধ্যে ঐক্য সম্পাদনে ভারতের পারদর্শিতা অনন্য । ভারত তার এই অসামান্য সমন্বয়ী প্রতিভার দরুন বিদেশাগত বহু জনজাতিকে যুগের পর যুগ ধরে আত্মস্থ করে নিয়েছে ; তাদের আচার-ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস ও আদর্শ— এ সবকিছু গ্রহণ করে আপনার করে নিয়েছে । তাঁর ভাষায় : ''India is a nation by dint of Her unique genius of synthesis making which succeeded in absorbing into the nation body hordes of foreign races, their customs, creeds and ideas, almost in every
নিবেদিতা যে সত্য বলেছেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাস ধা
আছে । ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অনার্যজাত
জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব কর্তৃক উদীচ্যদেশীয় সূর্যমূর্তির পুজ
প্রবর্তিত হয় । সম্ভবত আফগানিস্থানের উত্তর এবং
সাগরের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত অঞ্চল থেকে একশ্রেণীর
সূর্যমূর্তি বা মিত্র দেবতার পূজা নিয়ে ভারতে আগমন
এঁরা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন । এঁরা ব্রাহ্মণবর্গে
করেন । এঁদের থেকেই ভারতে সৌরসম্প্রদায়ের উৎপত্তি

নিবেদিতার মতে জীবনাদর্শ ও ধ্যানধারণায়ও ভারত
অখণ্ড জাতি । তাঁর গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিসহায়ে তিনি
যে, এখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই বিশ্বাস, মানবজ
এক কথায় বিবেক ও বাসনার মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম ।
সেইজন্য ভারতীয়ের জীবনে শ্রেয়ের স্থান প্রেয়ের উর্ধ্বে

তাঁর মতে এখানকার সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠানকে রূ
হয়েছে এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করবার জন্য । প্রাচি
যখন পিরামিড নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছে, ভা
সেইসময়ে অনুরূপ শক্তি নিয়োগ করেছে বেদ ও উপনি
মহান তত্ত্ব আবিষ্কারে । আর বহু প্রাচীন কাল হতে অব্যা
উচ্চচিন্তা-অনুশীলনে ব্রতী হওয়ায় ভারত এক অতি
নৈতিক জীবন গড়ে তুলতে পেরেছিল উচ্চ-নীচ সক
মানুষের মধ্যেই । ভারতীয় সভ্যতা তাই নৈতিক মান
অতি উন্নত সভ্যতা— হয়তো পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ
নিবেদিতা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সহায়ে এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌ
চিন্তার সূক্ষ্মতায়, অনুভূতি লাভের ক্ষমতায় ও হৃদয়বৃত্তি
ভারতের দক্ষতা অতুলনীয় । ভারতের সমাজ এরই ফ
পৃথিবীর সেরা সভ্যতার ধারক ও বাহক ।

নিবেদিতার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি শুধু বাহ্যজীবনে
থাকেনি । তা প্রধানত ভাবজগতের গভীরে প্রবেশ করে
বাহ্য-সংগঠনের পশ্চাতে থাকে ভাবজগতের সংগঠন : ''
a self-organization of thought that precedes
organization.'' নিবেদিতা সেজন্য শুধু সামাজিক প্রথা
বিধিনিয়ম সমূহই নয়, সে সকলের পশ্চাতে চিন্তার যে
তাকে গভীর অনুসন্ধিৎসায় দেখেছেন । সেজন্যই তি
ভারতকে দেখতে পেয়েছেন এবং তারই জন্য
দেহ-মন-প্রাণ-আত্মাসহ তার সমগ্র সত্তাকে তিনি তাঁ
যেভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন তা এককথায় অসাধার

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ, বেথুন কলেজ ।
সম্পাদিকা, নিবেদিতা ব্রতী সংঘ ।

ভারতে জাতীয়তা ও নিবেদিতা

স্বামী বলভদ্রানন্দ

আজ থেকে একশ বছর আগে ১৮৯৮-এর জানুয়ারি মাসে নিবেদিতা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। যে-ভারতবর্ষে তিনি এসেছিলেন, সেই ভারতবর্ষ পরাধীন হীনম্মন্য ভারত। বাইরে তার অশিক্ষা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্য ; অন্তরেও তার দীনতা। শাসক ইংরেজ তাকে অসভ্য বলে ঘৃণা করে। তার চেয়েও বড় কথা, নিজেকেই সে ঘৃণা করে। নিজের সুদীর্ঘ অতীত নিয়ে সে লজ্জিত, বিড়ম্বিত। সেই অতীতকে ভুলতে সে সদা-ব্যস্ত। তার জীবনের সার্থকতা যথাসম্ভব ইংরেজের ভাব ও সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করার মধ্যে। প্রচলিত অর্থে যে যত শিক্ষিত, তার মধ্যে এই আত্মশ্রদ্ধাহীনতা এবং পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তা তত বেশি। কারণ, ইংরেজের শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, পদানত ভারতবাসীকে হীনম্মন্য ও ইংরেজ-পূজারী করে তোলা।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে নিবেদিতার ভারতে আগমন। তার আগে ভারতের জাতীয়-জীবনে, অন্তরালে ও প্রকাশ্যে, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর অন্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারত-পরিক্রমা করেছেন। ভারতের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে ভারতবর্ষের যথার্থ রূপকে আবিষ্কার করেছেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ভারতের সনাতন শাস্ত্রের সঙ্গে আপামর ভারতবাসীর প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা অদ্ভুত ঐক্য খুঁজে পেয়েছেন, এবং এদের সমন্বয়ে তাঁর এক নিজস্ব জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে। উপলব্ধি করেছেন, ভারত ও পৃথিবীর জন্য তাঁর ভাবী ভূমিকার কথা। আবির্ভূত হয়েছেন শিকাগো ধর্মমহাসভায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বাণী অভাবনীয় আলোড়ন এনেছে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে। তারপর চার বছর আমেরিকায় ও ইংল্যান্ডে বেদান্তপ্রচার করে ভারতে ফিরে এসেছেন ১৮৯৭-এর জানুয়ারিতে। বিপুল উন্মাদনায় ভারতবর্ষ তাঁকে বরণ করে নিয়েছে, এবং এই প্রথম আত্মবিস্মৃত ভারতবাসী তাদের বহু-প্রচারিত হীনদশাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

বিবেকানন্দের ভারত-আবিষ্কার শুধু পাশ্চাত্যের জন্য নয়, ভারতের জন্যও। ভারতের আত্মমহিমার দিকে তিনি যেমন ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তেমনি নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন ভার দুর্বলতাগুলি। কোনও ভাবালুতা দিয়ে তিনি ভারতের অক্ষমতা ও ব্যর্থতাকে ঢাকতে চাননি। তিনি দেখেছেন, ভারতের শক্তি যেমন তার ধর্ম ও সংস্কৃতিতে, ভারতের দুর্বলতা তেমনি তার নারী ও জনসাধারণের দুরবস্থায়। কোনও দেশ মানবাত্মার মহিমা এতো উচ্চস্বরে ঘোষণা করেনি। আবার কোনও দেশই সাধারণ মানুষ ও নারীকে এতটা অবহেলা করেনি।

স্বদেশে ফিরে (১৮৯৭-এর ১ মে) বিবেকানন্দ যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন, জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথনির্দেশ তার 'ত্যাগ ও সেবা'ভিত্তিক কার্যাবলীর মধ্যে ছিল। কিন্তু নারীদের উন্নতির দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি প্রয়োজন অনুভব করলেন একদল নারীকর্মীর এবং তার চেয়েও বেশি করে একজন নারী-নেত্রীর। স্বদেশে এই নেত্রী খুঁজে পাননি তিনি। তাই বিদেশ থেকে নিবেদিতাকে এই কাজে আহ্বান করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন : "ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা নারীর, একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছে না, তাই তাকে অন্য জাতি থেকে (ঐ নারী) ধার করতে হবে।" স্বামীজীর মনে হয়েছিল : 'নিবেদিতাই সেই নারী।' তাঁর

'শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা, এবং সর্বোপরি তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্ত-ই নিবেদিতাকে সেই উপযুক্ত নারীরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে । বস্তুত, বিধাতা যেন নিবেদিতাকে ভারতবর্ষের জন্যই তৈরি করেছিলেন । নিবেদিতার পিতা ও পিতামহ ছিলেন ধর্মযাজক । মাতামহ ছিলেন আইরিশ হোমরুল আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা । নিবেদিতার মধ্যে সহজাতভাবেই তাই ধর্মানুরাগ ও স্বদেশপ্রেমের সহাবস্থান দেখা গিয়েছিল । পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষেরও তখন সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল এই দুটি জিনিসই । তাদের কাছে নিবেদিতা পরবর্তী কালে এই দুটি জিনিসই বিশেষ করে প্রচার করেছেন— স্বধর্ম ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ ।

ভারতবর্ষের কোনও কল্পিত অবাস্তব ছবি উপস্থিত করে স্বামীজী নিবেদিতাকে মুগ্ধ করতে চাননি । যেমন ভারতবর্ষের অন্তরের মহিমার কথা বলেছেন, তেমনি, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার নির্মম রূপ— যা নিবেদিতার বহুপরিচিত ইউরোপীয় পারিপার্শ্বিকতার বিপরীত, তার প্রতিও নিবেদিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি এবং ভারতবর্ষে এলে নিবেদিতা কী কী বাধার সম্মুখীন হতে পারেন, সে সম্বন্ধেও তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ।

তা সত্ত্বেও নিবেদিতা এসেছিলেন, আর স্বামীজী তাঁর শিক্ষিত পরিশীলিত মনে, মনীষার গভীরে, অনুভূতিময় অন্তঃকরণে ভারতবর্ষকে প্রবেশ করিয়ে দিতে শুরু করেছিলেন । অনুপম ভারত-ব্যাখ্যাতা স্বামীজী । ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সবই তাঁর অলৌকিক প্রতিভা ও অনুভূতির স্পর্শে নতুন হয়ে উঠত । যা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, তা-ও মহৎ তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভাসিত হত । নিবেদিতাকে প্রস্তুত হতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর উত্তরভারত ও হিমালয় পরিভ্রমণের দিনগুলি । ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতার ভারতে আগমনের কয়েকমাস পরেই স্বামীজী যখন ঐ ভ্রমণে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেন : চল আমার সঙ্গে ভ্রমণে, তুমি এক আছ, আমি তোমায় বিশ করে দেব ('Come on this journey, and I will make you twenty.') । মাত্র দু-বছর স্বামীজী শিক্ষা দিয়েছিলেন নিবেদিতাকে । ভারতবর্ষ নামক মহাগ্রন্থটি তাঁর সামনে মেলে ধরেছিলেন তার পতন-অভ্যুদয়, লজ্জা ও গৌরবসহ । ক্রিস্টিন বলেছেন, তাঁর ভারতপ্রেমের জন্ম হয়েছিল সেই মুহূর্তে, যে-মুহূর্তে তিনি স্বামীজীর মুখে INDIA শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনেছিলেন । তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল, কী করে স্বামীজী পারতেন পাঁচ অক্ষরের ঐ ছোট্ট শব্দটিতে এতো ভাব ভরিয়ে দিতে, একটা বড় গ্রন্থ লিখেও মানুষ যা পারে না ? স্বামীজীর মধ্যে ছিল অপরের মধ্যে ভারতপ্রেম-সঞ্চারের যাদুশক্তি । "যে-ই শুনত, তার মধ্যে তা জেগে উঠত । তারপর থেকে তাদের কাছে ভারতের সবকিছুই আগ্রহের বস্তু হয়ে উঠত সবকিছু জীবন্ত হয়ে উঠত— ভারতের জনগণ, ইতিহাস, শিল্প স্থাপত্য, আচার-ব্যবহার, নদী, পর্বত, উপত্যকা, সমভূমি— তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-ধারণা ।" নিবেদিতারও তা-ই হয়েছিল স্বামীজীর সান্নিধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ এক স্বতন্ত্র তাৎপর্য ও মর্যাদা নিয়ে তাঁর কাছে ধীরে ধীরে রূপ-পরিগ্রহ করেছিল ।

নিবেদিতা একবার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন, তাঁর মহাসৌভাগ্য এইখানে যে, আর কোনও বিদেশী পর্যটক বিবেকানন্দের মতো ভারত-ব্যাখ্যাতা পাননি, তিনি যেমন পেয়েছিলেন । ভারতবর্ষকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করবার পরেই নিবেদিতা ভারতসেবায় ব্রতী হলেন । স্বামীজী বিশেষত যে-কাজে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন, সেই নারীদের জন্য বিদ্যালয় হল । নিবেদিতাকে এই ব্যাপারে স্বামীজী পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন । বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে এইভাবে উপস্থিত করেছিলেন : "আমি চাই আমার কোনও সহকারী না থাকেন । অতি সামান্যভাবে কাজের আরম্ভ হবে এবং ছোট ছেলেমেয়ে যেমন বানান করে পড়তে শেখে, আমিও তেমনি ক্রমে ক্রমে নিজের প্রণালী ঠিক করে নেব । তাছাড়া, আমার ইচ্ছা, এই শিক্ষার মধ্যে যেন একটা নির্দিষ্ট ধর্মভাব থাকে ।" স্বামীজী নিবেদিতার পরিকল্পনা শুনলেন এবং অনুমোদন করলেন । নিবেদিতা চেয়েছিলেন, স্বামীজী তাঁর পরিকল্পনাটির সমালোচনা করুন এবং কোনও ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিন । কিন্তু নিবেদিতার যোগ্যতায় স্বামীজীর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল । তিনি জানতেন, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিলেই নিবেদিতার অন্তর্নিহিত শক্তি ঠিকঠিক জেগে উঠবে । তাই নিবেদিতাকে তিনি বললেন যে, সমালোচনা করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় ; "কারণ, আমার ধারণা, তুমিও আমার মতো ঐশীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত ।... আমি তোমার পরে তোমার মেয়েরা এবং তাদের মেয়েরাও সেইরকম হবে । সুতরাং তুমি যা সবচেয়ে ভাল বিবেচনা করেছ, সেই কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করব ।"

এ সম্বন্ধে সেদিন কিছু না বললেও অন্য একদিন স্বামীজী নিবেদিতাকে স্ত্রীশিক্ষা এবং ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য কাজের মূলসূত্র হিসেবে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, যা নিবেদিতা চিরকাল মনে রেখেছিলেন । পরে নিবেদিতা তাঁর বক্তৃতা ও রচনায়, তাঁর নিজস্ব ভাষায়, এই ভাবগুলিকে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন । স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন : "স্বদেশ এবং ধর্মের মধ্যে যেন সমন্বয় ঘটে । হিন্দুধর্ম নিষ্ক্রিয় না থেকে সক্রিয় এবং অপরের উপর প্রভাবশালী হোক, ছুঁৎমার্গকে সর্বরকমে দূর করতে হবে । ভারতের অভাব কর্মকুশলতা, কিন্তু সেজন্য প্রাচীন চিন্তাশীল জীবন সে যেন কখনও ত্যাগ না করে ।" ১৩ নভেম্বর ১৮৯৮ শ্রীমা সারদাদেবীর উপস্থিতিতে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় । শ্রীমা বলেন : "আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের

ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে ।"

* * *

জাতীয় ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । জাতীয়তার জাগরণে নিবেদিতার কর্মপ্রয়াসের সূচনা এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে । বাগবাজার অঞ্চলের কয়েকজন পরিচিত প্রতিবেশী পরিবারের কুমারী কন্যা ও বালবিধবাদের নিয়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শুরু । নিবেদিতা তাদের শেখাতেন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে ইংরেজী ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতি । ছাত্রীদের স্বাভাবিক শিল্পবোধকে বিকশিত করে তোলার জন্য এই সঙ্গে শেখানো হত সূচীশিল্প, অঙ্কন প্রভৃতি । বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে একটি হিন্দু অন্তঃপুরের মতো । ছাত্রীরা অনুভব করত, তারা যেন তাদের বাড়ির পরিবেশেই আছে । শুধু তার সঙ্গে অতিরিক্ত যোগ হয়েছে সিস্টারের অপার্থিব ভালবাসা । শিক্ষা তাদের কাছে আয়াসসাধ্য না হয়ে আনন্দের হয়ে উঠত ।

এই শিক্ষার কাজে নিবেদিতা কিছুদিনের মধ্যেই যে বাস্তব সমস্যাটির সম্মুখীন হলেন, তা হল বাল্যবিবাহ । ছাত্রীরা অল্পদিন শিক্ষা নেওয়ার পরই বিবাহের জন্য তাদের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যেত । ছাত্রী এবং শিক্ষিকা উভয়েরই আপত্তি থাকত, উভয়েই মনঃকষ্ট পেতেন, কিন্তু তবুও সামাজিক অনুশাসনই জয়লাভ করত । সমস্ত কুমারী ছাত্রীর শিক্ষাই মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেত । এরপরে স্বামীজীর পরামর্শে নিবেদিতা তাই বালবিধবাদের শিক্ষার ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন । নিছক শিক্ষাদানের চেয়েও নিবেদিতা তাদের শিক্ষিকা হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে তারা নারীশিক্ষা প্রসারের ব্রত নেয় এবং নারীদের সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করে । স্বামীজীর কল্পনা ছিল এই সমস্ত 'ব্রতধারিণী'র কাছে কর্মক্ষেত্রই হবে গৃহ, ধর্মই হবে একমাত্র বন্ধন এবং তাদের ভালবাসা থাকবে শুধু গুরু, স্বদেশ ও জনসাধারণের প্রতি ।

* * *

এই বিদ্যালয়কে উপলক্ষ করেই নিবেদিতা ভারতীয় নারীর অন্তঃপুর জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । বাগবাজার পল্লীর সকলেই তাঁকে আপন করে নেওয়ায় পল্লীরমণীদের খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য নিবেদিতার হয়েছিল এবং ভারতীয় নারীর যে-মহিমময় রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল, সেই রূপ আর কোনও বিদেশীর চোখে এর আগে ধরা পড়েনি । তাঁর 'The Web of Indian Life' এবং 'Studies from an Eastern Home' গ্রন্থদুটি এইসব লজ্জাশীলা, নীরব, মহাপ্রাণ ভারতীয় নারীর চিত্রে পূর্ণ ।

বাগবাজার পল্লীর ঐ অমূল্য অভিজ্ঞতা ছিল বলেই নিবেদিতা চিরকাল তাঁর রচনা ও ভাষণে সতেজে ভারতীয় নারীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন । ভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাঁর মতে, ভারতের মহীয়সী নারীরা । "She (India) is, above all others, the land of great women." এবং ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের যে-দিকে চোখ ফেরানো যায়, সর্বত্র সেই মহীয়সী নারীদের উপস্থিতি । "Wherever we turn, whether to history or literature, we are met on every hand by these figures." ভারতীয় নারীরা অশিক্ষিত, একথা নিবেদিতা সহ্য করতে পারতেন না । ইংরেজী ভাষা না জানলেও এবং ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও, ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় নারীরা বিশেষ পরিচিত এবং সেই শিক্ষা তাদের সেবা ও পবিত্রতাময় যে-চারিত্রশক্তির অধিকারিণী করেছে, পাশ্চাত্য নারীদের মধ্যে তা দুর্লভ । একইভাবে তিনি প্রতিবাদ করেছেন এই ধারণার যে, ভারতের নারীরা অত্যাচারিত এবং এদেশে তাদের বিশেষ মর্যাদা নেই । তিনি বলেছেন, ভারতে নারীরা মোটেই অত্যাচারিত নন । তরুণতর জাতিগুলির মধ্যেই বরং নারীদের মর্যাদা কম । ভারতের সমাজে ও পরিবারে নারীরা যে বিশেষ মর্যাদা ও সুখ-শান্তি উপভোগ করে, নিবেদিতার মতে তা ভারতীয় জীবনের অন্যতম সম্পদ । "Indian women are certainly not oppressed. The crime of ill-treating women is at once less common and in less brutal form here than in younger countries. And the happiness, the social importance, and may I say, the lofty character of Indian women, are amongst the grandest possession of the national life."

ভারতীয় নারীদের নিয়ে নিবেদিতার গর্বের সীমা ছিল না । ইতিহাস থেকে বিভিন্ন নারীচরিত্র খুঁজে নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিক কালের মানুষ নারীকে যে-যে ভূমিকায় দেখতে আগ্রহী, সেই প্রতিটি ভূমিকার আদর্শ নারীচরিত্রই ভারতে রয়েছে । যদি তেজস্বিনী বীর নারীই আদর্শ হয়, তবে ভারতের আছেন পদ্মিনী, ঝাঁসীর রানী ও চাঁদবিবি । যদি সংগঠনী-শক্তিতে ভরপুর নেত্রী-চরিত্র তার কাম্য হয়, তবে আছেন রানী ভবানী ও অহল্যাবাঈ-এর মতো চরিত্র । যদি জায়া-ভাবই আদর্শ হয়, তবে ভারতের আছে সতী, সাবিত্রী ও সীতা । কুমারী ভাবের পরাকাষ্ঠারূপে আছেন উমা । আর বোধহয় জগতের সমস্ত নারীকুলের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে রয়েছেন সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারিণী গান্ধারী । কোন্ দেশে রয়েছে এমন সব চরিত্র ? ভারতীয় নারী কেন তার আদর্শকে বাইরে খুঁজতে যাবে ? তাই ভারতীয় নারীর শিক্ষা যেন ভারতীয় নারীকে এই নারীদের আদলে গড়ে তোলে । নিবেদিতা বলছেন : "The Education of an Indian girl should be directed towards making of

her a more truly Indian woman.'' এ সম্বন্ধে তাঁর গুরুর দৃষ্টিভঙ্গিও তিনিই সবচেয়ে সুন্দরভাবে লিখে গেছেন : ''He could not foresee a Hindu woman of the future entirely without the old power of meditation. Modern science women must learn ; but not at the cost of the ancient spirituaity.'' প্রকৃত ভারতীয় নারীরূপে গড়ে তোলাই এদেশে নারীশিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত । আধুনিক শিক্ষা যতই প্রয়োজনীয় হোক, তা যেন প্রাচীন ধ্যানপরায়ণতা ও আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে না হয় । নিবেদিতা প্রশ্ন করেছেন : ''Shall we, after centuries of an Indian womanhood fashioned on the pattern of Sita, of Savitri, of Rani Ahalya Bai, descend to the creation of coquettes and divorcees? Shall the Indian Padmini be succeeded by the Greek Helen?'' এই মারাত্মক পদস্খলন যেন কখনও না ঘটে । জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন্ আদর্শটি, কোন্ জীবন-লক্ষণটি ভারতীয়, আর কোন্‌টি ভারতীয় নয়— এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বোধ আমাদের মধ্যে যেন জাগ্রত থাকে । নিবেদিতা স্বপ্ন দেখেছেন : ভবিষ্যতে ভারতে নারীত্বের মহিমা এমন বিকশিত হবে যে, অতীত ভারতের নারী-মহিমাও তার কাছে ম্লান হয়ে যাবে । কিন্তু এ তখনই সম্ভব হবে, যখন বর্তমান ভারতীয় নারী জাতীয়তার পূজারী হয়ে উঠবে । নিবেদিতা বলছেন : ''Her (India's) sanctuary today is full of shadows. But when the womanhood of India can perform the great arati of nationality, that temple shall be lit, nay, the dawn verily shall be near at hand.''

এই জাতীয়তার জাগরণেই নিবেদিতা আত্মনিয়োগ করেছিলেন । কাকে বলে জাতীয়তা ? নিবেদিতার অনুসরণে বলা যায় : একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সব মানুষ যখন সম দুঃখে দুঃখী হয়, সম সুখে সুখী হয় এবং একভাব, এক আদর্শ, এক লক্ষ্য, এক গর্ব, এক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একযোগে আন্দোলিত হয়, তখন তাকেই বলে জাতীয়তা । নিবেদিতা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, ভারতে পারিবারিক জীবনের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় হলেও, জাতীয়তার আদর্শ সেখানে প্রায় নেই । ভারতীয় পরিবারে পরস্পরের মধ্যে সেবা ও স্বার্থত্যাগের অভাব নেই । এ তাদের সহজাত । ভারতের পারিবারিক কাঠামোর জন্য এই দুটি অমূল্য গুণ তারা অনায়াসে স্বভাবগত করে নেয় । কিন্তু এর প্রয়োগ তারা পরিবারেই সীমাবদ্ধ রাখে । ভারতের মানুষ পরিবারের বাইরে জাতিগতভাবে সেবা ও স্বার্থত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় না । ইংরেজ অন্তত এই একটি দিকে ভারতের থেকে এগিয়ে আছে । নিবেদিতা মনে করেছেন, ভারতের সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং যেহেতু সে পারিবারিক জীবনে পারিবারিক আদর্শের জন্য ব্যক্তি-স্বার্থ ত্যাগ করতে ও ব্যক্তিজীবনের শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে অভ্যস্ত, তার পক্ষে জাতিগত আদর্শের কাছে ব্যক্তি-আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠাও বিন্দুমাত্র কঠিন নয় । জাতীয়তার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হলেই ঐ বোধ তার মধ্যে জেগে উঠবে ।

ভারতের জন্য এই জাতীয়তার জাগরণ কতটা প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছেন : "বর্তমানে প্রকৃত কাজ হচ্ছে সর্বপ্রকার তাৎপর্য ও অর্থবোধের সঙ্গে সর্বত্র জাতীয়তা শব্দটি প্রচার করা । এই জাতীয়তার ভাব যাতে ভারতকে সর্বদা ভরিয়ে রাখে তার বিশেষ প্রয়োজন ।" ভারতের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানকে নিবেদিতা পরস্পরবিরোধী বলে মনে করতেন না । স্বামীজীর মতো নিবেদিতারও গভীর মুসলমান-প্রেম ছিল এবং তিনি মনে করতেন হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সংস্কৃতির মধ্যেই যথেষ্ট মিল আছে । সেই মিল প্রধানত এই ক্ষেত্রে যে, উভয়েরই পারিবারিক জীবনের কাঠামো অত্যন্ত দৃঢ় এবং উভয়েরই পরিবার-জীবনে নারীর মর্যাদা, জ্যেষ্ঠের প্রতি বয়ঃকনিষ্ঠের সম্মান প্রভৃতি সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় । এই অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যগুলির ওপর জোর দিতে হবে ; সেইসঙ্গে ভারত ভূখণ্ডের ভাল-মন্দ সবকিছুর সঙ্গে একাত্মতাবোধ অর্থাৎ জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে হবে ; তাহলেই জাতিগঠনে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠবে । নিবেদিতা বলছেন : "এই জাতীয়তার দ্বারাই হিন্দু ও মুসলমান দেশের প্রতি এক গভীর অনুরাগে একত্র হবে । এই জাতীয়তার অর্থ— ইতিহাস ও প্রচলিত রীতিনীতিকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা । (যে নিবেদিতা স্বয়ং বিপুলভাবে করে আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে রয়েছেন ।) ধর্মের মধ্যে করতে হবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনার সমাবেশ— সর্বধর্মসমন্বয় । বুঝতে হবে যে, রাজনৈতিক প্রশ্ন ও অর্থনৈতিক দুর্বিপাক গৌণমাত্র, ভারতবর্ষ কর্তৃক ভারতের জাতীয়তা উপলব্ধিই প্রকৃত কাজ ।"

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর থেকে নিবেদিতা এই জাতীয়তার জাগরণে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং তা করেন প্রধানত বক্তৃতা ও রচনার দ্বারা । অসাধারণ বাগ্মিতা ও রচনাশক্তির অধিকারিণী ছিলেন নিবেদিতা । স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই তিনি ভারত-সফরে বের হলেন । নিবেদিতা দেখলেন স্বামীজীর দেহত্যাগ— 'তাঁর চিরবিদায় নয়—বিজয়ী প্রত্যাবর্তন ।' গোটা দেশ যেন আবার মেতে উঠলো স্বামীজীকে নিয়ে । ক্ষেত্র এবং সময় উপযুক্ত বুঝে স্বামীজীর দেশপ্রেমের বাণী সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিতে শুরু করলেন তিনি— তাঁর লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে । অতীত ভারতের যে-গৌরব স্বামীজী দেখেছিলেন এবং ভবিষ্যৎ ভারতের যে-মহিমা তাঁর মানসচোখে ধরা পড়েছিল, দুই-ই তিনি দেশের মানুষের কাছে

তুলে ধরেছিলেন । বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধও তিনি এইসময় লিখে ফেলেন । 'বিবেকানন্দের মধ্যে যে গতিশীল সংস্কারমুক্ত জাতীয়তা' তিনি দেখেছিলেন, এইভাবেই তিনি তাকে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন ।

শুধু বক্তৃতাই নয় । বক্তৃতার সূত্রে তিনি যুবকদের সংগঠিতও করতেন । চরিত্রবান সাহসী যুবকদের কাছে ডেকে নিয়ে তিনি কখনও কোমল, কখনও কঠোর ভাষায় তাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বধর্মে অনুরাগ জাগিয়ে তুলতেন । অতীত ভারতের সবকিছুই তাঁর কাছে ছিল ভালবাসার । বর্তমান কালে তা যদি অচলও হয়, অতীত ভারতে তার প্রয়োজনীয়তা ছিল বলেই তা তাঁর কাছে সমাদরের বস্তু । এই সর্বাত্মক স্বদেশপ্রেম তিনি যুবকদের মধ্যে সঞ্চারিত করতেন । আর সেইসঙ্গে তাদের বলতেন শারীরিক ও চারিত্রিক শক্তিতে বলীয়ান হতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বীরত্বব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করতে ।

এছাড়াও নিবেদিতা চেষ্টা করেছিলেন কয়েকটি জাতীয়তাবাদী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে । নতুন ধরনের মঠ তৈরি করার কথাও তিনি ভেবেছিলেন যেখানে জাতীয়তাবাদ শিক্ষা দেওয়া হবে । এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর অনুপ্রেরণায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' ও 'বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এছাড়া তৎকালীন যে-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, সেগুলির মাধ্যমেও তিনি জাতীয়তাবাদ প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন । এর মধ্যে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 'ডন সোসাইটি'র সঙ্গে নিবেদিতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল । এখান থেকেই তিনি 'জাতীয়তা'র উপর একটি সর্বভারতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন এবং বিজয়ীকে স্বামীজীর নামে একটি 'বিবেকানন্দ মেডেল' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন । প্রতিযোগীরা 'জাতীয়তা' সম্পর্কে কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে পারেন, তার একটি তালিকা নিবেদিতা স্বয়ং তৈরি করেছিলেন । সেই তালিকা থেকে ধারণা করা যায়, জাতীয়তার জাগরণ বলতে নিবেদিতা দেশবাসীর কাছে কী চাইতেন । তালিকার বিষয়গুলি হল :

(১) ভারতীয় ধর্মাচার্যদের কার্যাবলী— এদেশের জাতীয় জাগরণে সবসময়ই অল্পবিস্তর সাহায্য করেছে ।

(২) মহান পুরুষদের মধ্যে সবসময়ই সাধারণ মানুষের জন্য গভীর ভালবাসা দেখা যায় ।

(৩) একজন মানুষের উপর তার পরিবারের যতটা দাবি, তার চেয়ে অনেক বেশি দাবি তার দেশের ।

(৪) ভারতের সমস্ত জনসাধারণ মিলে ভারত এক সজীব সত্তা । বুঝবার সুবিধের জন্য নিবেদিতা ৪নং বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, যেমন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন হলেও, একত্র হয়ে তারা একটি সজীব দেহ তৈরি করেছে, তেমনি ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের সমস্ত বিভিন্নতা সত্ত্বেও সামগ্রিক ভারতবর্ষের মধ্যে এইরকম কোনও সম্পর্কে পরস্পর যুক্ত থাকতে পারে ।

(৫) হিন্দু ও মুসলমানের জীবন ও চিন্তার মধ্যে বহু ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়— যে বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের উভয়কেই পাশ্চাত্য জাতির চেয়ে আলাদা করে চিহ্নিত করে দেয় ।

(৬) অশোক এবং আকবর— উভয়ের জীবনকে একযোগে দেখলে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতে গণতন্ত্রের আদর্শ জাতীয়তার জন্য একান্ত প্রয়োজন । এখানেও নিবেদিতা 'গণতন্ত্র' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কথাটির অর্থ এইভাবে বুঝতে হবে যে, জন্মসূত্রে মানুষ যাই হোক না কেন, প্রতিটি মানুষকে তার আত্যন্তিক বিকাশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে ।

জাতীয়-পুরস্কার ছাড়াও জাতীয়তার জাগরণের জন্য নিবেদিতা জাতীয় উৎসব, জাতীয় প্রতীক ও জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেছিলেন । নিবেদিতা দেখেছিলেন, বিবাহ কিংবা ধর্ম-অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতবর্ষে শোভাযাত্রা খুব প্রচলিত । এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের অভ্যাসটিকেই তিনি কোনও একটি জাতীয় উপলক্ষে প্রয়োগ করতে চাইলেন । স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৬ অক্টোবরকে 'সর্বভারতীয় দিবস' ঘোষণা করা হয়েছিল । নিবেদিতা চেয়েছিলেন ঐ দিনটিকে 'জাতীয় উৎসব দিবস'-এ রূপান্তরিত করতে । হিন্দুরা যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে শোভাযাত্রা করে, মুসলমানরা যেমন মহরম উপলক্ষে শোভাযাত্রা করে, নিবেদিতার আশা ছিল, ঐ দিনটিতেও তেমনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত মানুষ উৎসবে ও শোভাযাত্রায় মেতে উঠবে জাতিগঠনের আদর্শকে সামনে রেখে ।

জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীক হিসেবে নিবেদিতা গ্রহণ করেছিলেন বজ্রকে । হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে বজ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দুর্গার হাতে থাকে বজ্র, ইন্দ্রের হাতে বজ্র এবং তেমনি বুদ্ধেরও প্রতীক বজ্র । প্রতিমা নয় বলে মুসলমানদের কাছেও বজ্র গ্রহণযোগ্য । এছাড়া, স্বামীজীও নিজেকে 'বজ্র' বলেছেন । আবার বজ্রের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেবতাদের প্রয়োজনে দধীচির মহান আত্মত্যাগের কথা । বজ্র তাই আত্মত্যাগের প্রতীক । 'স্বার্থশূন্য মানুষই বজ্র,' নিবেদিতা উপলব্ধি করেছেন । ভারতীয় জীবনের সার্থকতাও সর্বস্ব বিসর্জনে, পরিপূর্ণ আত্মত্যাগে । তাই বজ্রকে নিবেদিতা ভারতের জাতীয় প্রতীক ও জাতীয় পতাকা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ।

গুরুর মতো নিবেদিতাও দেশভক্তিকে পূজার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং স্বামীজীর মতো তিনিও সাময়িকভাবে স্বদেশপ্রেমকে তথাকথিত ধর্মচর্চার চেয়ে উঁচুতে স্থাপন করেছিলেন । দেশবাসীদের, বিশেষত যুবকদের তিনি বলতেন : ''You all are required first to know your Motherland—your great Mother! Mother Bharat Barsha! You must

not discriminate, distinguish, or differentiate between them— Mother Country or Mother. I would advise you to see Her, go round Her, to know Her people, their religion, culture, literature, language, customs and traditions, in one word, their history thoroughly. ...Just as a son or a daughter behaves or mixes with his or her mother freely and intimately, so you should love Her, respect Her, serve Her, worship Her with most reverential salutations!''

নিদ্রার অবসানে একটা মানুষ যেমন তার সর্বাঙ্গ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তেমনি জাতীয়তার জাগরণও হবে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গ জুড়েই । ধর্মপ্রাণ দেশ বলে এই জাগরণ নিশ্চয়ই তার প্রাণশক্তি গ্রহণ করবে ধর্মীয় উপলব্ধি ও দেশের ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি থেকে, কিন্তু তার প্রকাশ ঘটবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে, যার মধ্যে থাকবে প্রচলিত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রগুলিও । জাতির গৌরব শুধু ধর্মকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত হবে না ; শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, খেলাধূলা সবক্ষেত্রেই জাতির শক্তি প্রকাশিত হবে এবং সেই শক্তি প্রকাশের গৌরব গোটা জাতিকে একযোগে গর্বিত করবে । নিবেদিতা তাই গুরুদত্ত ত্যাগব্রতকে অন্তরের নিত্যসঙ্গী করেও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নিজের কর্মশক্তিকে নিয়োগ করেছেন । যেমন তিনি জাতীয় ধারায় নব-শিল্প আন্দোলনে ব্রতী হয়েছেন, অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রমুখের প্রেরণাদাত্রী ও প্রচারক হয়েছেন, তেমনি তিনি জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনায় মন-প্রাণ-লেখনী নিয়োগ করেছেন ; আবার ঠিক একই উৎসাহে স্বাধীনতা-আন্দোলনের তীব্র প্রেরণাশক্তি হয়ে বিরাজ করেছেন । আসলে কোন্ কাজ, কোন্ পথ— সে বিচার তাঁর কাছে গৌণ হয়ে গিয়েছিল । সবকিছুর মধ্যে দিয়ে ভারতজননীর সেবাই তাঁর নিত্যব্রত ছিল ।

জাতীয়তার জাগরণের জন্য নিবেদিতা আরও একটি প্রয়োজনের কথা বিশেষভাবে বলেছেন । তা হল : প্রকৃত ইতিহাস চেতনার উন্মেষ । ''History is the warp upon which is to be woven the woof of nationality.'' কিন্তু সেই ইতিহাসচেতনার রূপ কিরকম হবে ? তারও সূত্র দিয়েছেন তিনি । মানুষের দেহ-মনের অন্তরালে যেমন আত্মা থাকেন, যাঁতে মানুষের প্রকৃত পরিচয়, তেমনি ভারতেরও একটি আত্মিক রূপ আছে, যা তার স্বরূপ । বাইরের ঘটনাস্রোতের অন্তরালে ভারতের সেই আত্মিক পরিচয়টি সবসময় অক্ষুণ্ণ থেকেছে । নিবেদিতা ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে ভিতরের ঐ আত্মিক রূপের উপর দেখে বিচার করেছেন । ভারতকে পর্যালোচনা করবার এই দৃষ্টি তাঁর গুরুদেবই তাঁকে দিয়েছিলেন । ঐ একই দৃষ্টি নিয়ে তিনি প্রকৃত ইতিহাসচেতনারও সূত্র নির্দেশ করেছেন । ইতিহাস নিশ্চয়ই তথ্য ও ঘটনার উপর নির্ভর করবে, কিন্তু ঘটনা ও তথ্যের সমাবেশকেই ইতিহাস বলে গ্রহণ করে নেওয়া চলবে না । ভারতবর্ষের আত্মিক রূপটিকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে । ইতিহাসের সর্বপর্যায়ে সেই রূপটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে । সেই শাশ্বত রূপের সঙ্গে মিলিয়ে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে দেখতে হবে এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে । তা যদি হয়, তবে ইতিহাস শুধু আর অতীত কেন্দ্রিক হবে না, ভবিষ্যতের প্রতিও সে পথনির্দেশ করবে। ''History must not end with the past, but must know how to point the finger to the future. It must not be only reminiscient, but also suggestive. It must not only chant the word 'remember' but also bird ways of uttering the whisper 'determine'.''

গুরু বিবেকানন্দের মতো নিবেদিতার দৃষ্টিতেও ভারতবর্ষ নবীন দেশ । যে কর্মক্ষেত্র পাশ্চাত্যের গৌরবক্ষেত্র, সেখানে ভারত হয়তো ততটা কুশল নয়— বাহ্য জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে ভারত ব্যর্থ । কিন্তু অন্য কর্মক্ষেত্রে, আন্তরজগতে ভারত রীতিমত সক্রিয় ও কুশল । তাই বহুকথিত 'Regeneration of India' কথাটিতে নিবেদিতার বিশেষ আপত্তি । তাঁর মতে, 'regeneration' কার না প্রয়োজন ? সব দেশেরই কোনও না কোনও ক্ষেত্রে অভাব আছে এবং সেই সেই ক্ষেত্রে তাদেরও প্রয়োজন 'regeneration'-এর । তবে ঐ শব্দটি বারবার শুধু ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কেন তাকে অপমান করা ? মানুষ হিসেবে একটি ভারতীয়র সঙ্গে একটি ইংরেজের সামর্থ্য ও যোগ্যতার কোনও তফাৎ নেই । তফাৎ শুধু এইখানে : ইংরেজ জাতির প্রত্যেকে জানে তাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য কী, তারা কী চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা একসঙ্গে নিজেদের নিয়োজিত করে । (''They know what they want and they all want it. They all act automatically and instinctively.'')যদি ভারতীয়রা একবার তাদের জাতীয় জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে ইংরেজদের মতো খুঁজে পায়, তবে কেউ তাদের রুখতে পারবে না । (''Let the Indian millions once arrive at a simple, united idea of what they need and mean to have, nothing in the world could resist them.'') ভারতের অভাব তাই শক্তি বা যোগ্যতা নয়, অভাব নিজের সামর্থ্যকে সুসংহত করার । নিবেদিতা তাই 'regeneration'-এর পরিবর্তে 'self-organization' কথাটিকে ভারতের জন্য উপযুক্ত মনে করেছেন ।

জাতীয়তার ব্যাপক উন্মেষ হলেই প্রতিটি ভারতবাসী নিজের দেশকে সঠিকভাবে চিনতে পারবে, সেইসঙ্গে উপলব্ধি করবে এই মহান দেশে জন্মগ্রহণ করার গুরুতম নৈতিক দায়িত্ব । তার জীবনের প্রতিটি কাজে তখন এক গর্ববোধ ও দায়িত্ববোধ কাজ করে তাকে পরিণত করবে উন্নত নাগরিকে । দেশের প্রতিটি মানুষ তখন দেশ নিয়ে গভীরভাবে ভাববে । সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও বিভেদ ভুলে

সকলেই তখন নিজের নিজের ক্ষেত্রে থেকেই দেশের কাজে ব্রতী হতে পারবে । তখনই সুসংহত হয়ে উঠবে ভারতবর্ষের ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা অপরিমেয় শক্তি । আর তখনই জগতের দৃষ্টিতে মহা জাগরণ হবে ভারতের । গড়ে উঠবে মহান এক ভারত— 'মহা ভারত' ।

জাতীয়তার পূজারীর নিত্য আকাঙ্ক্ষা কী হবে, নিবেদিতা তা বলেছেন তাঁর 'Civic Ideal and Indian Nationality' গ্রন্থে । বলছেন :

"আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য । এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত । বেদ ও উপনিষদের মধ্যে যে-শক্তি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল, যে-শক্তির প্রকাশে গড়ে উঠেছিল ধর্ম ও সাম্রাজ্যগুলি, যে-শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে পণ্ডিতদের বিদ্যাচর্চায় এবং মহাপুরুষদের ধ্যানে, আমি বিশ্বাস করি, সেই শক্তিই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে এবং আজকের দিনে তারই নাম জাতীয়তা ।

"আমি বিশ্বাস করি, ভারতের বর্তমান তার অতীতের গভীরে দৃঢ়বদ্ধ এবং তার সামনে জ্বলজ্বল করছে গৌরবময় ভবিষ্যৎ ।

"হে জাতীয়তা ! তুমি আমার কাছে সুখ-দুঃখ, মান-অপমান যে কোনও রূপে ইচ্ছা, এসো ! আমাকে তোমার করে নাও ।"

ভারতের জাতীয়তা সত্যিই বুঝি নিবেদিতাকে নিজের করে নিয়েছিল । তাই সেই জাতীয়তার যে-রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁর গুরুর পরে আর কেউ তা করতে পারেননি । সেই অন্তরঙ্গ রূপ আমাদেরও চোখে এঁকে দেওয়ার জন্য তিনি আত্মনিবেদন করেছেন । ভারতবাসী আমরা ধন্য হয়েছি ভারতবর্ষের সত্যরূপকে চিনে ।

বিদগ্ধ সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার ।

ভগিনী নিবেদিতা : শিল্পীর দৃষ্টিতে

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতাকে আমার কোনদিনই বিদেশিনী বলে মনে হয় না । কোনও কোনও গাছের বীজ ঠিক গাছের গোড়ায় না পড়ে বাতাসের স্রোতে বাহিত হয়ে অনেক দূরের মাটিতে পড়ে প্রাণ পায়, ছন্দ পায়, অর্জন করে বেড়ে ওঠার শক্তি । নিবেদিতার জীবনটিও প্রকৃতির অঙ্গনে বাতাসের খেয়ালে সুদূরে পড়া বীজের মতোই । ভারতের অন্তরাত্মার বীজটি যেন অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়েছিল ভিন্নদেশে, ভিন্নভূমিতে । কবিগুরুর ভাষায় :

> সেই আমাদের দেশের পদ্ম
> তেমনি মধুর হেসে
> ফুটিছে, ভাই, অন্য নামে
> অন্য সুদূর দেশে ॥

যখন তিনি ভারতে এলেন, তাঁর কাজকর্ম, ভাল লাগার গভীর অনুভূতি ও তাঁর ভারতবোধের অন্তরঙ্গ উক্তিগুলি ভারতের সঙ্গে তাঁর বহুযুগের আত্মিক যোগের কথাই মনে জাগায় । মনে হয়, একশ বছরের ব্যবধানেও আমরা ঘরের কন্যাকে চিনে নিতে পারিনি । নিবেদিতা যে আমাদের সমগ্র জাতীয়জীবনে কতটা ছিলেন, তা আজও উন্মেষের অপেক্ষায় আছে । অবশ্য এই দেশেরই সমকালীন বহু বিদগ্ধ মনীষী তাঁকে চিনতে ভুল করেননি । তাঁদের লেখনীতে নিবেদিতা চিহ্নিত হয়েছেন 'লোকমাতা' ও 'মহাশ্বেতা' রূপে ।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে । আফ্রিকার গভীর অরণ্যে আদিবাসী মানুষের জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি জানার জন্য এক বিদগ্ধ গবেষক সেখানে গিয়েছিলেন । দীর্ঘদিন সেই জনজীবনের সঙ্গে মেলামেশার ফলে যখন তাদের সঙ্গে তাঁর সখ্যভাব গড়ে উঠল— তখন তিনি তাঁর সঙ্গের থাকা আয়... একটি মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিলেন । আয়নায় প্রতিফলিত ... মুখের ছবিটি দেখিয়ে চিনতে বললেন । মেয়েটি কিন্তু কো... ভাবেই মুখটি চিনতে পারল না । তখন তারই পাশে দাঁ... বান্ধবীরা তাকে জানালো— ওটি তারই প্রতিকৃতি । আ... প্রতিফলিত বান্ধবীদের মুখচ্ছবি দেখে সে-ও আশ্বস্ত হ... নিজেকে চিনে নিল ।

নিবেদিতা যেন আত্মবিস্মৃত ভারতের সামনে তেমনই এ... আয়না ধরতে চেয়েছিলেন । সমগ্র জাতিকে ফিরে তা... বলেছিলেন তার অসাধারণ ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্ম, সংস্কৃতি ... জীবনযাত্রার দিকে । ভারতবাসীর সম্বিৎ ফেরানোর কা... নিবেদিতা ব্যয় করেছিলেন তাঁর সমগ্র জীবন । সেখানে ক্ল... ছিল না, ছিল না কোনও অবসাদ ও অভিযোগ ।

নিবেদিতা কেবল বলেই থেমে থাকেননি— এ বিষয়ে কার্য... ক্ষেত্ররচনাতেও ব্রতী হয়েছিলেন । সেকালের বিশিষ্ট মনীষী... সঙ্গে আলোচনা করে জাতীয় জাগরণের ইতিকর্তব্যতাও ... করতে সচেষ্ট ছিলেন । তিনি ছিলেন মূলত শিক্ষয়িত্রী ... নারীশিক্ষার দীপটি জ্বালাতেই তাঁর এদেশে আগমন । তাঁর ... শিক্ষা ছিল জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । শিক্ষা শুধু বহি... নয়, তা অন্তর্লোকে প্রবেশের অন্যতম সঙ্গী । তাই সর্বক্ষে... শিক্ষার ওপর দৃষ্টি দেওয়ার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন তিনি ...

নিবেদিতার সাধনা ও তাঁর শিল্পবোধের প্রেরণা ছিলেন স্বা... বিবেকানন্দ । প্রকৃত শিল্প ও শিল্পীর অন্তরের রহস্যের উ... করে নিবেদিতার হৃদয়ে তিনিই আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন । ... আলোর পথেই নিবেদিতার নিঃসংশয় বিচরণ ।

নিবেদিতার দৃষ্টি ছিল গভীর অথচ স্বচ্ছ । তাঁর পর্যবেক্ষণে ...

পড়েছিল সেই আশ্চর্য সাদৃশ্য— স্বামী বিবেকানন্দের ললাটে ও আননে যেন 'রাফায়েলের আঁকা শিশু খ্রীস্টের কোমলতা ও মহিমা'। ঠিক তেমনি করেই জাতশিল্পী নিবেদিতার চোখে ভেসে উঠেছিল ভারতের মর্মবাণী। ভারতের জাতীয়জীবনের অবয়বে তিনি দেখেছিলেন অমেয়, অক্ষয় শক্তি, সংস্কৃতি আর আত্মার উদ্বোধন। তাঁর প্রসারিত ধর্মবোধ তাঁকে কোনও দিন সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে সীমিত করেনি। ধর্ম তাঁকে দিয়েছিল সত্যকে, মহানকে চেনার অমেয় শক্তি। ভারতের প্রাচীন ও অর্বাচীন শিল্প-প্রয়াসগুলির তিনি যথাযথই মূল্যায়ন করে লেখেন : "চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে পুরোনো কালের মানুষরা অনেক বেশি গভীর ও নিবিড়। তার ফলে তাঁরা সৃষ্টিতে এমন-সব পরিকল্পনা এনেছেন যাদের চারিদিকে চিরন্তনতার পরিমণ্ডল। তাঁদের স্টাইলে আছে বৃহতের গরিমা আর আধুনিকদের কাজ হালকা ধাঁচের অধিক ব্যক্তিগত প্রকৃতির, চকিতে অন্তর্হিত হয় এমন অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলিকে ধরে রাখতে সচেষ্ট। তদনুযায়ী এইসব ছবি যেমন সূক্ষ্ম, সুকুমার অনুভূতি জাগায়, তেমনি তা মন থেকে দ্রুত অপসৃত হয়েও যায়। এরা যখন ব্যর্থ তখন তার মূলে থাকে তুচ্ছতা ও অতিনাটকীয়তা। অপরদিকে পুরাতন শিল্পীরা সর্বদাই ঐকান্তিক, কদাপি আত্মসচেতন নন, হয়তো নানাদিক দিয়ে আড়ষ্ট, স্থূল বা আতিশয্যপূর্ণ কিন্তু তাঁরা 'ভালগার' এই অপবাদ দেওয়া যাবে না।"

এইভাবে শিল্পীর জীবন ও কৃষ্টির বিশ্লেষণ নিবেদিতার সুগভীর শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। অহমিকাবোধ শিল্পীর সামনে একটি বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে তাকে গভীরে পৌঁছতে দেয় না। আসলে শিল্পসাধনা অন্তর্লোকে উপস্থিত হবার একটি পথ। সেই পথের যাঁরা যাত্রী তাঁদের গুণাবলীর কথা খুব সহজভাবে নিবেদিতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর রুচিবোধ, বোধের লাবণ্য, শুদ্ধতা ও চেতনা সহজেই শিল্পের জগতে রুচির ন্যূনতাকে চিনে নিয়েছিল। সমস্ত করণকৌশল ব্যবহার করলেও বিদেশের নবীন শিল্পীদের বহু ছবি তাঁর সমালোচনায় 'ভালগার' আখ্যা পেয়েছে। অবশ্য নিবেদিতার এই মন্তব্যগুলি ছিল 'প্রবাসী' প্রকাশিত বিদেশী চিত্রকলার আলোচনায়। আধুনিক গতিপথ সম্পর্কে তাঁর নিরীক্ষণও অনুধাবনযোগ্য। ভারতীয় চিত্রকলার অনবদ্যতার কথা বলেই তিনি থেমে যাননি— যেখানে তা শিল্পের মূল প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হয়েছে সেখানেও তিনি সুস্পষ্টভাবে সেটি প্রকাশ করেছেন। শিল্পের নব্য ভারতীয় উষাঙ্গনে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অধীর হলেও দৃঢ়তার সঙ্গে ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। নিবেদিতার দীর্ঘ শিল্পচর্চা ও অন্তরের অনুভূতিই তাঁর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল।

আমাদের দেশে সুকুমার শিল্প ও কারুশিল্পের বিশেষ পার্থক্য ঠিক কবে থেকে প্রকট হয়েছে তা জানা নেই। সম্ভবত পাশ্চাত্যের শিক্ষাপ্রবাহ, তাদের শিল্পসম্বন্ধীয় বিন্যাস ও স্তর এমন ভাবনার আর পার্থক্যের জন্ম দিয়ে থাকবে। কারুশিল্পও যে সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যেই পড়ে একথা আমরা ভুলতে বসেছি। সুকুমার শিল্পের প্রেরণা যে প্রকৃতি— সেই প্রকৃতিই কারুশিল্পীদের প্রেরণা দিয়েছে। কারুশিল্পের অনবদ্য নকশা, আলঙ্কারিক সূক্ষ্ম আকার স্থান পেয়েছে কোনও বিষয় বা বস্তুকে ঘিরে। সে সৌন্দর্যের তুলনা মেলা ভার।

ভগিনী নিবেদিতা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে, 'কারুশিল্পের অঙ্গনেই ভারতবর্ষের জাতীয় ঐশ্বর্যটি ধরা আছে।' তিনি তাঁর ছোট্ট স্কুলে নবীন পড়ুয়াদের ঐ শিল্পের পাঠ দেওয়া শুরু করেছিলেন। শিক্ষয়িত্রী নিবেদিতা জানতেন, শিশুদের অন্তরেই নিহিত আছে জাতির ও দেশের ঐতিহ্যময় শিল্পকুশলতার অমোঘ বীজ। সঠিক ভূমি, পরিবেশ ও পরিকল্পনার দ্বারাই সেই বীজগুলি মহাবৃক্ষের আকার নেবে। শুধু শিশুদের ক্ষেত্রেই নয়, কারুশিল্পের অঙ্গনে জাতিকেও উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে কাশ্মীরী তাঁতের অভিনব বর্ণনা শুনি। প্রতিটি শালের মধ্যে তিনি দেখেছেন রঙের ঐকতান। কারিগরের তাঁতবোনা যেন গীর্জা-সঙ্গীতের একটানা সুর। বর্ণ ও শব্দের এক অপূর্ব সমাহার দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। ভারতীয় শিল্পের এই মৌলিকত্ব নিবেদিতার মনে গভীর ছাপ রেখেছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে নিবেদিতা বারবার শিল্পীদের মনে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছেন। চিত্রকল্প ও অসাধারণ কারুশিল্পের অনুশীলনে দেশবাসী নিজের দেশকে নতুন করে চিনে নেবে— এ-ই ছিল নিবেদিতার স্বপ্ন। নিবেদিতার গুণগ্রাহিতা জাতির সামনে তুলে ধরেছে এক দর্পণ— যেখানে প্রতিফলিত তার প্রকৃত স্বরূপ তাকে আত্মস্থ ও সচেতন করবে।

আমরা আত্মবিস্মৃতই ছিলাম, নইলে পশ্চিমী শিল্পসম্ভার সামনে রেখে নিজের দেশের শিল্পকে খাটো করে কেন দেখেছি! নিবেদিতা আমাদের শিল্পের মধ্যে পরম সত্যকে অনুভব করেছিলেন। ভারতের শিল্পভাবনায়, চেতনায় পরমের পূজার অবকাশ আছে। শিল্পী নিজেকে সমস্ত বন্ধন থেকে স্বাধীন করার বার্তা পান। আমাদের শিল্প নিজেকে মেলে ধরার আহ্বান। শিল্পী ভারতের সেই সনাতন আহ্বানকেই মূর্ত করেন। সেই 'চরৈবেতি' মন্ত্রকেই নিবেদিতা তাঁর সমস্ত কর্মযজ্ঞে রূপ দিয়েছিলেন। ঐ এগিয়ে যাবার মন্ত্রই দিয়েছিলেন পরাধীন ভারতের শিল্পীদের।

নিবেদিতা কেবল চারুশিল্প ও কারুশিল্পের মননে ব্যস্ত ছিলেন— এ কথা ভাবলে ভুল হবে। তিনি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই শিল্পের প্রয়োগের কথা ভেবেছেন— চিত্রে, ভাস্কর্যে এমনকি নিত্যজীবনের সমস্ত পর্যায়ে তাঁর শিল্পবোধ প্রসারিত হয়েছিল। ভাবতে ভালো লাগে, তিনি সমাজের নানা উৎসব অনুষ্ঠানে, পথ পরিক্রমা বা শোভাযাত্রার সাজসজ্জায় রুচিবোধকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। মেলায়, শোভাযাত্রায় মিলিত হবার ভূমিকে তিনি সাজিয়ে তোলার কথা বলেছেন।

শহুরে শিল্প ও গ্রামীণ শিল্প— দুটিই তাঁর অন্তরে সম মর্যাদায়

স্থান পেয়েছিল। গ্রামের মানুষের সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে আবহমান কাল ধরে যে শিল্পভাবনা রূপ পেয়ে এসেছে তাকে আরও ব্যাপক করার পরিকল্পনা তিনি করেছেন। অন্য দিকে গ্রামের শিল্পবোধকে তিনি শহরের মানুষের কাছেও সমাদরের বস্তু করে তুলতে চেয়েছেন। চেয়েছেন দুই মানসিকতার মানুষ শিল্পকে মাধ্যম করে একটি মিলনের সেতু রচনা করুক।

নিবেদিতার এই শিল্পভাবনার অন্তরালে ছিল জাতীয় চেতনাকে 'লোকগ্রাহ্য' করে তোলার প্রয়াস। লোকগ্রাহ্যতার মূল কথা হল আমরা যা কিছু করি, যা কিছু ভাবি না কেন, তা নিজের একান্ত হয়েও সবার জন্য হবে। আমাদের সকল কর্মের মধ্যেই থাকা চাই 'লোকগ্রাহ্যতা'র অঙ্গীকার। এই পথেই তিনি জাতীয়চেতনা জাগরণের ক্ষেত্রে শিল্পকে মস্ত সহায় বলে মনে করেছেন। বলেছেন: "আমার কখনো কখনো মনে হয় ভারতের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কাজ শিল্পের মাধ্যমেই করা

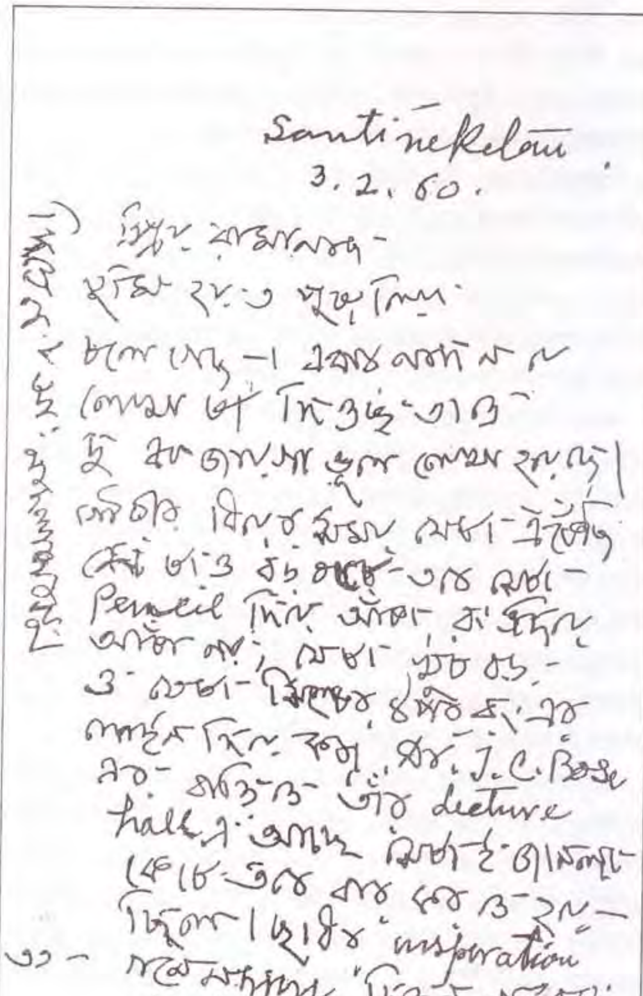

Santineketan
3.2.60.

লেখকের সংগ্রহে নন্দলালের পত্র

যেতে পারে— পত্রপত্রিকা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে নয়— তবে সে শিল্প হবে নাগরিকচেতনা, জাতীয়চেতনা, ইতিহাসচেতনার বাহক।" শিল্পকে এমন সার্বিক প্রয়োগের কথা নিবেদিতার মতো কেউ ভাবেননি। তিনি সকলকে বোঝাতে চেয়েছেন শিল্পকে বাদ দিয়ে কোনও চেতনার মুক্তি বা আনন্দে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি ধীমান শিল্পীদের ক্রিয়াকাণ্ড ও নিরলস চর্চার ভিতর দিয়ে আমরা শিল্পের যে নবযুগকে পেয়েছি তার নেপথ্যে ছিল ভগিনী নিবেদিতার সাধনা ও প্রেরণা। তিনি নবীন শিল্পীদের কাছে প্রায়ই যেতেন এবং ভারতশিল্পের উজ্জীবন ও অন্বেষণে তাঁদের সঙ্গী হতেন।

আমার তো প্রত্যক্ষভাবে নিবেদিতাকে জানার কোনও সুযোগ বা সৌভাগ্য হয়নি, তবে গুরু নন্দলালের কাছে শিল্পশিক্ষার সূত্রে শুনেছি— সিস্টার কেবল শিল্প-আলোচনা করেই শেষ করতেন না— শিল্পকর্মে নিজে যুক্ত হতেন। নন্দলালের কাছে 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে'র নির্মাণ কাজে কেমন ভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন সে কথাও জানতে পারি। নিবেদিতা চারু ও কারুশিল্পের সমন্বয়ের একটি রূপরেখা দিতে চেয়েছিলেন তাঁর স্কুলকে কেন্দ্র করে। শিল্প সম্ভারে বিদ্যালয় সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। শিশু পড়ুয়াদের প্রত্যক্ষ ও অবচেতন মন হবে শিল্পমনস্ক এবং তাদের চালচলনে পড়বে একটি শোভন রুচির ছাপ। নিবেদিতা তখন সামান্যভাবেই তাঁর কাজ আরম্ভ করেন কিন্তু খুলে দেন ভবিষ্যতের অসামান্য পথ।

প্রসঙ্গত আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। তখন 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় নিয়মিত নন্দলালের সঙ্গে আমার শিল্প ও শিল্পজীবন আলোচনার ইতিবৃত্ত ছাপা হচ্ছে। একটি সমস্যার ব্যাপারে নানান কথার ভিতর তিনি আমায় লিখেছিলেন:

Santineketan
3.2.60

প্রিয় রামানন্দ

তুমি হয়ত পুরুলিয়া চলে গেছ। এবার নন্দন যে লেখাটা দিওছ তাও দু এক জায়গা ভুল লেখা হয়েছে। গৌরীর বিয়ের সময় যেটা এঁকেছি সেটাও বড় বটে তবে সেটা Pencil দিয়ে আঁকা রং দিয়ে আঁকা নয়, যেটা খুব বড় ও যেটা সিল্কের উপর রং এর লাইন দিয়ে করা Dr. J.C.Bose এর বাড়িতে তাঁর Lecture hall এ আছে সেটাই জানলা কেটে তবে বার করতে হয়েছিল। ছবির inspiration তত গণেন মহারাজ দিতেন না বরং সেটা Sister ও মহিমবাবু দিতেন।

আঃ নন্দলাল বসু

এই উৎসাহ নন্দলালের সারা জীবন ঘিরে ছিল । নিবেদিতার জীবন, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পবিত্রভাব তাঁকে বিশেষ বিশেষ চিত্ররচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল । অনেক সময় আমি কলকাতায় এলে নন্দলাল আমাকে স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে পাঠাতেন । পাঠাতেন তাঁর সভক্তি প্রণাম । মহেন্দ্রনাথ দত্তের কথাপ্রসঙ্গে সিস্টারের প্রসঙ্গ আসত নানাভাবে । অজন্তা চিত্রশৈলীর প্রতিলিপি, বাগগুহায় যাওয়া ও শিল্প নিদর্শনগুলি ঘুরে ঘুরে দেখার কথা উঠত । তাঁদের নিবেদিতা বলতেন : "এইসব ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পকলাসৃষ্টির সামনে দাঁড়ালে নিজেরও উদ্বোধন ঘটে । নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করা যায় এবং ভারতবাসী হিসেবে নিজেদের ঐতিহ্যশক্তি ও অসাধারণত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয় । সেই পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হবার একটি পথ পাওয়া যায় । ভারতভূমিতে যে-সমস্ত অসামান্য শিল্পকলার সৃষ্টি হয়েছে তার কুশীলবরা সবাই এই নিত্যচলা মানুষের মধ্যেই বর্তমান । ঐ অজন্তার দেওয়ালে চিত্রিত নারী বা পুরুষমূর্তির মুখাবয়ব ও শরীরের অবস্থানের চমৎকারিত্ব— সবই সংগৃহীত হয়েছে প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের চলাফেরা থেকেই ।" তাই নিবেদিতা নন্দলাল প্রমুখ তরুণ শিল্পীদের যখন মেঝেতে পদ্মাসনে বসতে বলতেন, তখন তাদের অঙ্গসংস্থান দেখে মুগ্ধ চিত্তে স্মরণ করতেন ভগবান বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি ।

তাঁর শিল্পের প্রতি ভালবাসা ও নির্মল ইচ্ছার কথায় একটি ঘটনার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না । একবার একটি উজ্জ্বল ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলুম— আচ্ছা, তোমাকে দেশের রাজা করে দিলে, তুমি প্রথমে কী করতে চাও ? সে উত্তরে বলল : "আমি রাজা হলে সব ছেলেমেয়ের হাতে 'চাঁদের পাহাড়' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) আর রাজকাহিনী (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর) বিনা পয়সায় দেওয়ার ব্যবস্থা করব ।" এই বই-দুটির বাছাই ও পছন্দের মধ্যে শিশুটির ভেসে চলার, অজানাকে জানবার এক অদ্ভুত আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে । তার থেকে বড় কথা তার এই ভালবাসা ও ভাল লাগার অনুভবটি সে হাজার শিশুর মধ্যে তুলে দিতে চায়— এ তার মস্ত মনের পরিচয় ।

নিবেদিতার স্বপ্নও ছিল তেমনই উদার । তিনি লিখেছেন : "জনসাধারণ যদি আমার স্মৃতিরক্ষার জন্য কোনও অর্থদান করে, তা যেন মিউজিয়াম এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহে রক্ষিত বৌদ্ধভাস্কর্যের প্রতিরূপ কাজের পুরস্কাররূপে ব্যয়িত হয় ।" আর তাঁর প্রিয় স্বপ্ন কী, সে প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন : "জাতীয়শিল্পের পুনর্জাগরণ আমার সর্বপ্রিয় স্বপ্ন ।" লিখছেন : "ভারতবর্ষের পক্ষে আমরা এমন শিল্পীকে চাই যিনি অর্ধাংশে কবি, বাকি অর্ধাংশে রূপসাকার, যিনি আমাদের মধ্যে বিশাল আকারে নবভাবনাসমূহের জাগরণ ঘটাবেন ।" "একটি শালের নির্মাণে, একটি পটের অঙ্গবিন্যাসে রয়েছে যে মাধুর্য ও আস্বাদনের সুসংহত মর্যাদা— সে সকলই কি সম্পদরূপে রক্ষণীয় নয়... ।" নতুন যুগের শিল্পের পথের নিশানা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন : "ভারতের প্রয়োজন হল, জাতীয় ধারার সঙ্গে ইউরোপীয় আঙ্গিক জ্ঞানের সংযোজন ।" "মহান শৈলীর বৈশিষ্ট্য হল— তা আত্মাবমাননা না ঘটিয়ে নতুন জ্ঞানকে আত্মসাৎ করতে পারে ।"

নিবেদিতার এই পথনির্দেশপ্রসঙ্গে মনে পড়ছে একদিনের ঘটনা । নন্দলালের কাছে কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র তাঁর কতগুলি ছবি দেখালেন । জাপানের শিল্প অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে ছাত্রটি সদ্য দেশে ফিরেছেন । নন্দলাল মনোযোগ সহকারে তাঁর কাজ দেখে বললেন— জানো তো, বিনোদ (শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়) জাপানে গিয়ে জাপানী হয়ে যায়নি । সে জাপানের করণকৌশলের দিকগুলি আয়ত্ত করেছে আর সেই করণকৌশল তার হাত দিয়ে যখন প্রকাশ পেল— তখন সে একেবারে ভারতবাসীর কথাই বলেছে । আসলে কি জানো তো— নিজের মধ্যে ঐ করণকৌশল আত্মসাৎ করতে হয় । তবেই তা আরও গুণাবলীতে পূর্ণ হয় ।"

নিবেদিতার সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁকে যেমন বড় করা যাবে না, তেমনি কিছু না বললেও তাঁর আসন থেকে তিনি চ্যুত হবেন না । তিনি ভারতে শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি নানা কর্মযজ্ঞে সেনানী তৈরি করতে চেয়েছিলেন— তার মধ্যে সামিল হওয়ার যোগ্যতায় যেন উত্তীর্ণ হতে পারি— এ আমার বাসনা নয়, প্রার্থনা ।

নিবেদিতা যে-দর্শন আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তার মধ্যে আমাদের আত্মদর্শন সার্থক করতে পারিনি, গুরুত্ব দিইনি । সেই কারণেই শিল্প-শিক্ষাক্রমের চর্চার মধ্যে থেকেও আমাদের শিল্প-অনুভব ও শিল্পচেতনা পূর্ণতা পায়নি । কতটা অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছি তা আমরা নিজেরাই জানি না । ভুবনবিখ্যাত নৃত্যরত 'নটরাজ' সম্পর্কে তো কত আলোচনা হয়েছে কিন্তু সেই মূর্তি সম্বন্ধে গভীর অনুভূতির কথা যখন নিবেদিতার মুখে শুনি তখন আমাদের কাছে শিল্পভাবনার নতুন দিগন্ত খুলে যায় । তিনি লিখেছেন : "নটরাজ-নৃত্য— সে হল গতিময় সমাধি ।"

ভগিনী নিবেদিতা, শিল্পী নিবেদিতা তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞে নিজেকেই আহুতি দিয়েছেন । কবির ভাষায় :

নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ডপল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল ।
যেন তার মাঝখানে পূর্ণ বিকশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া ।
নিত্যকাল মহাপ্রেমে রচি বিশ্বভূষা,
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ ।

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও শিল্পবেত্তা ।

অজন্তাতীর্থে

গৌতম হালদার

উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিক্ষেত্রে জাতীয়তার জোয়ার এসেছিল। সেসময় দেশবরেণ্য নেতা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সাধারণ মানুষমাত্রেই ভগিনী নিবেদিতার 'লোকমাতা' রূপটির পরিচয়লাভে ধন্য হয়েছিলেন। জন্মসূত্রে নিবেদিতা ভারতীয় ছিলেন না, কিন্তু ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণই তাঁর ঈপ্সিত ছিল।

ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে— সেইসঙ্গে চাই শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রভৃতি প্রত্যেক স্তরেই জাতীয়ভাবে গঠনমূলক উদ্যোগ। নিবেদিতা তাই ভারত-মনীষার উদার অভ্যুদয়কে তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুসারী করতে চেয়েছিলেন; তিনি জানতেন, জাতীয়-ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও সংস্কার-আন্দোলন এদেশে স্থায়ী প্রভাব রাখতে পারবে না!

নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পকৃতি তার দেশীয় ভাবধারাকেই অনুসরণ করুক। বাগবাজারের ছোট্ট স্কুলবাড়িতে তিনি থাকতেন, কিন্তু সেকালের শিক্ষা-সংস্কৃতি-জগতের কোনও স্বনামধন্য পুরুষ-ই সেই বিদেশিনী 'ভারত উপাসিকা'র প্রেরণাদাত্রী ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁরা প্রত্যেকেই বুঝেছিলেন, নিবেদিতা সর্বান্তঃকরণে এদেশের মঙ্গল চান, তাঁর প্রত্যেক চিন্তা ও উদ্যোগের পিছনে একটি মহৎ হৃদয়ের শুভ কল্পনা ক্রিয়াশীল। বাংলার সংস্কৃতিজগতে সর্বজনবিদিত ঠাকুরবাড়ির ছেলেরাও তাঁর প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি উৎসাহিত করতেন তরুণ শিল্পী ও ছাত্রেরা যাতে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে রঙ-তুলির কাজে অগ্রসর হয়। এই প্রসঙ্গে একটি অসাধারণ দৃষ্টান্তের উপস্থাপনা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভগিনী নিবেদিতা ১৯০৯-১০-এর সময়ে তেত্রিশ মাইল জলগাঁও থেকে ফরদাপুর এবং সেখান থেকে 'দাক্ষিণাত্য খান্দেশের ঠিক সীমান্তে অবস্থিত' 'ইন্দ্রিয়াদ্রির গাত্রে খোদা' পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য শিল্পতীর্থ অজন্তা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। শিল্পতীর্থদর্শনের উদ্দেশ্য এবং সহযাত্রীরা— এক অ-সাধারণ।

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের খণ্ডে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য দিয়েছেন অজন্তা নকলকাজের প্রসঙ্গে। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে অজন্তার শিল্পকৃতির আবিষ্কার হয়। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে সপ্তম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাচীন ভারতের এই গুহাচিত্র এবং স্থাপত্যের পুনরুদ্ধারের জন্য বিদেশী মানুষেরাই প্রথম উদ্যোগী হন। গুহাগাত্রের আলেখ্যগুলির কপি করেন মেজর রবার্ট গিল; দ্বিতীয় কপির কাজ হয় 'বম্বে স্কুল'-এর অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্স সাহেবের তত্ত্বাবধানে। দুইবারের অনেকগুলি কপি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয় কপির কাজ স্যার উইলমট পার্কার হেরিংহামের স্ত্রী মিসেস হেরিংহাম। হেরিংহাম স্বয়ং শিল্পী, নকলের কাজে তাঁর দক্ষতা সেইসঙ্গে যে কোনও কাজ হাতে নিলে তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে করার মতো তাঁর একাগ্রতা। আপন ব্যয়ে তিনি এই তৃতীয় নকলকাজ হাতে নিলেন— সহকারী হিসেবে তিনি কয়েকজন শিল্পীকে পেয়েছিলেন, কিন্তু নিবেদিতার ইচ্ছা নন্দলাল বসু, অসিত হালদারের মতো বাঙলার তরুণ শিল্পীরা

সমবেত কাজে অংশ নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন ।

অজন্তা গুহাচিত্র নকলকাজের বিষয় সরেজমিনে দেখতে মিসেস হেরিংহাম ভারতে প্রথম আসেন ১৯০৬-এ । দ্বিতীয়বার এসে ১৯০৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯১০-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রথমপর্বের নকলকাজ করেন । দ্বিতীয়পর্বের নকলকাজ হয় ১৯১০-এর শেষ থেকে ১৯১১-র মধ্যে । দুইবারই অসিত হালদার তাঁর দলে যোগ দেন, নন্দলাল গিয়েছিলেন প্রথমবার ।

নিবেদিতা স্বয়ং ছিলেন শিল্পী ও শিল্পবেত্তা । তাই ছেলেদের পাঠিয়ে স্বয়ং এসেছিলেন অজন্তায়, ভারতীয় শিল্পের অসামান্য নিদর্শন দেখতে । গুহাশ্রেণী থেকে কয়েকশ ফুট নীচে ওয়াঘরা নদীর ঝক্‌ঝকে স্রোতধারার নূপুরনিক্কনের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা তাঁর অজন্তাদর্শনের প্রথম অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন 'দি এনসেন্ট অ্যাবী অব অজন্তা' নিবন্ধে । ছাব্বিশটি গুহাকন্দরের (বর্তমান তিরিশটি) রূপবৈচিত্র্যের সহজ-সুন্দর বিবরণ সেখানে আছে । নিবেদিতা সুদূর অতীতের ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও দেওয়ালচিত্রগুলি দর্শন করে শুধু বিস্ময়ে বিমূঢ় হননি, সেইসঙ্গে অতীতের সাধক- শ্রমণদের একান্ত মনঃসংযোগ ও ভাবগাম্ভীর্য তাঁকে শ্রদ্ধাপ্লুত করেছে । বান্ধবী মিসেস উইলসনকে ৬ জানুয়ারি ১৯১০-এ লিখেছিলেন অজন্তার প্রশস্ত পথে 'ক্রীসমাস ইভ'-এর পবিত্র রাতে আনন্দময় মুহূর্তগুলির কথা । ভোরবেলায় লেডী হেরিংহামের সাদা তাঁবুতে গিয়ে তাঁকে 'মেরী ক্রীসমাস' জানিয়েছিলেন তাঁরা । "তারপর তিনটি মহানন্দের দিন— শিল্পের ইতিহাসের— গ্রন্থের এবং গুহার !"

শুধু অজন্তার অমূল্য শিল্পসম্পদ দর্শনে নিবেদিতা মুগ্ধ হননি, মুগ্ধ হয়েছিলেন লেডী হেরিংহামের কঠোর শ্রম ও একাগ্রতাদর্শনে । র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ৩ মার্চ কলকাতা থেকে নিবেদিতা লিখেছেন :

"মিসেস হেরিংহামের বয়স ৫৭— তিনি মইয়ে চড়ে দিনের পর দিন যে কোনো সাধারণ শ্রমিকের মতো কঠোর পরিশ্রমের কাজ করে যাচ্ছেন— এই দৃশ্য ছেলেগুলির কাছে এক নতুন আদর্শের, আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস ।"

এশীয় শিল্পের অন্তঃপ্রকৃতি বুঝতে তিনটি মানসবৃত্তির প্রয়োজন— সংবেদনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তি । ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে এই তিনটি বৃত্তিরই স্ফুরণ হয়েছিল । তরুণশিল্পী অসিতকুমার নিবেদিতার 'শিল্পী-জননী' রূপটিকে খুবই কাছ থেকে দেখেছিলেন । অসিতকুমার স্মৃতিচারণে লিখেছেন : "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁর মতো মাতৃস্থানীয়া দেবীকে দর্শন করেছি এবং তাঁর স্নেহশীতল বাণী ক্রমাগত লাভ করেছি ।" শিল্পীর কমলচিত্তে নিবেদিতার প্রভাব কত গভীর ছিল তা তাঁর এক মন্তব্যেই পরিস্ফুট । লিখেছেন : "তাঁর কাজেই আন্তরিকতা ছিল এবং তিনি সকলের কাজেও আন্তরিকতা দেখতে চাইতেন । ফলে তাঁর চোখে ফাঁকি সহজেই ধরা পড়ত ।"

নন্দলালও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না নিবেদিতার প্রসঙ্গে তাঁর কথার তুলিতে সুন্দর একটি ছবি তুলে ধরেছেন : "আমরা অজন্তায় পৌঁছবার পর সিস্টার, ডক্টর বোস, লেডি বোস ও গণেন মহারাজ সকলে একদিন গিয়ে উপস্থিত হলেন । আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সিস্টার টাঙ্গা থেকে নামবার সময় 'দুর্গা দুর্গা' বলে নামছেন । তাঁর পরনে সাদা সিল্কের আলখাল্লা, চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, মুখ দীপ্ত ও আনন্দে উদ্ভাসিত । অবনবাবু উঁহাকে দেখে আমাদের বলেছিলেন, যেন তপস্বিনী উমাকে দেখলাম ।"

প্রাচীন ভারতের অসামান্য শিল্পকৃতি দর্শনে তরুণ শিল্পীদের খুবই উপকার হয়েছিল । গুপ্তযুগের শিল্পনৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করে অসিত হালদার লিখেছেন : "এক একটা নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যালোক যখন গুহাগুলি আলোকিত করত, তখন গুহার দেয়ালের ছবিগুলি আলোতে যেন প্রাণ পেয়ে সজীব" হয়ে উঠত । নন্দলাল দেখেছেন সেখানে মণ্ডনশিল্পের অপূর্ব চেহারা । গুহার সিলিং-এ "যেন কিংখাবের একটা দামি চাঁদোয়া টাঙ্গানো ।" সেই চাঁদোয়ায় শ্বেতপদ্ম, হাঁস, ময়ূর, হাতির দল, লতাপাতা গাছপালার নিখুঁত সব নক্সা চোখ জোড়ানো । আলোছায়া, 'anatomy-র টন্‌টনে জ্ঞান'— এ সবই তাঁদের তৃতীয় নয়ন খুলে দেয় ।

লেডী হেরিংহাম নকলকাজে নেমেছিলেন ডিসেম্বর ১৯০৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯১১-র মধ্যে । ঐসময় বাঙালি সন্ত্রাসবাদীদের নিদারুণ সংশয়ের চোখে দেখা হত । তাই ইংরেজ সরকার এই শিল্পিগোষ্ঠীকে, বিশেষত বাঙালি শিল্পীদের খুবই কড়া বিধিনিষেধের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন । অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এইপ্রসঙ্গে নিবেদিতার ভূমিকাটিকে বড় সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন : "শিল্পের দুর্গম পথে বিজয়ী অভিযাত্রী মিসেস হেরিংহাম রাজনীতির গহন জটিল পথে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক, একথা বুঝে নিবেদিতা রীতিমতো অস্বস্তিতে ছিলেন ।... জাতীয় জাগরণের সঙ্গে শিল্পজাগরণের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের বিষয়ে সুনিশ্চিত বোধের জন্য তিনি সযত্নে শিল্পীদের আড়াল করে রাখতে চেয়েছেন রাজনীতির আবর্ত থেকে ।" এ বিষয়ে অসিতকুমার হালদারের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উক্তি স্মরণীয় । তিনি লিখেছেন : "আমাদের উপদেশচ্ছলে (নিবেদিতা) বারবার সাবধান করতেন— আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দিই । তখন চলছিল... প্রবল স্বদেশী আন্দোলন— দেশের তরুণের দল ক্ষিপ্ত, বিদ্রোহিত ।... আমাদের হাতে দেশের অবিলুপ্ত আর্টের নবজাগরণ নির্ভর করছে— সেটাও দেশের জাগৃতির ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড়ো কাজ— সেই কথাই ভগ্নী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন ।"

লেডী হেরিংহাম লুপ্তপ্রায় ছবিগুলির যতদূর সম্ভব নির্ভুল প্রতিলিপির জন্য প্রায় ষাট বছর বয়সে এদেশে এসেছিলেন । নিজব্যয়ে এই প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধারও করেছিলেন । বাদুড়, পেঁচার দুর্গন্ধপূর্ণ গুহার ভিতর গভীর অভিনিবেশে দিনের পর দিন

তিনি কাজ করতেন । মে ১৯১১-য় বৃদ্ধা হেরিংহাম প্রায় একক প্রচেষ্টায় ইন্ডিয়া হাউসে অজন্তা প্রতিলিপির প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ।

এই প্রচণ্ড পরিশ্রমে লেডী হেরিংহামের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় । তাঁর অসুস্থতার সংবাদ ভগিনী নিবেদিতাকে উদ্বিগ্ন করে— ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা গুহাচিত্র নিবেদিতার মতো হেরিংহামকেও মুগ্ধ করেছিল । তাই নিজের বয়সের চাহিদাকে উপেক্ষা করে অস্বাস্থ্যকর বদ্ধ গুহাকন্দরে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে রঙে রেখায় ধরে রাখতে চেয়েছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতিকে । ১৯১৫-তে ইন্ডিয়া সোসাইটির বদান্যতায় 'Ajanta Frescoes' বইটি পোর্টফোলিও সংস্করণে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল— কিন্তু ভারতীয় শিল্পের প্রতি চিরশ্রদ্ধাশীল এই দুই বিদেশিনীর কেউই সেদিন জীবিত ছিলেন না । অজন্তার গুহা-অভিযানের সাক্ষিস্বরূপ ছিলেন নিবেদিতার হাতে গড়া নন্দলাল, অসিতকুমারের মতো স্বনামধন্য তরুণ শিল্পীরা । শিল্পের নবজাগরণক্ষেত্রে তাঁরা কোনদিনই ভুলতে পারেননি নিবেদিতার অমোঘ প্রেরণাকে ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে এবং ভারতীয় শিল্পে আগ্রহী লেখক ।

সন্ধে হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিতা এলেন । সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপালিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা । তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব, যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল ।... 'সুন্দরী সুন্দরী' কাকে বল তোমরা, জানিনে । আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে । কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা— সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল ।... সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থিরমূর্তি তাঁর । তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত ।... নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল ; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা । দুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি ।

—*শিল্পাচার্য* অবনীন্দ্রনাথ

স্বামীজীর আহ্বানে

প্রণবেশ চক্রবর্তী

॥ ১ ॥

শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করে হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শুধু আমেরিকাতেই প্রবল আলোড়ন তোলেননি, সেই আলোড়নের প্রভাব এসে পৌঁছেছিল ইউরোপের মাটিতেও।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর একটানা প্রায় দু'বছর আমেরিকায় অতিবাহিত করে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ আগস্ট স্বামীজী প্যারিস যাত্রা করলেন। প্যারিস থেকে ইংল্যান্ডে পৌঁছলেন ১০ সেপ্টেম্বর। লন্ডনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী সাম্রাজ্যবাদী শাসকশক্তির মুখোমুখি হলেন। পরাধীন দেশের হৃদয় থেকে উৎসারিত হল এক নির্ভীক, চিরস্বাধীন পুরুষ। লন্ডনের সংবাদপত্র, শিক্ষিতমহল এবং ধর্মীয় সমাজ স্বামীজীর অসাধারণ বাগ্মিতা, মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং অপরিমেয় জ্ঞানের গরিমা-দর্শনে মুগ্ধ হলেন। তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর কথা শোনার জন্য সর্বত্রই প্রচুর লোকসমাবেশ হতে লাগল। পরাধীন ভারতের কপর্দকহীন সন্ন্যাসীকে শাসক ইংরেজ তার আপন দেশে যে-মর্যাদা দিয়েছিল, ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজির বোধ হয় দুর্লভ।

* * *

নভেম্বর মাসের মনোরম অপরাহ্ণ। লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডের একটি বাড়ির বৈঠকখানা। তখন ঠিকানা ছিল ৬৩ সেন্ট জর্জেস রোড। এখন সেই রাস্তার নাম সেন্ট জর্জেস ড্রাইভ। বাড়িটি লেডী মার্জেসনের। সেদিন ওই বৈঠকখানায় ঘরোয়া পরিবেশে ভারতীয় যোগী স্বামী বিবেকানন্দ কিছু বলবেন। তাঁর কথা শুনতেই সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন জনা কুড়ি শ্রোতা। অর্ধবৃত্তাকারে তাঁদের আসনগুলি বিন্যস্ত— অদূরে 'ফায়ার প্লেসে' আগুন জ্বলছে। সকলেরই নীরব উৎকণ্ঠা বিশিষ্ট বক্তাকে ঘিরে। যথাসময়ে অতিথিদের আসনে এসে বসলেন মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন আইরিশ ধর্মযাজক। তিনি স্বয়ং উচ্চশিক্ষিতা এবং শিক্ষাব্রতী।

মার্গারেটের জীবনে সে এক পরমসন্ধিক্ষণ। তিনি এসেছিলেন তীব্র মানসদ্বন্দ্বের মধ্যে আশার আলোর সন্ধানে। সে প্রার্থনা তাঁর আশাতিরিক্তভাবে পূর্ণ হল। হিন্দুযোগীর সান্নিধ্য তাঁর সমগ্র জীবনের গতিপথ নির্দিষ্ট করে দিল।

অতিথিদের দিকে মুখ করে দিব্যদর্শন তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। পরনে উজ্জ্বল গৈরিক বস্ত্র। ফায়ার প্লেসের অগ্নিশিখার আভায় তা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল, আয়তনয়ন। মার্গারেটের মনে হল তিনি যেন রাফায়েলের আঁকা মেরীনন্দন, শিশু যীশুরই প্রতিরূপ দেখছেন!

ক্রমে সন্ধ্যার প্রাগলগ্নে সোনালী আলোর কোমল উদ্ভাসে সমগ্র পরিবেশে এক অপূর্ব তন্ময়তা নেমে এল। জিজ্ঞাসু শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন সন্ন্যাসী। কখনও মৃদুগম্ভীর সুরে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করছেন। কখনও বা স্বগতোক্তির সুরে বলছেন, 'শিব, শিব'। পাশ্চাত্যের বাতাবরণে হিন্দুযোগীর প্রত্যেকটি চিন্তা ও তার অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ নতুন অথচ তা কী গভীর ভাববাহী!

কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবাদর্শের বিনিময় খুবই প্রয়োজন । 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সূত্রের ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে, বিভিন্ন নাম ও রূপ প্রকৃতপক্ষে সেই অদ্বিতীয় সত্তারই প্রকাশক । স্বামীজী আরও বললেন, হিন্দুমাত্রেই বিশ্বাস করেন যে, শরীর ও মন এক তৃতীয় অস্তিত্ব— আত্মার দ্বারা পরিচালিত । বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনাকালে স্বামীজী একটি পরিচিত প্রবাদের উল্লেখ করলেন— কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ে জন্ম হওয়া ভাল, কিন্তু সেই গণ্ডির মধ্যেই মৃত্যুবরণ ভয়ঙ্কর । কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান— আত্মজ্ঞানলাভের তিনটি উপায় । সকল ধর্মের একমাত্র শিক্ষা 'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর ।' স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : "মানুষ মিথ্যা থেকে সত্যে অগ্রসর হয় না, সত্য থেকেই সত্যে অগ্রসর হয় ।" সমবেত শ্রোতাদের অধিকাংশের মনে ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল না— তাই তাঁদের মধ্যে কারও কারও মনে হল, হিন্দুযোগীর ভাষণে কী আর নতুনত্ব আছে !

কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে উপবিষ্ট মার্গারেটের প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত । তিনি ভাবলেন, এঁদের মধ্যে নতুন ভাবকে গ্রহণ করবার এবং যাচাই করবার মতো মানসিকতার কী অভাব ! এর মূলে আছে বৃথা বিচারবোধের গর্ব । অন্যদিকে হিন্দুযোগীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে মার্গারেট তাঁর বহুপ্রত্যাশিত আদর্শকে যেন প্রত্যক্ষ করলেন । সেই প্রথম সাক্ষাতের প্রসঙ্গে অনেক পরে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জুলাই এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন : "যদি সেসময় স্বামীজী লন্ডনে না আসতেন ? জীবনটা নিরর্থক হয়ে যেত । কারণ আমি সর্বদাই জানতাম আমি এক সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় আছি । সব সময়ে বলে এসেছি, একটা আহ্বান আসবে, আর সত্যি সেদিন সে আহ্বান এল । যদি নিজ জীবন সম্বন্ধে আমার আরও নিবিড় পরিচয় থাকত, তাহলে হয়তো আমার সংশয় জাগত, পরম লগ্ন যখন আসবে, তখন তাকে চিনতে পারব কিনা । সৌভাগ্যবশত আমার কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না, তাই সংশয় পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি । এই মুহূর্তে ...মনে হচ্ছে, 'যদি তিনি না আসতেন !' "

॥ ২ ॥

স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর মার্গারেট ঘরে ফিরে গেলেন । প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনের চাকা ঘুরতে লাগল, কিন্তু হিন্দুযোগীকে তিনি ভুলতে পারলেন না । মার্গারেট স্বয়ং স্বীকার করেছেন : "সেই সপ্তাহের নির্দিষ্ট কাজগুলি করতে করতে ক্রমশ আমার কাছে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, ভিন্ন সংস্কৃতির এই চিন্তাশীল মানুষটি যে-নতুন বার্তা বহন করে এদেশে এসেছেন তাকে অস্বীকার করা শুধু অনুদারতা নয়, সেটা অন্যায় । আমার মনে হল, এই হিন্দুযোগীর অনুরূপ কথা হয়তো ইতিপূর্বে আমিও শুনেছি । কিন্তু এ পর্যন্ত যা কিছু আমার বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে গৃহীত, মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে প্রকাশ করতে পারেন, এমন মানুষ এর আগে দেখিনি ।"

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ এবং ২৩ নভেম্বর স্বামীজী পর পর দুটি বক্তৃতা দেন । সেই বক্তৃতার টানে মার্গারেট সভায় উপস্থিত থাকেন এবং বক্তৃতার সারাংশ লিখে রাখেন ।

লন্ডন থেকে স্বামীজী আমেরিকায় ফিরে গেলেন ২৭ নভেম্বর । পরের বছর এপ্রিলে আবার এলেন লন্ডনে । এই চার-পাঁচ মাস ধরে মার্গারেট শুধু স্বামীজীর প্রাণ-জাগানো কথাই ভেবেছেন, আর ভেবেছেন বহুদূরের সেই অজানা, অচেনা ভারতবর্ষের কথা ।

দিনের পর দিন মার্গারেট যেন এক দৃপ্ত আহ্বানের প্রতীক্ষায় আছেন । স্বামীজীর কাজে, স্বামীজীর কাছে নিজেকে নিঃশেষে অর্পণ করার জন্য তিনি ব্যাকুল । এমনই এক সময় ৭ জুন স্বামীজী চিঠিতে লিখলেন :

"হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো ! জগৎ যন্ত্রণায় পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে ?"

সেই উদাত্ত আহ্বান মার্গারেটের সমগ্র সত্তায় আলোড়ন জাগাল । ব্যক্তিগত বাধাবন্ধন উপেক্ষা করে 'বহুজনহিতায়' নিজেকে উৎসর্গ করার সে কী তীব্র আকুতি !

এরপর আর একদিন বক্তৃতাকালে স্বামীজী সর্বসমক্ষেই মার্গারেটকে আহ্বান জানালেন । কথাপ্রসঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন : "স্বদেশের নারীদের কল্যাণে আমার কতকগুলি সঙ্কল্প আছে, আমার মনে হয়, সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার ।"

মার্গারেট নিজের মনের গভীরে ডুব দিয়ে দেখলেন সেখানে তখনও একটা টানাপোড়েনের ভাব আছে । একদিকে তাঁর বহুপ্রতীক্ষিত নতুন জীবনের সুস্পষ্ট হাতছানি, অন্যদিকে আজন্ম লালিত সংস্কার, স্বদেশ এবং স্বজনের বন্ধন !

ইতিমধ্যে স্বামীজী সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে সুইজারল্যান্ডে ভ্রমণে গেছেন । কয়েক মাস পরে সেপ্টেম্বরে আবার এলেন লন্ডনে । এবার তিনি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ফিরবেন— তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে কত অভিজ্ঞতাই না তিনি সঞ্চয় করেছিলেন ! ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে এসেছিলেন পরিচয়পত্রহীন এক নবীন সন্ন্যাসী । আজ তিনি স্বদেশ ও স্বজনের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ— পাশ্চাত্যের মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন পুরুষ ।

স্বামীজীর প্রেরণায় পাশ্চাত্যের অনেক মানুষই তখন পরাধীন ভারতকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছেন । আধ্যাত্মিকতায় সুপ্রাচীন ভারতের জাগতিক দুঃখকষ্টের লাঘব যাতে হয় তার জন্য অর্থব্যয় করতে তাঁরা উদ্‌গ্রীব । এমনই এক বিত্তশালিনী মহিলা মিস মূলার এবং অভিজাত দম্পতি মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার ভারতবর্ষে স্বামীজীর কাছে আত্মনিয়োগ করার আগ্রহে তাঁরই সঙ্গে ভারতে চলেছেন । সেইসঙ্গে যাবেন স্বামীজীর শিষ্য, সাংকেতিক লেখক মিঃ গুডউইন । লক্ষ্য করার বিষয়, অন্যান্যরা স্বামীজীর

সঙ্গী হলেও মার্গারেট সেসময় আসেননি । স্বামীজী বোধ হয় তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিপাতে মার্গারেটের মানসদ্বন্দ্বের সবটুকুই পড়ে নিয়েছিলেন । আরও জানতেন, সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে স্বেচ্ছায় যেদিন এই আইরিশদুহিতা কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে অগ্রণী হবে, তখন পৃথিবীর কোনও বাধা, কোনও প্রতিকূল শক্তিই তাকে পরাভূত করতে পারবে না ।

* * *

মার্গারেট লন্ডনে অপেক্ষা করে আছেন— স্বামীজীর দিক থেকে সম্মতিসূচক কোনও পত্র এলেই তিনি যাত্রা করবেন । অথচ ভারতবর্ষের নানা খবর পাঠালেও স্বামীজী তাঁকে চিরপ্রতীক্ষিত আহ্বান জানাচ্ছেন না, সেই আপাত ঔদাসীন্যে মার্গারেট কিছুটা অসহিষ্ণু । হয়তো মার্গারেটের আত্মনিবেদনের আর্তিকে গভীরতর করতেই এই দীর্ঘ প্রস্তুতি ।

অবশেষে পেলেন স্বামীজীর পত্র । তিনি লিখেছেন : "ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের অপেক্ষা নারীর— একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন । ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী নারীর জন্ম দিতে পারছে না, তাই অন্য জাতির থেকে তাকে ধার করতে হচ্ছে । তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বদা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে ।"

ওই পত্রে স্বামীজী স্পষ্ট করেই লিখলেন : " 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' । এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কেমন, তা তুমি ধারণাই করতে পার না । এদেশে আসবার পর তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে । তাদের জাতপাত ও ছোঁয়াছুঁয়ি সম্বন্ধে বিকট ধারণা, তারা ভয়ে বা ঘৃণায় শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং শ্বেতাঙ্গরাও এদের তীব্র ঘৃণা করে ।... যদি এসব সত্ত্বেও তুমি কাজে নামতে সাহস কর, তবে অবশ্যই তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি ।"

মার্গারেট জানতেন, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রেখে নিজেকে তিলে তিলে অর্পণ করবেন বলেই তাঁর ভারতযাত্রা । তিনি ভারতের মাটিতে পা রাখলেন ১৮৯৮-এর ২৮ জানুয়ারি । ইংল্যান্ড এদেশে অনেক শাসনকর্তা পাঠিয়েছে, পাঠিয়েছে ধর্মপ্রচারক কিন্তু সেদিন যে অনন্যসাধারণ জ্যোতির্ময়ী তরুণীটি স্বামীজীর ডাকে ভারতে এসেছিলেন, তিনি এসেছিলেন নিতান্তই এক ভারত-কন্যার পরিচয় বহন করে । স্বামীজী মার্গারেটকে লিখেছিলেন : "এমন মানুষ চাই, যার জীবন নিঃস্বার্থ মানবসেবার বেদীতলে একটি অনির্বাণ শিখা হয়ে জ্বলবে ।" মার্গারেট তাঁর গুরুর আদর্শে সেই 'শিখাময়ী' হয়েই এদেশে এলেন । ভারতের জন্য নিবেদিত মার্গারেট হয়ে উঠলেন ভারতের নিবেদিতা ।

॥ ৩ ॥

ভারতে এসে শুধু ভারতকেই নয়, অতি নিকট থেকে অনেকদিন ধরে নিবেদিতা দেখলেন তাঁর গুরু বিবেকানন্দকে । দেখলেন তাঁর মধ্যে অমিত জ্যোতির উদ্ভাস । নিত্য-আলোকতীর্থ-পথে তাঁর চিত্তের অবিরাম যাত্রা । দেখলেন তাঁকে ভারতের প্রাণপুরুষরূপে, নবজাগ্রত ভারতের অতন্দ্র বিবেকরূপে । তিনি আরও দেখলেন— জগতের মহত্তমা নারী শ্রীশ্রীমাকে, যিনি সাগরপারের এই মেয়েটিকে সস্নেহে কোলে টেনে নিয়েছিলেন । ভারতের এই যে দুই রূপ দেখলেন তিনি গুরু বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে— সে-দু'টিই তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল ভারতবর্ষকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে ।

এরপর এল ২৫ মার্চ, ১৮৯৮ । সেদিন ছিল শুক্রবার । শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ তখন নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে । স্বামীজী প্রথমে মার্গারেটকে দিয়ে শিবপূজা করিয়ে পরে তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করলেন । ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল । স্বামীজী আবেগদৃপ্তকণ্ঠে মার্গারেটকে বললেন : "যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের আগে পাঁচশত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর ।" মিস মার্গারেট নোবল সেদিনই হারিয়ে গেলেন— জন্ম নিল এক মহাপ্রাণ । তাঁর নাম ভগিনী নিবেদিতা ।

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে ভগিনী নিবেদিতা ভারতের মর্মবাণী শুনেছিলেন । মনেপ্রাণে তিনি অনুভব করেছিলেন, ভারতের কল্যাণই তাঁর কল্যাণ । তাই গুরুর নির্দেশে প্রথমেই তিনি উত্তর কলকাতার বাগবাজার পল্লীতে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন— যা ছিল সেযুগে এক কঠিন তপস্যা, এক দুশ্চর সাধনা ।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ ভারতবর্ষে নিবেদিতার আগমনকাল থেকে প্রয়াণকালের মধ্যে শিক্ষা ও স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা-গ্রহণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে । কিন্তু তখনও পর্যন্ত নারীর একক ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষের চেতনা ও চিন্তার জগতে আলোড়ন তোলেনি । এই পটভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সত্যদর্শনের উত্তরাধিকারিণী ।

সাংবাদিক ও লেখক

আলো দাও

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

আমার প্রণাম নাও, দুয়েক জনই জীবনে প্রণম্য ।
দু একটি নদীই পারে আলো দিতে,
নিবেদিতা, আলো দাও ।

এত অন্ধকার
এত দিনযাপনের গ্লানি
এত কাপুরুষ বিষণ্ণতা !

তুমি প্রাণে প্রাণে বলে দাও
আমরাও সূর্যের, অমৃতের, চিরজীবনের
আমরা অনুষ্টুপ শ্লোক ।

তারপর শস্য হবে আনন্দের
ঘরে আসবে আনন্দের ছায়া
সমুদ্র বাতাসে উড়বে জবাকুসুমের রেণু

নিবেদিতা, শেখাও আনত হতে,
আমার প্রণাম বদলে দিক পৃথিবীর দিন ।

ভগিনী নিবেদিতা

সরল দে

কোথায় শিকড় তার কোথায় শাখার
বিস্তার আলোকস্পর্শী, সমুদ্রপারের
বিবেকলোকের টানে প্রাচীর প্রাকার
ধসে যায় পথে ধূলামন্দিরদ্বারে
কর্মযজ্ঞে সমর্পিতা কেমন যোগিনী
গলায় রুদ্রাক্ষ দোলে সেবা দশহাতে

এমন করুণাময়ী এমন ভগিনী
পেয়ে ধন্য দুঃখভূমি, জগৎসভাতে
ছড়িয়েছে সূর্যবীজ বিবেকমহিমা
দিয়েছে মুক্তির মন্ত্র, আগুনপাখিরা
স্পর্শ নিয়ে উড়ে গেছে ঝড়ের আকাশে
পরমা ভারতপ্রেমে, বিবেক সতত

প্রেরণার উৎস যার— সেই যে উত্থিতা
স্মরণেই উচ্চারিত মন্ত্র নিবোধত ।

নিবেদিতা

নিমাই মুখোপাধ্যায়

নিবেদিতা একটি জীবন-প্রার্থনার ভঙ্গিতে
মানুষের সেবা ।
নিবেদিতা— একটি শুভ্র গোলাপ
যার সুগন্ধে পৃথিবী মধুময় ।
নিবেদিতা— আপনাকে জানার অপর নাম ।
নিবেদিতা— গুরুর আদর্শের বাস্তব প্রতীতি ।
এই শুভ্র গোলাপটি ভারতের পুণ্যমাটিতে ঝরে গেছে
তার সৌরভ আজও মেলায়নি ।

শুভ্র শতদল

মানসী বরাট

ভারতমায়ের ললাট-টিকা
প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা—
দূর বিদেশের শুভ্র শতদল ।
অটুট তোমার অসীম মনোবল ।

গুরুর বোধে তোমার জীবনবোধ ।
পবিত্রতার আলোকদ্যুতি
বিশ্বে এমন নাই শকতি
তোমার গতি করবে প্রতিরোধ ।

কর্ম ছিল বর্ম তব
ধর্ম ছিল প্রেম,
মানুষ তোমার
সচল ভগবান,

তাই সুসজ্জিত হর্ম্যতল,
ছোঁয়নি তোমার মর্মতল ।
দিলে মানবসেবায়
আত্মবলিদান ।

চিরসন্ন্যাসিনী

প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা

গেরুয়া ধরনি তুমি ।
গেরুয়া তোমার মন ।
হে চিরসন্ন্যাসিনী, হে দেবী সুধীরা ।
ভয়শূন্য চিত্ত
ভগবৎ পাদপদ্মে স্থির ।
শ্রীমার আশিস তোমার মস্তকে ।
তুমি অনুপমা ।
বিবেক-মানসকন্যা নিবেদিতা আর
ভগিনী ক্রিস্টিন যিনি সহচরী তাঁর,
তাঁদের সঙ্গিনী হয়ে নব উদ্দীপনা
ভরেছিল হৃদয়ে তোমার ।
সঁপে দিলে প্রাণ ।
নবজাগরণ হল ভারতকন্যার ।
তুমি সেই নির্বাচিত জন ।
বিবেক-পতাকা নিয়ে অচঞ্চল
সম্মুখে— সম্মুখে শুধু সম্মুখে
তোমার চরণ ।
সুধীরা সার্থক নাম ।
সুধীর তোমার বাক্য, কাজ-কার্য সব ।
শতায়ু তোমার সন্তান, এ বিদ্যায়তন
তোমাকে প্রণাম করে ।
অয়ি সন্ন্যাসিনী
বিনম্র প্রণাম তোমার চরণে ।

অনন্তের পাখি

প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা

ভোরের প্রথম আলো আলতোভাবে শান্ত সমুদ্রকে স্পর্শ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে দূর সমুদ্রের ওপর একটি পাখি (সীগাল) একান্তে গভীর নিষ্ঠায় নানা ভঙ্গিমায় অসাধারণ গতিতে অসীমের পানে উড়তে শুর করে দেয়। অপরদিকে ঝাঁকে-ঝাঁকে অন্যান্য সীগাল দিনযাপনের যুদ্ধে প্রতিদিনের মতো ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ছন্নছাড়া তন্ময় সীগালটির নাম জোনাথন। রোজকার একঘেঁয়ে জীবনে সে হাঁপিয়ে ওঠে। তার অন্তরে যেন বেজে ওঠে : "...হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।" দলের সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সে মাছ ধরে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারে না। তীব্রভাবে অনুভব করে ''We have reason to live, to learn, to discover, to be free !'' অন্যরা বিস্মিত, বিরক্ত। ওরা বোঝে না গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে ওঠার কী আনন্দ ! দায়িত্বহীনতার দোষে সে নির্বাসিত হয়।

সে তখন আরও মগ্ন হয়ে যায় তার একান্ত সাধনায়। স্ব[র্গ] থেকে উজ্জ্বল দুটি পাখি এসে তাকে আহ্বান করে বলে : "ঘরে চলো।" জোনাথন উত্তর দেয় : "আমি যে ঘর থেকে নির্বাসিত !" তারা বলে : "গভীর নীল আকাশে আপন ঘরে চলো !" সেখানে জোনাথন দেখে আরও অনেক সীগাল চরম গতি লাভের জন্য আনন্দে নানা কৌশল অভ্যাস করে চলেছে। সে-ও তাদের সঙ্গে দেশ কাল ভুলে সাধনায় ডুবে যায়। পূর্ণতার অধিকারী হয়ে পরমানন্দে অনুভব করে : ''He was not bone and feather but a perfect idea of freedom and flight, limited by nothing at all.''

কিন্তু এতো আনন্দের মধ্যেও এক অজানা ব্যথা তাকে আকুল করে তোলে। মনে পড়ে যায় অন্যান্য সীগালদের কথা, যারা তাকে নির্বাসন দিয়েছিল। অপার করুণায় মুক্তির এই অনাবিল অসীম আনন্দ তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ফিরে যায় পুরোনো ঘরে— ঝাঁক-ঝাঁক সীগাল-এর কাছে। জন্মশিক্ষক জোনাথন অধিকারী বুঝে সাহস, উৎসাহ দান করে সাধনেচ্ছু কিছু সীগালকে শিক্ষা দেয় অনন্ত অভিযাত্রার কৌশল। হতাশপ্রাণে আলো জাগিয়ে বলে : ''I say you are free.'' আরও বলে : "শত্রুকেও ভালবেসে শেখাতে হবে" , ''You have to practise and see the real gull, the good in every one of them, and to help them to see it themselves. That's what I mean by love.'' দৃঢ়ভাবে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে : ''You've got to understand freedom.

an image of the great Gull, and your wholebody from wingtip to wingtip, is nothing more than your thought itself.'' তারা অনুভব করে প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন সেই পরমপুরুষ । তাদের অস্তিত্ব তাদেরই চিন্তার মূর্তরূপ । এরপর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষক নির্বাচিত করে জোনাথন ছাত্রপ্রতিম সীগালদের চোখের জলে ভাসিয়ে জ্যোতির্ময়রূপে অনন্তে মিশে যায় ।

* * *

দুর্লভ হলেও কদাচিৎ মাটির মানুষের মধ্যেও রিচার্ড বাকের অমর সৃষ্টি 'Jonathan Livingston Sea Gull'-এর সন্ধান পাওয়া যায় । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এমনই এক মহাপ্রাণের জন্ম হয়েছিল কলকাতার এক পল্লীতে । তিনি কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের প্রারম্ভে নিজের ভাব প্রকাশ করে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : "ধ্যান বা সাধনা আমি ইহাকে বলি, একাগ্র মন হইয়া তাঁহার চিন্তা— এটা যাহাতে সমস্ত দিন, সমস্ত কাজের মধ্যে থাকে । যেন এই বিশ্বের ছবিতে সেই বিশ্বনাথকে দর্শন করি ।" শুধু চিঠিতে লেখা নয়, তাঁর জীবনে দেখা যেত এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন । ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল নির্ভীকতা, দেশপ্রেম, সকলের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি অনন্যসাধারণ গুণের প্রকাশ । জোনাথনের জীবনের সঙ্গে আশ্চর্য তার সাদৃশ্য । এই অসাধারণ মেয়েটির নাম সুধীরা বসু । তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবব্রত বসু ছিলেন বিপ্লবী ও পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দ । ভ্রাতার প্রভাবও পড়ে তাঁর জীবনে । গতানুগতিক ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার পরিবর্তে সন্ন্যাসিনীর অবাধ, মুক্ত জীবন ছিল বালিকার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও আকর্ষণের বস্তু । 'অনন্তের পাখি' গণ্ডি ভেঙ্গে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে একবার কমণ্ডলু ও ত্রিশূল হাতে সন্ন্যাসিনীর বেশে সজ্জিত হয়ে পুরী গমন করেন । পুরী যাবার রেলপথ তখনও খোলা হয়নি । সুতরাং পথ ছিল দুর্গম । নির্ভীক সুধীরা সব বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে পথে নেমে পড়েন । পথে যখন এক দুষ্ট ব্যক্তি অনুসরণ করে— তাকে ত্রিশূল দিয়ে ভয় দেখিয়ে সুধীরা নিবৃত্ত করেন । দুর্গম তীর্থযাত্রার সঙ্গিনী ছিলেন তাঁরই এক পিসতুতো বোন ।

সুধীরা যে-সমাজে তখন এই দুঃসাহসিক কাজ করেন, সেই সমাজে মেয়েদের সংজ্ঞা শুধুমাত্র 'অবলা নারী' ! বিধিনিয়মের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তাদের জীবন । স্বাধীন মুক্ত জীবনের স্বাদ তাদের অজ্ঞাত, অপরিচিত । অসীম সাহসী সুধীরা অগ্রাহ্য করলেন বাধা-নিষেধকে, গতানুগতিক বিবাহবন্ধন স্বীকার করলেন না । ত্যাগব্রতে প্রতিষ্ঠিত দেবব্রত বুঝলেন ভগিনীর অভিপ্রায় । নিয়ে এলেন ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের বিদ্যালয়ে । সুধীরা স্বর্গের এই দুই জ্যোতির্ময়ী দূতের কাছে পেলেন অসীমের বার্তা । ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম নিবেদিতা বিদ্যালয়ে এসে তিনি পুরস্ত্রী বিভাগে নিয়মিত বাংলা সাহিত্য পড়াতেন এবং সপ্তাহে দুদিন গীতা প্রভৃতি ধর্মপুস্তক পড়াতেন । ক্রমে মহৎ সঙ্গের প্রভাবে বিশেষত স্বামীজীর ভাবধারার গভীর পরিচয় পেয়ে জীবনের তাৎপর্য তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠল । এইসময় তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করেন । পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয় । সংসারে বীতস্পৃহ পবিত্র আদর্শপ্রাণ সুধীরা শ্রীশ্রীমায়ের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন । তাঁর অপার স্নেহ ও উৎসাহ-বাণী, ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের সাহচর্য, সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ সুধীরার জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিল । দাদা দেবব্রত বসুর রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করার পর থেকেই সুধীরা চাইতেন সাধনায় তন্ময় হয়ে যেতে । ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষালাভ করে নিজেকে তিনি একান্তভাবে উৎসর্গ করলেন ।

ক্রমে বিদ্যালয় সুধীরার প্রাণের বস্তু হয়ে উঠল । বাড়িঘর ছেড়ে বিদ্যালয়ে ভগিনীদের সঙ্গে বসবাস শুরু করলেন । তাঁর চরিত্রে সাহসিকতা ও বাস্তব কর্মতৎপরতার চমৎকার সমন্বয় ঘটেছিল । একই সঙ্গে তিনি ছিলেন তেজস্বিনী, নির্ভীক, কঠোর সাধনপরায়ণ । পূজাপাঠ, গঙ্গাস্নান, ধ্যানজপ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধনায় নিষ্ঠার সঙ্গে যেমন মগ্ন থাকতেন তেমনই পড়াশুনা, গানবাজনা, বিদ্যালয়ের নানা কাজে তাঁর অনুরাগ ও তৎপরতা দেখা যেত । তখনকার দিনেও পুরুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাধীনভাবে সব কাজে এগিয়ে যেতেন । অধ্যাত্মসাধনায় অগ্রগামী, ত্যাগব্রতী সুধীরার অন্তরটি ছিল প্রেমে ভরপুর । অসাধারণ আকর্ষণ ছিল তাঁর ভালবাসায় । ছাত্রীদের প্রাণিত করে তুলতেন উৎসাহ উদ্দীপনায় । তাদেরই একজনের স্মৃতিকথায় : "সুধীরাদি যেন জাদু জানতেন ।... তাঁর ভালবাসার আকর্ষণ ছিল অদ্ভুত । আমাদের মনে হত তাঁর কথায় আমরা বাঘের মুখে যেতে পারতুম । তাঁর ত্যাগের আদর্শ, ভালবাসা, উৎসাহ ও দরদ আমাদের জীবন পাল্টে দিল ।" তিনি সকলের চিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন । তাই ছোটবড় সব ছাত্রী তাঁর নেতৃত্ব মেনে অকপটে শ্রদ্ধা করত । বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান যে তাঁর সাধনারই অঙ্গ ছিল তা তাঁর লেখাতে পরিচয় পাই :

> "আমরা কর্মযোগী হইতে চাই । কারণ এই দুঃখের দিনে নিঃস্বার্থতার শিক্ষা দিবার জন্য বড় ছোট সকলকে নিঃস্বার্থ দান করিতে হইবে । কর্মে সকল প্রবৃত্তির ক্ষয় হইয়া মন পবিত্র হইবে । মন্দির পবিত্র হইলে মন্দিরের অধিষ্ঠাতা তাহাতে বসিবেন । স্কুল তাহার একটা দিক ।"

অনন্ত অভিযাত্রা সুধীরার একান্ত প্রিয় ছিল । কিন্তু শুধু নিজের মোক্ষ নয়, অন্যের মুক্তির জন্য তাঁর উদার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠত । কাউকে আদর্শের প্রতি যথার্থ অনুরাগিণী দেখলে সুধীরা

তাকে সাহায্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন । কোনও বাধাবিঘ্ন তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারত না । তাঁর এই অযাচিত সাহায্য অনেকের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে । তাদের মধ্যে পারুল নামে এক ছাত্রীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বহুমুখী কর্মময় স্বল্পপরিসর জীবনে সুধীরা যদি এই একটিমাত্রই কাজ করতেন তাতেই তাঁর জীবন চিরকাল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উজ্জ্বল হয়ে থাকত । প্রবল সামাজিক বাধা উপেক্ষা করেও বিবাহিতা পারুলের (সরলা) সংসারত্যাগের অভিলাষ পূর্ণ করতে তিনি যে দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন, সেই ঘটনা এখন পর্যালোচনা করলে বিস্মিত হতে হয় । সেই যুগে এ এক অচিন্তনীয় কাজ । এমনকি ভগিনী নিবেদিতাও এ ঘটনা শুনে বলেছিলেন : "সুধীরা এক দুঃসাহসের কাজ করেছে ।" সরলার বয়স তখন সতেরো, সুধীরার মাত্র একুশ । গোপনে গৃহত্যাগে সাহায্য করে তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নানা জায়গায় রেখে সুধীরা তার জীবন গড়ে তোলেন । তাকে গভীর অধ্যাত্মজীবনে অগ্রসর করতে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন । বহু বছর পরে যখন মেয়েদের জন্য শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার প্রথম অধ্যক্ষা হন সুধীরার সেই সরলা— প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা । এই সমগ্র কাহিনী যেন রূপকথার এক গল্প । সুধীরা নিঃস্বার্থ প্রেমে অতিসংগোপনে পবিত্র পুষ্পকলিটিকে ফুটিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন ।

ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পর সুধীরা ভগিনী ক্রিস্টিনের সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনা করেন । ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ক্রিস্টিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করলে ভগিনী সুধীরাই স্কুলের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন । সংঘনেত্রীর সকল গুণ সুধীরার ছিল । তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে ক্রমশ বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে চলে । বিভিন্ন জায়গায় শাখা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল । স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল মেয়েদের মঠ প্রতিষ্ঠা । সামাজিক প্রতিকূলতায় তা সম্ভব হয়নি । একই কারণে ভগিনী নিবেদিতাও সেই কাজ করে যেতে পারেননি । মাতৃমন্দির নাম দিয়ে আশ্রমবিভাগ ও ছাত্রীনিবাসের সূচনা করেন সুধীরা । শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন : "আমার মেয়েদের একটা মাথা গোঁজার জায়গা হল ।" শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্ধানের পর মাতৃমন্দিরের নাম হয় 'সারদামন্দির' । 'সারদামন্দির' সুধীরাদির এক অক্ষয় কীর্তি । তাঁর অপূর্ব কর্মকুশলতার কথা উল্লেখ করে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন :

> " 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আজীবন ব্রতধারিণী সুধীরার বয়ঃক্রম ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল । কিন্তু অদ্ভুত কর্মকুশলতা ও অচল অটল ধৈর্যসম্পদের অধিকারিণী হইয়া তিনি স্বল্পকালে যে-কার্য সফল করিয়া গিয়াছেন অশীতিপর বৃদ্ধের দীর্ঘজীবনেও তাহা সম্ভবপর নহে ।"

সকলেই আশা করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে [illegible] যে-শুভকাজের উদ্বোধন হয়েছিল, তা সুধীরার নেতৃত্বে প্রসারিত হয়ে অচিরেই পূর্ণতা লাভ করবে । কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ ।

অবসর পেলেই সুধীরা ছাত্রীদের তীর্থভ্রমণে নিয়ে যেতেন [illegible] শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্ধানের পর মর্মাহত সুধীরা প্রাণে শান্তির অন্বেষণে ছাত্রীদের নিয়ে তীর্থভ্রমণে গেলেন । ফেরার পথে কাশীর অদূরে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে তিনি জ্ঞান হারান । রাত্রি এগারোটা নাগাদ কাশী সেবাশ্রমে তাঁকে নিয়ে আসা হয় । কাশী সেবাশ্রমের সুবিজ্ঞ ডাক্তারদের শতচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি আর জ্ঞান ফিরে পাননি [illegible] পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ আরও লিখেছেন :

> "অপরাহ্ণের বেলা ঢলিয়া ক্রমে সাড়ে তিনটা বাজিল । ব্রহ্মচারিণী সুধীরার মুখমণ্ডল এইক্ষণে অপূর্ব শ্রী ও জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া সকলের নয়নাকর্ষণ করিল । সকলেই বুঝিল শ্রীশ্রীজগদম্বা [illegible] অশেষগুণশালিনী প্রিয় তনয়াকে নিজাঙ্কে লইয়া [illegible] জীবনব্যাপী ব্রতের উদ্‌যাপন ও সকল [illegible] অবসানপূর্বক তাঁহাকে জ্যোতির্ময়ী দেবীতে পরিণত করিতেছেন । হে ব্রতধারিণী, অদ্য তোমার ব্রত সম্পূর্ণ, শীল সম্পূর্ণ, ত্যাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে ।"

অনন্তের পাখি লোককল্যাণে স্বল্প সময়ের জন্য [illegible] এসেছিলেন, অপূর্ব কর্মকুশলতায় দ্রুত ব্রত সমাপন [illegible] জ্যোতির্ময়ীরূপে আবার অনন্তেই লীন হয়ে গেলেন ।

সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ ।

একটি প্রতিবেদনে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের অতীত রূপপ্রতিমা

হর্ষ দত্ত

আপাতবিচারে ক্ষুদ্র একটি কার্যবিবরণী । কিন্তু এর রচয়িতা যখন স্বামী সারদানন্দ, তখন আমাদের সচেতন হতেই হয় এবং বুঝে নিতে হয় এই চল্লিশ পৃষ্ঠা সম্বলিত পাঁচ ফর্মার সামান্য পুস্তিকাটি নিছক একটি বিবরণী হবে না । জ্ঞাতব্য তথ্যমাত্রও নয় । এসবকে অতিক্রম করে এটি এমন এক সৃষ্টি হয়ে উঠবে যা একই সঙ্গে ইতিহাস ও সাহিত্য, যুগচিত্র ও অনাগত সম্ভাবনার অন্তর্লোক । কার্যবিবরণীটি পাঠ করলেই একথার তাৎপর্য আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ।

পাতলা কাগজের প্রচ্ছদে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস থেকে মুদ্রিত কার্যবিবরণীটির নাম এইরকম : 'নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ পুরস্ত্রী শিক্ষা ও সারদামন্দিরের কার্য্যবিবরণী । (১৯১৯—১৯২২) ।' পূর্বে বলেছি রচনাকার স্বামী সারদানন্দ, তাঁর নামের তলায় তিনটি লাইন : 'সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন/ ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার/ কলিকাতা ।'

সময়ের হিসেবে এই প্রতিবেদনটি বা বার্ষিক রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল নিবেদিতা স্কুলের পঁচিশ বছর বয়সে বা কমবেশি এর কাছাকাছি মুহূর্তে । যে-বিদ্যালয় আজ গৌরবময় শতবর্ষ অতিক্রম করতে যাচ্ছে, সেই বিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বছর আগেকার অতীতস্মৃতি আমাদের সকলের কাছেই এক দুর্লভ প্রাপ্তি ।

বস্তুত এই তথাকথিত 'কেজো' বিবরণীটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে সেই স্মৃতিচিহ্নিত ইতিবৃত্ত । 'বর্তমান শিক্ষানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতা এবং দেশবাসীর নিকট আমাদের আবেদন' শীর্ষক ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতার বিদ্যালয় সম্পর্কে যে-সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন, তার পুরোটাই উদ্ধৃতিযোগ্য । এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে তিনি দেখেছেন এক 'পূতপুণ্য অনুষ্ঠান'

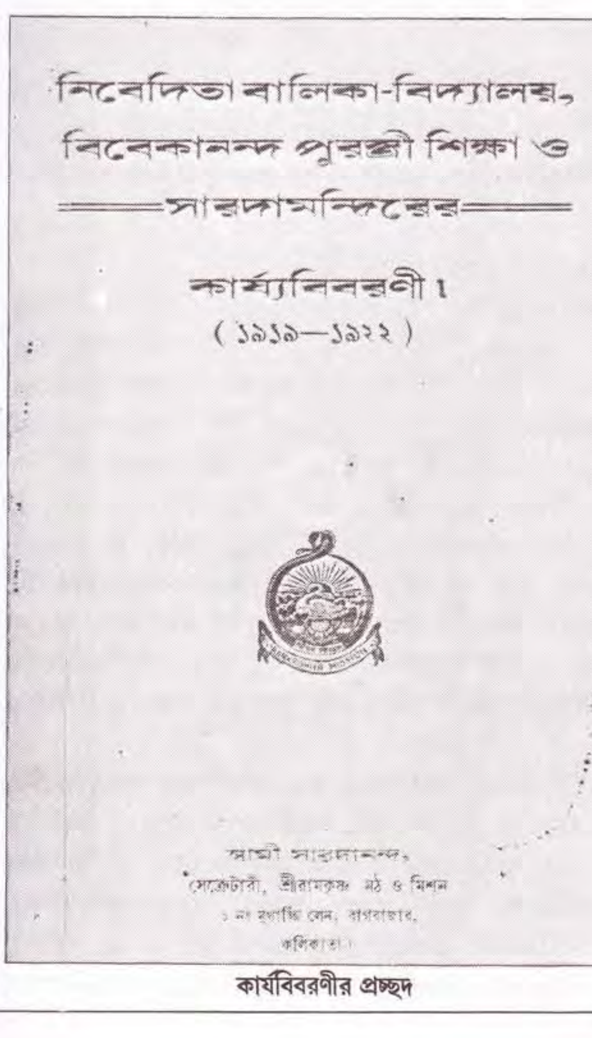
নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ পুরস্ত্রী শিক্ষা ও সারদামন্দিরের

কার্য্যবিবরণী ।
(১৯১৯—১৯২২)

স্বামী সারদানন্দ,
সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন
১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

কার্যবিবরণীর প্রচ্ছদ

কার্যবিবরণীর শেষের প্রচ্ছদে নন্দলাল বসুর আঁকা সরস্বতীর ছবি

রূপে। এই অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দ। রূপকার ভগিনী নিবেদিতা।

একশ বছর আগে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা খুব সহজ কিংবা মসৃণ পথে হয়নি। নিবেদিতার অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা, সঙ্কল্প ও সাধনা, সংযম ও সেবাব্রত ছাড়া তাঁর এই স্বপ্নসম্ভব বিদ্যালয়ের সংস্থাপনা তখনকার দিনে যথেষ্ট দুঃসাধ্য ছিল। সমস্ত বাধাবিঘ্নকে নিবেদিতা যেভাবে জয় করেছেন এবং তাঁর মহাপ্রয়াণের পর বালিকা বিদ্যালয়টি যে-উচ্চাদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে গিয়েছিল, তা একশ বছর পরে আমরা কল্পনাও করতে পারব না। স্বামী সারদানন্দ তাঁর এই প্রতিবেদনে নিবেদিতার 'বিদ্যামন্দির'-এর 'উন্নতিকল্পে সহায়তা' দেওয়ার জন্য 'সকল নরনারীকে আহ্বান' করেছেন। যুক্তি ও আবেগমথিত সেই আহ্বানবাণী চিরস্মরণীয় গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর রচয়িতার কথা মনে করিয়ে দেয়:

"হে পাঠক, ভগবতীর সাক্ষাৎ প্রতিমাস্বরূপ মাতা, ভগিনী, জায়া ও দুহিতা প্রভৃতি আত্মীয়া রমণীগণের নিকটে যে স্নেহ, আদর, প্রেম ও সেবা আজীবন লাভ করিয়াছ এবং করিতেছ, তাহা স্মরণ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে নারীজাতির উন্নতিসাধনে অগ্রসর হও। হে পাঠিকা, শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধান যদি তোমাকে ধনজন-সম্পদে ভূষিতা করিয়া থাকে, তবে দেশের, দশের এবং নিজ জাতির কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া এই কার্য্যের সহায়তায় তৎপর হও।"

'শ্রীসারদানন্দ' স্বাক্ষরিত এই ভূমিকা বা প্রাক্‌কথনে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে যে-অভূতপূর্ব মূল্যায়ন শ্রীশ্রীমায়ের শ্রেষ্ঠ সেবক শরৎ মহারাজ করেছেন, তা এতদিন পরেও সমান উজ্জ্বল ও বেগবান। মাত্র সাড়ে চারপাতার এই অংশটি অনুপুঙ্খ পড়লে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, কী সযত্ন অভিনিবেশে ও গরিমায়, কী আন্তরিকতা ও নিখাদ ভালবাসায় এই বিদ্যালয়টিকে তাঁরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন! এর মধ্যে কোনও ফাঁক ও ফাঁকি ছিল না। হঠযোগ কিংবা ম্যাজিকও ছিল না। সবটাই স্বেদ, শ্রম ও রক্তের বিনিময়ে গড়ে উঠেছিল। এসব কথা স্বামী সারদানন্দ স্পষ্টভাবে বলেননি, এর জন্যে আত্মশ্লাঘাও অনুভব করেননি। বরং তিনি চেয়েছেন সবাই এটা সহৃদয়তার সঙ্গে উপলব্ধি করুক। তাই সর্বসাধারণের কাছে তাঁর বিনম্র আবেদন:

"দেশ কাল এবং পাত্রের উপযুক্ততা বিবেচনা করিয়া যাহা দান করা যায় তাহাই সাত্ত্বিক দান; এবং অন্নদান অপেক্ষা বিদ্যাদানের বিশেষ মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সাত্ত্বিক দানের শুভাবসর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমরা আজ তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান— যাহার যথাশক্তি প্রদানপূর্ব্বক অশেষ পুণ্যসঞ্চয়ে ধন্য হও, কৃতার্থ হও। জানিও এই শুভানুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে তোমরা যাহা প্রদান করিবে, তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া সামাজিক কল্যাণরূপে তোমরা অচিরে ফিরিয়া পাইবে।"

ছয়-সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়েছে মূল 'কার্য্যবিবরণী'। ছয় থেকে তেইশ পাতা পর্যন্ত মুদ্রিত এই বিবরণে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-পর্ব থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এর আনুপূর্বিক ইতিহাস ও কার্যক্রম বিবৃত হয়েছে। যদিও সংক্ষিপ্ত তবু লেখকের নিষ্ঠা, সতর্কতা এবং অনুরাগ এর প্রতিটি শব্দে স্পন্দিত হচ্ছে। এই অধ্যায়ের শুরুতেই স্বামী সারদানন্দ লিখছেন:

"বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা বিগত (১৯১৯ হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) চারি বৎসরের কার্য্য-বিবরণী নিম্নলিখিতরূপ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব। যথা—

(ক) নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয় ও বিবেকানন্দ পুরস্ত্রী-শিক্ষাবিভাগ এবং বালী ও কুমিল্লাস্থিত শাখাবিদ্যালয়-দ্বয়ের বিবরণ।

(খ) (পূর্ব্বে মাতৃমন্দির নামে অভিহিত) সারদামন্দির বা ছাত্রীনিবাসের বিবরণ।

(গ) বিদ্যালয়ে পাঠ্য-বিষয় সকলের ব্যবস্থা, বিদ্যালয় ও সারদামন্দিরের আয়-ব্যয়ের হিসাব, বাড়ী-নির্ম্মাণ খাতে

সাহায্যদাতৃগণের তালিকা এবং বিদ্যালয় ও সারদামন্দিরের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী সম্বলিত পরিশিষ্ট ।"

বিবরণ শব্দটির মধ্যে যে-রসহীন শুষ্কতার ইঙ্গিত আছে, তা এই দীর্ঘ বিবরণীটির মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে । লেখকের রচনার গুণে, ভাষার সুষ্ঠু ও সুস্মিত ব্যবহারে এবং আনুপূর্বিক বর্ণনাশৈলীর মাধুর্যে পুরো বিবরণটি কেবল সুখপাঠ্যই নয়, অতীব কৌতূহলোদ্দীপক ও একালের পক্ষে নানা অজানা সংবাদে পূর্ণ ।

কার্যবিবরণীর 'ক' অংশটিকে স্বামী সারদানন্দ 'উদ্দেশ্য', 'ভগিনী ক্রিষ্টিনা', 'মিসেস্ সারা সি বুল', 'কার্য্য পরিচালনা', 'শ্রীমতী সুধীরা', 'শিক্ষয়িত্রিগণ', 'বিদ্যালয় ও পুরস্ত্রী-শিক্ষা-বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা', 'বিদ্যালয়ের বার্ষিক শ্রেণীর সংখ্যা ও বিবরণ', 'শিক্ষাকার্য্যে অর্থাগমের উপায়সমূহ', 'চিরস্থায়ী তহবিল', 'বিদ্যালয় বাড়ী', 'আর একটি অভাব', 'বালি শাখা-বিদ্যালয়' এবং 'কুমিল্লা শাখা- বিদ্যালয়'— মোট এই চোদ্দটি উপাংশে বিভক্ত করেছেন । এর ফলে তাঁর বক্তব্য আরও ঘনপিনদ্ধ এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছে । উপশিরোনামগুলি প্রতিটি পরিচ্ছেদকে দ্যোতিত করেছে সুনির্দিষ্টভাবে । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক সততই জানতেন, যে-কোনও বার্ষিক রিপোর্ট হওয়া উচিত সংহত অথচ বক্তব্যে ঋদ্ধ এবং একই সঙ্গে বিষয়নিষ্ঠ । এখানে অপ্রাসঙ্গিক কারুকৃতির কোনও স্থান নেই । আবার কেবল নীরস ভাষায় এই বিবরণ লেখা হলে তা কাউকেই স্পর্শ করবে না । তাই স্বামী সারদানন্দ তাঁর রচনায় মননের স্বচ্ছতা এবং সাহিত্যের মনোগ্রাহিতাকে একটি সুরে বেঁধে দিয়েছেন । তিনি যেমন স্পষ্ট এবং সরাসরি জানাচ্ছেন :

> "এই স্থলে পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য ইহাও বিশেষভাবে বলিয়া রাখিতেছি যে, ভারতীয় চিরন্তন প্রথানুসারে বিদ্যাদানের বিনিময়ে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের নিকট হইতে কোনরূপ দক্ষিণা বা পারিতোষিক গ্রহণ করা হয় না ।"

তেমনই আবার আবেগকম্পিত ভাষায় অকপটে লিখছেন :

> "...এই অনুষ্ঠান (অর্থাৎ নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী) দুঃখ-নিরাশার গাঢ় তমসায় আচ্ছন্না এবং উচ্চাদর্শে জীবন নিয়োগের অপূর্ব চিত্তপ্রসাদে অনভিজ্ঞতা অনেকগুলি মহিলাকে পথের সন্ধান দেখাইয়া ও অন্যান্য নানারূপে সহায়তা প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের জীবন গঠন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে ।"

নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের ইতিহাস যাঁরা কিছুমাত্র জানেন তাঁদের কাছে ভগিনী ক্রিস্টিন কিংবা সুধীরা দেবী সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই । স্বামী সারদানন্দ তাঁর এই বিবরণীতে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাঁদের কথা । এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের অপূর্ব ভাষার কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যায় । কিন্তু অনেকের কাছেই তা বাহুল্য বলে মনে হতে পারে । আমরা বরং সেইসময়কার বিদ্যালয়ের বহিরঙ্গের কিছু সংবাদ সারদানন্দের লেখা থেকে সংগ্রহ করতে পারি ।

যেমন, সেইসময় বিদ্যালয় এবং পুরস্ত্রী শিক্ষাবিভাগের মোট ছাত্রীর সংখ্যা ছিল দুশ পঁয়তাল্লিশ । এদের মধ্যে গড়ে দুশ জন প্রতিদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকেছে ।

বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল 'শ্রীমতী চপলা, মীরা, বাণী ও নরেশনন্দিনী প্রমুখ শিক্ষয়িত্রিগণের উপর ।' মোট শিক্ষিকা ছিলেন নয়জন । এই নয়জনের মধ্যে আটজন 'এই শিক্ষাকার্য্যকেই জীবনের ব্রত করিয়া উহাতেই আত্মোৎসর্গ' করার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন । আবার এই নয়জনের প্রত্যেকেই নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের নিজের হাতে গড়া ছাত্রী ।

স্বামী সারদানন্দের বিবরণী থেকে জানতে পারছি, স্থানসঙ্কট হওয়া সত্ত্বেও 'অভিভাবক-বর্গের নির্ব্বন্ধাতিশয়'-এ ছাত্রীসংখ্যা বাড়াতে হয়েছে । আবার এর ফলে একটিমাত্র 'সেশনে' সবাইকে বসতে দেওয়ার সামান্যতম ব্যবস্থাও করা যাচ্ছে না । ফলে বাধ্য হয়েই, প্রত্যেক দিন ভোর ছটা থেকে সাড়ে নটা এবং সকাল এগারোটা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত দুটি 'সেশনে' বিদ্যালয়ের কাজ চালাতে হয়েছে ।

তখন ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হত । এর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়

স্বামী সারদানন্দ,
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেক্রেটারী

ও তৃতীয় শ্রেণীতে শিশু ও বালিকারা পড়ত । অন্যদিকে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী নিয়ে গঠিত হয়েছিল পুরস্ত্রী শিক্ষাবিভাগ । কোন কোন ক্লাসে কতজন ছাত্রী পড়ত তার যে-অনুপুঙ্খ হিসেব সারদানন্দ দিয়েছেন, তা এইরকম :

প্রথম শ্রেণী—	দুটি বিভাগ	মোট ছাত্রী যথাক্রমে	২৮+২৭
দ্বিতীয় শ্রেণী—	একটি বিভাগ	মোট ছাত্রী	৩৩
তৃতীয় শ্রেণী—	দুটি বিভাগ	মোট ছাত্রী যথাক্রমে	২১+২৭
চতুর্থ শ্রেণী—	"	"	১৭+৪৫
পঞ্চম শ্রেণী—	"	"	১১+২৩
ষষ্ঠ শ্রেণী—	একটি বিভাগ	"	১৩

বিদ্যালয় বন্ধ থাকত সপ্তাহে দুদিন— শনি এবং রবিবার । প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শিশু ছাত্রীদের জন্যে কোনও গাড়ির ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । তবে পরিচারিকারা ছোট মেয়েদের বাড়ি থেকে নিয়ে ও দিয়ে আসতেন । নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিদ্যালয় যে এমন একটি ব্যবস্থা করে উঠতে পেরেছিল, তাও স্বামী সারদানন্দ সবিনয়ে জানিয়েছেন ।

ধর্ম ও অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন মহৎ মানুষদের প্রতিষ্ঠিত এবং যোগ্যহস্তে পরিচালিত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের যে-সমস্ত পাঠ্যবিষয় ছিল ও বই পড়ানো হত, সেগুলি ছিল একই সঙ্গে প্রাচ্যের ভাবধারাবাহী, পাশ্চাত্যের মনন-অনুসারী এবং সবদিক থেকে জীবনমুখী । কেউ যেন মনে না করেন, এখানে কেবল ধর্মশিক্ষাই দেওয়া হয়েছে । পাঠ্যবিষয় ও পুস্তকের যে-তালিকা স্বামী সারদানন্দ দিয়েছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি, শিশু ছাত্রীদের জন্যে (প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী) কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনুসরণ করা হত ।

তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল । শেখানো হয়েছে সূচীশিল্প, অঙ্কন, স্তবপাঠ ও ভজন । তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বই 'কথামালা', 'শিশু রামায়ণ' প্রভৃতি । ইংরেজী 'কিং রিডার' । পঞ্চম শ্রেণীর ইতিহাস বই হেমলতা দেবীর লেখা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' । ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যগ্রন্থ বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' । ইংরেজী 'বেঙ্গল রিডার পার্ট থ্রি অ্যান্ড ফোর' এবং 'ফিফ্‌থ স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ রিডার, ইংলিশ গ্রামার, ট্রান্সলেশন বাই বেণীমাধব গাঙ্গুলী' । এই ক্লাসের মেয়েরা পড়েছে রমেশচন্দ্র দত্তের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ।

প্রথাগত শিক্ষার বাইরে তৃতীয় শ্রেণী থেকেই শেখানো হত সেলাইয়ের কাজ । একটু উঁচু ক্লাসের মেয়েদের সীবন শিল্প, চরকায় সুতো কাটা এবং তাঁত বোনা । এই বৃত্তিমূলক শিক্ষার দ্বার আবার ভদ্রগৃহের বয়স্কা, বিবাহিতা এবং বিধবা নারীদের জন্যেও খুলে দেওয়া হয়েছিল । অর্থাৎ সর্বতোভাবে, স্বামী সারদানন্দের অপূর্ব বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় : "এই বিদ্যামন্দিরের পরিচালিকাগণ বর্ত্তমানযুগের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণালী ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শের সহিত অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে সম্মিলিত করিয়া নবভাবে শিক্ষাপ্রদান পূর্ব্বক ছাত্রীদিগকে অদৃষ্টপূর্ব্ব নবীন অনুরাগ ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন ।... সামাজিক মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম অটুট রাখিয়া যাহাতে তাহারা আবশ্যক হইলে আপনার ভার আপনি বহিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদ্রূপ কার্য্য ও প্রণালী নির্দেশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কর্মনিষ্ঠ ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছেন ।"

স্থানসঙ্কুলানের জন্য নিবেদিতা লেনের অসমাপ্ত এবং নির্মীয়মাণ বাড়িতে ১৯২২-এর নভেম্বরে শিক্ষাদানের কাজ শুরু হলেও তখনও স্থানাভাব থেকেই গিয়েছিল । বিদ্যালয়ভবনের জন্য কমবেশি ষোল কাঠা জমি কেনা হয়েছিল ধার করে । আবার যে সামান্য কিছু টাকা কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল তাই দিয়ে নির্মাণ শুরু করলেও 'এক-তৃতীয়াংশ আন্দাজ তৈয়ারি হইয়াই' কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । এই অবস্থায় স্বামী সারদানন্দ দেশবাসীর কাছে অসঙ্কোচে সাহায্য চেয়ে বলেছেন :

> "এই শুভানুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে যথাশক্তি দান করিয়া সকলেই নিজের, দেশের ও সমাজের অশেষ কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইবেন ।"

তাঁর এই ডাকে বহু অভিজাত পরিবার থেকে শুরু করে খুব সাধারণ ঘরের মানুষও সাড়া দিয়েছিলেন । এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই কার্যবিবরণীটি প্রকাশিত হয়েছিল নতুন বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদঘাটন-বর্ষেই । 'বিদ্যালয়ের বাড়ী-নির্ম্মাণ তহবিলে সাহায্যদাতৃগণের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ'-এর যে-তালিকা স্বামী সারদানন্দ দিয়েছেন তাতে বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে আছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মিস ম্যাকলাউড, জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ চৌধুরী, স্বামী প্রকাশানন্দ, নন্দলাল বসু, নির্ঝরিণী সরকার, শ্রীশচন্দ্র মতিলাল, ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ এবং স্বয়ং স্বামী সারদানন্দ । কেউ কেউ নাম গোপন করে 'জনৈক বিবেকানন্দ-ভক্ত' কিংবা 'জনৈক বন্ধু' পরিচয়ে সাহায্য করেছেন । সাহায্য এসেছে কলকাতার সন্নিহিত অঞ্চল এবং অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে । এসেছে বোম্বাই, অমৃতসর, বাঙ্গালোর, নাগপুর, শিলং, কাশী, আলিগড়, রায়পুর, পুনে, পোর্টব্লেয়ার প্রভৃতি দূর-দূরান্ত থেকে । আশ্চর্যজনকভাবে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিদেশ থেকেও সাহায্য এসেছে । যেমন নিউজিল্যান্ড, বার্মা, বোর্নিও, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা । শুধু নগদ টাকা-পয়সা নয়, কেউ দান করেছেন একটুকরো সোনা, জনৈক ইসলাম ধর্মাবলম্বী ইসাক মুন্সী দিয়েছেন পাঁচ হাজার ইট কিংবা জহরৎ ব্যবসায়ী জে দত্তের দান ৬[illegible] জয়েস্ট ২৪ ফুট । সরলাবালা সরকার এবং অপর কয়েকজন তাঁদের লেখা বইয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ শিক্ষাপ্রসারে এবং অন্য কাজে ব্যয় করতে বরাবরের জন্যে দিয়েছিলেন ।

আশ্চর্যের বিষয়, দাতাদের এই (চার বছরের) তালিকায় নিবেদিতার বিশিষ্ট অনুরাগীদের মধ্যে অনেকেই অনুপস্থিত। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, যদুনাথ সরকার, বিনয়কুমার সরকার প্রমুখ। এঁরা সকলে নিশ্চিতই নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শুভব্রত, অঙ্গীকার, সঙ্কল্প এবং পরিনির্মাণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অথচ যে কোনও কারণেই হোক তাঁরা প্রত্যক্ষত এই ব্যাপারে যুক্ত হতে পারেননি। কিংবা হয়তো যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই ইতিহাস আমাদের অজানা এবং তা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে তাঁর যে-নিবিড় সম্পর্ক ছিল, তা এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষকে বুঝতে নিবেদিতাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সেই সংযোগেরই একটি ফলশ্রুতি বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ প্রকল্পে রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সংজ্ঞা দেবীর মহৎ দান। স্বামী সারদানন্দ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লিখছেন : "ইনি স্বেচ্ছায় এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্যার্থে ৫০০০ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করেন এবং তদনুসারে বর্ত্তমানে ৩৬১৫। ৫ আনা আমাদের হাতে দিয়াছেন।... ইঁহার এই সহৃদয়তায় আমরা বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি।" এইরকমই একটি বড় দান এসেছিল স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহধন্য এবং ভাবশিষ্য বাগবাজারের কিরণচন্দ্র দত্তের জামাতা লোকেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে। লোকেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী শিবরানীর "স্মৃতিরক্ষার্থ বিদ্যালয়বাটীতে একটি গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ৫০০০ সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ দান করিয়াছেন।"

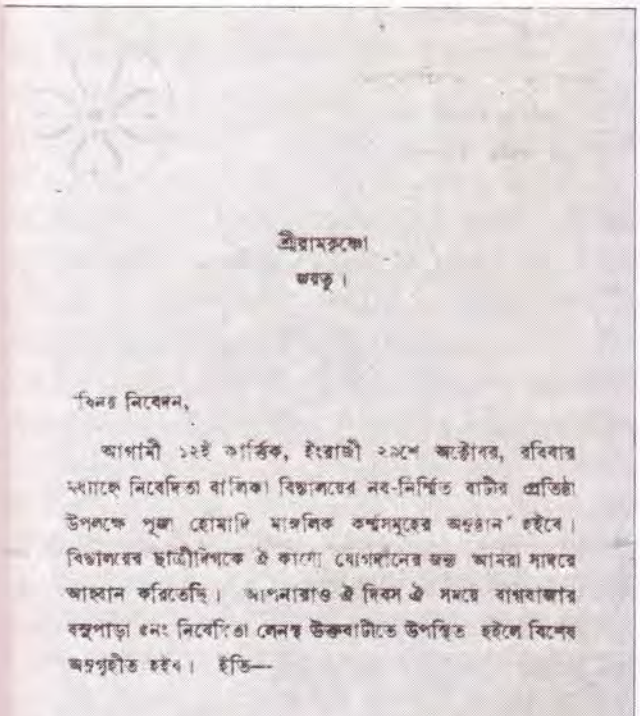
শ্রীরামকৃষ্ণো
জয়তু।

বিনয় নিবেদন,

আগামী ১২ই কার্ত্তিক, ইংরাজী ২৯শে অক্টোবর, রবিবার মধ্যাহ্নে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের নব-নির্ম্মিত বাটীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পূজা হোমাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান হইবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে ঐ কার্য্যে যোগদানের জন্য আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি। আপনারাও ঐ দিবস ঐ সময়ে বাগবাজার বসুপাড়া এবং নিবেদিতা লেনস্থ উক্তবাটীতে উপস্থিত হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। ইতি—

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়। ৩রা কার্ত্তিক ১৩২৯ — কৃপাপ্রার্থিনী বিদ্যালয়ের পরিচালিকাগণ।

1922

নবনির্মিত বিদ্যালয়ভবনের দ্বারোদঘাটন-উপলক্ষে আমন্ত্রণলিপি

* * *

কার্যবিবরণীর 'খ' অংশটি সারদামন্দির (পূর্বতন মাতৃমন্দির) সম্পর্কিত। বিদ্যামন্দির সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দের স্বপ্ন ও শ্রদ্ধার, আশা ও আকাঙ্ক্ষার যে-রূপ আমরা দেখেছি, সারদামন্দির সম্বন্ধেও সেই ভাবের প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ সংঘের আগে হোক 'মাতাঠাকুরাণী' শ্রীমা সারদা দেবীর মঠ। একটি চিঠিতে তাঁর স্পষ্ট অভিমত : "তাঁর [শ্রীমায়ের] মঠ প্রথমে [স্থূলাক্ষর স্বামীজীর] চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে!... আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা...।" নানা উদ্যম ও উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও স্বামীজী তাঁর জীবিতকালে এই স্বপ্নের পূর্ণ রূপায়ণ দেখে যেতে পারেননি। তবে তিনি একটি সুনিষ্ঠ কাজ করে গিয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দ সেই দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে লিখেছেন : "সিষ্টার নিবেদিতার উপর তিনি উক্ত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার ভার অর্পণ করিয়া তাহাকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করিয়া রাখিয়া যান...।"

নিবেদিতা তাঁর সাধের বালিকা বিদ্যালয় এবং ক্রিস্টিনের সাহায্যে পুরস্ত্রী-শিক্ষা বিভাগ শুরু করলেও বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত স্ত্রীসংঘ প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি। সেই আরব্ধ এবং সঙ্কল্পিত কাজ ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে ভগিনী সুধীরার আত্মত্যাগ ও 'অকপট প্রাণের প্রবল উৎসাহ'-এ শুরু হল, বলা যেতে পারে তখনই বীজাকারে স্ত্রীমঠের সম্ভাবনা সূচিত হয়। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত একটি ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দের স্বপ্ন যেন বাস্তবায়িত হল। ছাত্রীনিবাসটির নাম 'মাতৃমন্দির'। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীমা সারদার মহাপ্রয়াণের পর

"মন্দিরনিবাসিনী ও পরিচালিকাগণের অনুরোধ ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় উহাকে 'সারদামন্দির' নামে আখ্যায়িত করা হয় ।"

সারদামন্দির স্থাপনের যে-সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, তার মধ্যে যেটি প্রধান, তা স্বামী সারদানন্দের ভাষায় : "শিক্ষা ও সেবাব্রতে যাঁহারা জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন এইরূপ হিন্দুরমণীগণের বাসভবনরূপে ইহা প্রধানত পরিগণিত হইবে ।" এছাড়াও সূচীশিল্প প্রভৃতি শিখে জীবিকানির্বাহের উপায় করে দেওয়া এবং দূরবর্তী স্থানের ছাত্রীদের এই ছাত্রীনিবাসে থেকে পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি করা সারদামন্দিরের ঐকান্তিক লক্ষ্যের অন্যতম ।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯২২-এর মধ্যে গড়পড়তা পঁয়ত্রিশজন মন্দিরনিবাসিনী ছিলেন । এঁদের মধ্যে উনিশজন শিক্ষার্থিনী, পাঁচজন শিক্ষার কাজে জীবন উৎসর্গ করবেন বলে কৃতসঙ্কল্প, ছয়জন শিক্ষা ও সেবার কাজে উৎসর্গীকৃত এবং বাকি পাঁচজন নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ ঘটিয়ে 'নিজ নিজ ব্যয়-ভার বহন করিয়া উচ্চাদর্শে জীবন যাপন করিবার উদ্দেশ্যে মন্দিরে বাস করিতেছেন ।'

এই দৃঢ়সঙ্কল্পের রূপায়ণ সত্ত্বেও, 'স্বাবলম্বন ও পরার্থে ত্যাগ' সেই ব্রতধারিণীদের 'জীবনের মূলমন্ত্র' হওয়া সত্ত্বেও, স্বামী সারদানন্দ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন, প্রথম থেকেই সারদামন্দিরকে 'স্থানাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নানা অভাবের সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইতেছে ।'

ছাত্রীনিবাসের তেইশজনের কাছ থেকে মাত্র ১২ টাকা, একজনের কাছ থেকে মাত্র ৬ টাকা এবং বাদবাকি ছাত্রীদের কাছ থেকে কিছু না নিয়ে সারদামন্দিরের ব্যয় নির্বাহ হত । এই কঠিন ও অভাবনীয় অবস্থার মধ্যে মন্দিরনিবাসিনীদের কাছে মরূদ্যান ছিল কয়েকটি স্থায়ী তহবিল । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিবেদিতার উইল অনুসারী চিরস্থায়ী তহবিল, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রদত্ত 'স্বর্ণময়ী-ইন্দুবালা স্মৃতিরক্ষা তহবিল' (২১০০ টাকার কোম্পানির কাগজ), প্রয়াত দুর্গাদাস বাহাদুর প্রদত্ত ২০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ থেকে সৃষ্ট 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন তহবিল' এবং ঋষি অরবিন্দের সহধর্মিণী প্রয়াতা মৃণালিনী ঘোষের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর বাবা ভূপালচন্দ্র বসুর দেওয়া নগদ ২০০০ টাকা মূল্যের 'মৃণালিনী স্মৃতিরক্ষা ফাণ্ড' । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অরবিন্দ-পত্নী শ্রীমা সারদার বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন এবং শ্রীমা তাঁকে 'বৌমা' বলে ডাকতেন । মৃণালিনী তাঁর জীবনের এক সংকটঘন মুহূর্তে পেয়েছিলেন শ্রীমায়ের অপার আশীর্বাদ । সুধীরা দেবীর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল সুগভীর ।

* * *

স্বামী সারদানন্দের লেখা এই স্মরণীয় প্রতিবেদনটির 'গ' অংশ মূলত নানা বিষয়ের পরিশিষ্ট । এর মধ্যে আছে 'বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের ব্যবস্থা এবং পুস্তকাদির তালিকা', চার বছরের 'আয়-ব্যয়ের' পাই-পয়সা হিসাব, নানা স্মৃতি তহবিলের জমা-খরচের বিবৃতি, এবং বিভিন্ন সাহায্যকারীর নাম ও প্রদেয় অর্থের পরিমাণ সম্বলিত তালিকা । সারদামন্দিরের আয়-ব্যয়ের হিসেবে পাচ্ছি একটি করুণ সংবাদ । ৫৩/১ এবং ৫৩/২ বোসপাড়া লেনে অবস্থিত ছাত্রীনিবাসকে বাড়ি ভাড়া বাবদ চারবছরে গুনতে হয়েছে ২৮৯৪ টাকা ! তখনকার হিসেবে এর মূল্য অনেক । এদিকে সারদামন্দিরের চার বছরের সম্মিলিত আয় মাত্র ১৫,৮৭৯ হাজার টাকার কিছু বেশি, যদিও মহাপ্রাণ কয়েকজন ভক্ত এককালীন কিংবা প্রতিমাসে এ বাবদ কিছু সাহায্য করেছেন । পরিশিষ্টে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়গুলি আমরা আগেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি ।

পুরো কার্যবিবরণীটি পড়ে শেষ করার পর স্বতই মনে হয়, নিবেদিতা বিদ্যালয়ের একশ বছরের ইতিহাস ফুল্লকুসুমিত পথে রাতারাতি গড়ে ওঠেনি । অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা ও তপস্যার ফলে একটি বিদ্যালয় এখানে, এই শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে পেরেছে । বহু অনুরাগী ও সহৃদয় মানুষের সহায়তা সত্ত্বেও, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পরবর্তী সেই সময়ে তীব্র অর্থাভাব নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কাছে প্রায় প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছিল । টাকার অভাবে বহু স্বপ্ন তখন স্বপ্নই থেকে গেছে । যেমন, সেসময় মাত্র দশজন ছাত্রী যাতায়াত করতে পারে এমন একটি ছোট বাস ছিল বিদ্যালয়ের । তাই আর একটি বাসের খুবই দরকার ছিল । কেননা একটু দূরে থাকে এমন মেয়েরাও এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে একান্ত আগ্রহী ছিল । নানা প্রান্তের মানুষের কাছে এখানকার পূজার্চনার দিব্যসৌরভ ততদিনে নানাভাবে পৌঁছে গেছে । অথচ পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় সেই গাড়ি কেনা তখনই সম্ভব হয়নি ।

তবুও কখনও থেমে যায়নি নিবেদিতা বিদ্যালয়ের অভিযাত্রা । নানা প্রতিকূলতা, সঙ্কট এবং অভাবনীয় সংক্ষোভেও নয় । নিবেদিতা বলতেন : "আমরা আশাও করি না, নিরাশও হই না । আমরা দৃঢ়চিত্ত ।" সেই দৃঢ়চিত্ত সঙ্কল্পের শ্রেষ্ঠ উপমা এই শতবর্ষী বিদ্যামন্দির ।

[উদ্ধৃতিতে পুরোনো বানান রাখা হয়েছে ।]

দেশ পত্রিকার অন্যতম সহ-সম্পাদক ।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বের রূপকার

ঝরনা চৌধুরী

সে এক সুদীর্ঘ সুদূর তীর্থযাত্রা। মানবপ্রেমী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মানসকন্যা, শিখাময়ী নিবেদিতা ঐশী আলোকে আপন প্রাণের প্রদীপটি জ্বালিয়ে নিয়ে, স্বপ্নপূরণের অভীষ্ট লক্ষ্যে একলা-পথে চলেছিলেন। পূজ্যপাদ আচার্যের প্রাণময় বাণী ছিল অন্তরের গভীরে, প্রেরণা হয়ে আর ছিল চিরশুদ্ধা শ্রীশ্রীমায়ের ভালবাসায় ভরা আশীর্বাণীর অমূল্য পাথেয়। সাধিকার সেই দুশ্চর তপস্যার পুণ্যফল— আজকের এই বিদ্যানিকেতন।

শতাব্দীর ব্যবধানে দাঁড়িয়ে সেদিনের স্মৃতিচারণে বড় বিস্ময় জাগে মনে। বাগবাজার অঞ্চলের এক অখ্যাত পল্লীর, একটি ক্ষুদ্র গৃহের অপরিসর কক্ষে গুটিকয় বালিকাকে নিয়ে কী অসীম সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছিলেন নিবেদিতা! সেদিন তাঁর না ছিল অর্থসম্পদ, না ছিল পারিপার্শ্বের আনুকূল্য। তবু 'এসেছে আদেশ'— সে মহা-আহ্বান তাঁর অন্তরের অপরাজেয় শক্তিকে অপূর্ব কর্মোন্মাদনায় জাগিয়ে তুলেছিল। মহীরুহের অঙ্গীকার নিয়ে, যে বিদ্যালয়ের বীজ সেদিন উপ্ত হয়েছিল— শতবর্ষ পার হয়ে ফলে-পুষ্পে উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর বহন করে আজ তা স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

নিবেদিতা এই বিদ্যালয়কে অবলম্বন করে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের লক্ষ্মণরেখার আবেষ্টনীতে নির্বাসিত অসহায় মেয়েদের জীবনে মুক্তির উদার আলো এনেছিলেন। ভারতীয় নারীত্বের চিরন্তন আদর্শের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটিয়ে তাদের আত্মবিকাশের পথ সুগম করে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তিনি। শিক্ষাদান নয়, এমন এক শিক্ষা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন— যাতে ত্যাগ, প্রেম ও সেবার মাধুর্যে তারা অনুপম চরিত্রের অধিকারিণী হয়ে ওঠে— স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে— জাতীয় সংস্কৃতির সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের চিত্তের যোগ যাতে ঘনিষ্ঠ হতে পারে। তিনি আরও চেয়েছিলেন শিক্ষার সমগ্র পরিমণ্ডলটিকে যেন ঘিরে থাকে আধ্যাত্মিকতার পবিত্র বাতাবরণ।

করুণাময়ী নিবেদিতার ত্যাগতপস্যাপূত জীবনচর্যা, তাঁর ব্রতসাধনের ঐকান্তিকতা সেদিন কত না জীবনকে উদ্বুদ্ধ করেছে— সেবার কাজে নিজেদের বিলিয়ে দিতে। জানতে ইচ্ছে করে, সেদিন কারা, চিরাচরিত অভ্যাসের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিবেদিতার কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বর্তমান বিদ্যায়তনের প্রথম পর্বের রূপকার ছিলেন যাঁরা, আজ কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের স্মরণ করি।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর কালীপুজোর শুভদিনে ১৬ নং বোসপাড়া লেনে, নিবেদিতার গৃহে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করলেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমা। পরীক্ষামূলকভাবে স্কুলটি কয়েকমাস চলার পর কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে বাধ্য হলেন তিনি। সুস্থিত পরিস্থিতিতে বৎসরাধিক কাল পরে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের সরস্বতীপুজোর দিন থেকে পুনরায় যখন স্কুল খোলা হল, তখন পাড়ার বেশ কয়েকটি পরিবারের ছোট মেয়েরা স্কুলে আসতে আরম্ভ করল। নিবেদিতার ঐ সময়ের রিপোর্ট থেকে জানা যায় সারা বছর ধরে প্রায় পঞ্চাশটি মেয়ে স্কুলে এসেছিল, যদিও বৎসর শেষে ঊনত্রিশ জন অবশিষ্ট ছিল। বাল্যবিবাহের কারণে সেযুগে ছাত্রীদের উপস্থিতিকে নিয়মিত করার কোনও উপায়ই ছিল না। নিবেদিতা একাই মুখে মুখে তাদের ইতিহাস, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শোনাতেন, খেলার মধ্য দিয়ে গণিতের সহজ পদ্ধতি, চিত্রাঙ্কন, সেলাই শেখাতেন।

ভারতবর্ষে আসার পর এদেশের স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে উদ্যোগী প্রগতিশীল কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয় । এইরকম একটি পরিবারের দুই বিদুষী মহিলা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী লাবণ্যপ্রভা ও তাঁর পত্নী লেডী অবলা বসুর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল । এঁরা দুজনেই ছিলেন নারীশিক্ষাপ্রসারে ব্রতী । লাবণ্যপ্রভা বসুর সঙ্গে এদেশের স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের বিষয়ে নিবেদিতার নানা আলাপ-আলোচনা হত, যদিও নিবেদিতা নিজস্ব চিন্তাধারা অনুসারেই তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতি স্থির করেছিলেন । প্রথাগত ও বিদেশী ভাবাপন্ন শিক্ষায় তাঁর আস্থা ছিল না । "জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই"— তিনি যথার্থ শিক্ষা বলে মনে করতেন । জগদীশচন্দ্রের সুযোগ্যা সহধর্মিণী অবলা বসু আজীবন শিক্ষাপ্রসারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন । তিনি দুঃস্থ নারী ও বিধবাদের অর্থকরী শিক্ষার জন্য নারীশিক্ষামন্দির, বাণীভবন প্রভৃতি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন । শেষজীবন পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা পদে অধিষ্ঠিতা থেকে ঐ বিদ্যালয়ের অশেষ উন্নতিসাধন করেছিলেন । ভগিনী নিবেদিতার অনুরাগী বন্ধুস্থানীয়া ছিলেন তিনি । অবলা বসু নিবেদিতার কাছে আসতেন আধুনিক মন্টেসরী শিক্ষণপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে এবং সেইসঙ্গে নিবেদিতার প্রয়োজনমত শিক্ষাদানের কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন । তিনি নানাবিষয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, ইংরেজী শব্দের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ শেখাতেন এবং ছাত্রীদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত শুনে তাদের প্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন ।

এইরকম আর একটি সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের বিদুষী ও শিক্ষানুরাগী মহিলা, সরলাবালা সরকার— সিস্টারের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন । তিনি ছিলেন নিবেদিতার ছাত্রীস্থানীয়া, বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর যোগ । নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী তিনিই প্রথম রচনা করেন । নিবেদিতার শিক্ষাদান-পদ্ধতির অতি অপূর্বচিত্র তিনি তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন । মমতাময়ী নিবেদিতা মায়ের মতো স্নেহে এবং ধৈর্যে তাঁর কন্যাদের পড়াতেন । নিরুৎসাহ বা হীনম্মন্যতাবোধ যাতে তাদের পীড়িত না করে তার দিকে ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি । তাঁর বয়স্ক ছাত্রীরা যখন ছোট মেয়েদের ক্লাস নিত, তিনি তাদের নির্দেশ দিতেন— যারা কিছু জানে না বা ভুল করে, তাদের সবসময়ে বলতে হবে "আমরা আরও ভাল করিতে চেষ্টা করিব ।...আমরাও পারিব, আবার আমরা চেষ্টা করিব ।" সরলাবালার কন্যা নির্ঝরিণী সরকারও ভগিনীর ছাত্রী ছিলেন এবং ছোট ছোট মেয়েদের ক্লাসও নিতেন তিনি ।

১৯০৩ সালের নভেম্বরে, নিবেদিতার সহযোগিরূপে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিলেন স্বামীজীর আর এক আমেরিকান শিষ্যা ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল । স্বামীজীর আহ্বানে ভারতের মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্রত নিয়ে তিনি ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে এদেশে আসেন । সিস্টার ক্রিস্টিন অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন : "স্বামীজীর নারীশিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাধারা যদি কার্যকরী হয় তাহলে এমন এক শ্রেণীর নারী গড়ে উঠবে, ইতিহাসে যাদের তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না... করুণাময়ী, প্রেমময়ী, কোমলতায় পূর্ণ, সহিষ্ণুতার মূর্তি, হৃদয়বত্তায় ও বুদ্ধিমত্তায় মহান, তবে সবচেয়ে মহান আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে ।" ক্রিস্টিন নিজেও ছিলেন মমতাময়ী । "তিনি এত মাধুর্যময়ী ছিলেন যে তাঁর ছাত্রীরা তাঁকে শিক্ষক বা গুরুর চেয়ে বন্ধু বলেই বেশি মনে করত ।" তাঁকে সহযোগিরূপে পেয়ে নিবেদিতা অনেক নিশ্চিন্ত ও ভারমুক্ত হতে পেরেছিলেন । সেই যুগে বাল্যবিবাহের কারণে, বিদ্যালয়ে অল্পবয়স্কা ছাত্রীর সংখ্যা কম থাকায়, বয়স্কা মহিলা ও বালবিধবা এবং বিবাহিতা মেয়েদের ক্লাস নেবার ব্যবস্থা করলেন সিস্টাররা । ১৯০৩-এর নভেম্বরে অন্তঃপুরিকাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হল । ক্রিস্টিন ইংরেজী পড়াতেন, সেলাই ও নানাবিধ হাতের কাজ শেখাতেন । নিবেদিতা ইংরেজী, গণিত, চিত্রাঙ্কন এবং ইতিহাসের ক্লাস নিতেন । লাবণ্যপ্রভা বসু মেয়েদের পড়াবার ভার নিলেন । মাঝে মাঝে নিবেদিতার গৃহে যে শাস্ত্র ও পুরাণপাঠের আসর বসত, সেখানেও তিনি ভগবদ্‌গীতা, সংস্কৃত ও বাংলায় পাঠ করতেন । ছাত্রীদের মনে যাতে আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ হয় তার জন্য ধর্মশিক্ষার ক্লাসও নিয়মিত নেওয়া হত । শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনী পূজনীয়া যোগীন-মা, শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায় যিনি ছিলেন 'মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানী'— স্তবস্তোত্রপাঠ এবং পুরাণকথার আলোচনা করতেন ঐ ক্লাসগুলিতে । নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের পরিচিত আরও কয়েকজন মহিলা বিদ্যালয়ে পড়াবার ভার নিয়েছিলেন । বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা অমিয়া দেবী, মহামায়া দেবী এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য । পুষ্পমালা নামে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত একটি মেয়ে বাংলা পড়াতেন । নিবেদিতা মাঝে মাঝে চুপ করে দাঁড়িয়ে তাঁর বাংলা পড়ানো শুনতেন ।

নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের হিন্দুরমণীর মতো জীবনযাপন ও ভারতীয় ভাবধারার অনুসরণ, ক্রমশ রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা দূর করতে সক্ষম হয়েছিল । ছাত্রীসংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল— পুরস্ত্রীরাও অধিকসংখ্যায় আসতে আরম্ভ করলেন । দিনে তিনবার করে স্কুল বসতে লাগল । নিবেদিতার সঙ্কল্প ছিল মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলা । অল্পবয়সী বিধবারা যাতে নিজেরা শিখে ছোট ছোট ছাত্রী পড়িয়ে বা হাতের কাজ শিখিয়ে উপার্জন করতে পারেন, সেদিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল । ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ঐ সময়ে অনেক দরিদ্র বিধবা সেলাই শিখে ঐ বিদ্যালয়ে বা অন্যত্র কাজ করে সম্মানের সঙ্গে জীবিকা অর্জন করেছেন ।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে উত্তর কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারের কন্যা সুধীরা বসু সিস্টারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রহ্মচারিণীর

জীবনযাপনের সঙ্কল্প নিয়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। অগ্রজ শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্য সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দের নির্দেশে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিক্ষাদানের কাজে তিনি মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় অচিরেই তিনি ভগ্নীদ্বয়ের সুযোগ্যা সহকর্মিণী হয়ে উঠলেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতার দেহান্ত ও ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ক্রিস্টিন স্বদেশে প্রত্যাগমন করতে বাধ্য হলে, বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্বভার তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা, তেজস্বিনী, নিয়মানুবর্তী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ— স্নেহে কোমল ও শাসনে কঠোর। প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী সুধীরা দৃঢ়হস্তে বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। তাঁর সুপরিচালনায় বিদ্যালয়ের লক্ষণীয় উন্নতি ঘটেছিল। ভগিনী সুধীরার অসামান্য অবদান বিদ্যালয়ের আশ্রম বিভাগটির প্রতিষ্ঠা। শ্রীশ্রীমায়ের প্রেরণা ও স্বামী সারদানন্দ মহারাজের উৎসাহে মাতৃমন্দির নাম দিয়ে বোসপাড়ার একটি ভাড়াবাড়িতে আশ্রমটি স্থাপিত হল, শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর যার পরিচিতি 'সারদামন্দির' নামে। এইভাবে স্বামীজীর অভিপ্রেত স্ত্রীমঠের বীজটি রোপিত হল। বিদ্যালয়-সংলগ্ন এই আশ্রমটি শিক্ষা ও সেবার কাজে জীবন-উৎসর্গকারিণীদের আশ্রয়স্থল এবং দূরবর্তী স্থানের ইচ্ছুক শিক্ষার্থিনীদের আবাস ও জীবনগঠনের কেন্দ্র হয়ে উঠল। বিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশ দ্রুততর হয়ে উঠতে লাগল, নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কয়েকজন পুরাতন ছাত্রী ভগিনী সুধীরার অনুগামী হয়ে পড়ানোর কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে সুধীরা দেবীর আকস্মিক পরলোকগমনে বিদ্যালয়ের কাজে চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখা দিল। সর্ববিধ দায়িত্ব গ্রহণ করে বিদ্যালয় পরিচালনা করার মতো ব্যক্তিত্ব তখন কারও ছিল না। তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের কাজের ধারা ব্যাহত হল না। সুধীরা দেবীর অনুগামী কয়েকজন বয়স্কা ছাত্রী— শ্রীমতী মহামায়া, শ্রীমতী প্রবোধ, শ্রীমতী নরেশনন্দিনী, শ্রীমতী চপলা বিদ্যালয় পরিচালনার ভার নিলেন। মহামায়া প্রধানা শিক্ষিকা হিসাবে কাজ শুরু করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। শ্রীমতী প্রবোধও অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ের নূতন ভবনটি নির্মিত হয়। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে ঐ বিপর্যয়ের দিনগুলিতেও বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুনিয়মিত ছিল। ভগিনী সুধীরার অনুগামী শ্রীমতী মীরা, শ্রীমতী বাণী ও শ্রীমতী চপলা তাঁর নির্দেশে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের দেহান্ত হলে সঙ্কট চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। রামকৃষ্ণ মিশন ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দেই সরাসরি বিদ্যালয়টির ভার নিয়েছিলেন। এই সঙ্কটকালে প্রথমে পূজনীয় স্বামী বিরজানন্দ ও পরে স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজ বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। স্কুল পরিচালনার জন্য কমিটি গঠিত হয়। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা শ্রীমতী মীরা দেবীকে সারদামন্দিরের পরিচালিকা এবং শ্রীমতী বাণী ঘোষকে প্রধানা শিক্ষিকার পদে নিযুক্ত করেন।

সিলেটের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা শ্রীমতী মীরা চৌধুরী ধর্মজীবনযাপনের প্রেরণায় গৃহত্যাগ করে ভগিনী সুধীরার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল তাঁর। সারদামন্দিরের তত্ত্বাবধানের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে সংস্কৃত এবং বাংলা পড়াতেন তিনি। তাঁর লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ, কিশলয় ক্লাসে পড়ানো হত। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই বইটির 'কিশলয়' নাম দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মীরা দেবী ছাত্রীদের যথেষ্ট স্নেহ করতেন। নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার দিকেও ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী বাণী ঘোষ ছিলেন সুধীরা দেবীর নিকট আত্মীয়া এবং অতি অল্পবয়স থেকে তাঁর কাছেই প্রতিপালিতা। শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিতা বাণী দেবী ব্রহ্মচারিণীর জীবন গ্রহণ করেছিলেন। স্বল্পবাক, শুভ্রবসনা, গাম্ভীর্য ও মাধুর্যের সমন্বয়ে একটি স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। বাণী দেবী উচ্চতর শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াতেন। সুরুচি, সৌন্দর্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা তাঁর স্বভাবের এই গুণগুলি বিদ্যালয়ের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছিল।

মীরা দেবীর ভগ্নীর কন্যা জ্যোৎস্না দাসগুপ্ত, পাখি নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। সারদামন্দিরে থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের তিনি অঙ্ক করাতেন এবং আবাসিক ছাত্রীদের পড়াশোনার তত্ত্বাবধান করতেন। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন তিনি, পরে বেথুন কলেজ থেকে B.A. পাশ করেন। তিনি ছিলেন ধীর, স্থির, শান্ত, বিচক্ষণ মহিলা। ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল সহজ। ছাত্রীদের নিয়ে কোনও সমস্যা দেখা দিলে ধৈর্যসহকারে তার মীমাংসা করতেন তিনি।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের আগে বিদ্যালয়ের মান ছিল ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। ধীরে ধীরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের মান উন্নত হল। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু ও শ্রীমতী উষারানী সেন। প্রথম বিভাগে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এঁরা উত্তীর্ণ হন। উষাদেবী অঙ্ক সমেত তিনটি বিষয়ে লেটার নম্বর পান। সারদামন্দিরে থেকে এঁরা নিজেরা পড়াশোনা করতেন এবং বিদ্যালয়ে অঙ্কের ক্লাসও নিতেন। বালবিধবা উষাদেবী ছিলেন সদাহাস্যময়ী, সরস কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সকলকে সহজেই আপন করে নিতেন। মৈত্রেয়ী বসু অঙ্ক, ভূগোলের ক্লাস নিতেন। ছাত্রীরা এঁকেও অত্যন্ত ভালবাসত।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় দলে পরীক্ষা দেন বেদাঙ্গিনী বসু ও অনিলা দেবী। বেদাঙ্গিনী ছিলেন মৈত্রেয়ী বসুর কনিষ্ঠা ভগিনী। ইনি প্রথম বিভাগে লেটার নম্বর পেয়ে পাশ করেন। অনিলা দেবী বেথুন কলেজ থেকে I.A. পাশ করেন। এঁরা দুজনেই বিদ্যালয়ে

ক্লাস নিতেন। বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী কমলা দাসগুপ্তের সহোদরা তাপসবালা দাসগুপ্ত এইসময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হয়ে আসেন। তিনি বাইরে থেকে আসতেন। ধর্মজীবন যাপনের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। ব্রহ্মচারিণীর মতো জীবনযাপন করতেন। তিন-চার বৎসর তিনি স্কুলে অঙ্ক, ইংরেজী, বাংলা, পড়ান। ইংরেজী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি ঋষি অরবিন্দের ভাবাদর্শ গ্রহণ করে কাশীতে ধর্মজীবন যাপন করেন।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ছাত্রীহিসাবে সারদামন্দিরে আসেন শ্রীমতী বিজলী দেবী ও শ্রীমতী নিভা দত্ত চৌধুরী (রাবেয়া দেবী)। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারূপে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকেন। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীসারদা মঠ স্থাপিত হলে এঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পূজনীয়া বিদ্যাপ্রাণামাতাজী (বিজলীদি) এবং পূজনীয়া শ্রুতিপ্রাণামাতাজী (রাবেয়াদি) শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে এবং তাঁর ত্যাগী কন্যাদের পবিত্র সংস্পর্শে এসে, জীবনের গভীরতর অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে সারদামন্দিরের আবাসিক হয়ে এলেন আর এক শিক্ষিকা বীণাপাণি বসু রায়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে তাঁর মনের তারটি উঁচু সুরে বাঁধা হয়েছিল। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তিনি বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শান্ত, ধীর, স্থির বীণাদির মনে ছাত্রীদের জন্যে ছিল অসীম স্নেহ। ইতিহাস, বাংলা, সংস্কৃত ছিল তাঁর বিষয়। তিনি নিজে যেমন ছিলেন ছাত্রদরদী— ছাত্রীরাও তাঁকে তেমনি গভীরভাবে ভালবাসত।

এই বিদ্যালয়ের খ্যাতি এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল যে প্রবাসী বাঙালি পরিবারের কন্যারা বহু দূর থেকে এসে এখানে ভর্তি হতেন। শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান সুশীল সরকার তাঁর দুটি কন্যাকে সম্বলপুরে নিজের কর্মস্থল থেকে নিয়ে এসেছিলেন নিবেদিতার স্কুলে পড়াবার জন্যে। কমলা সরকার ও নির্মলা সরকার— দুই ভগিনী এখানে পড়াশোনা করেছেন এবং পরে শিক্ষিকার জীবন গ্রহণ করেছেন। রেণু দত্তগুপ্ত বাংলা পড়াতেন উঁচু ক্লাসে। তিনি B.A. পাশ করে বাইরে থেকে পড়াতে এসেছিলেন এখানে। তাঁর ভগিনী বেণু দত্তগুপ্ত এসেছিলেন I.A. পাশ করে। বাইরে থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইন্দিরা দেবী। তিনি ছিলেন স্নেহময়ী, মায়ের মতো যত্নে ছোটদের হাতের লেখা করাতেন, সেলাই শেখাতেন, পড়াতেন। বাইরে থেকে আরও আসতেন প্রভা দেবী, বীণা মিত্র, শোভা দেবী প্রমুখ।

নিবেদিতা প্রাচ্যদেশীয় চিত্রকলার প্রসার ও শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র নন্দলাল বসু, অসিত হালদার ও অন্যান্যদের এবিষয়ে অনুশীলনে তিনি বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। নিবেদিতা প্রথমাবধি তাঁর বিদ্যালয়ে অঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সে কথা মনে রেখে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ে অঙ্কন শিক্ষার ক্লাস খোলার ব্যবস্থা করেন স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজ। আচার্য নন্দলাল বসু তাঁর সুযোগ্যা ছাত্রী ইন্দুসুধা ঘোষকে শিক্ষিকার পদ গ্রহণ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেন তিনি। বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, শোভন সৌন্দর্য, শিক্ষিকাদের মধুর আন্তরিক ব্যবহার, ছাত্রীদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। অল্প কয়েকমাস এখানে তিনি ছিলেন, কিন্তু সেই স্বল্পকালে বিদ্যালয়ে যা তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর লেখায় তাকে তিনি 'অমূল্য সম্পদ' বলে অভিহিত করেছেন।

সিস্টার ক্রিস্টিন পুরস্ত্রীদের জন্য যে শিল্পবিভাগটি খোলেন তার ধারা আজও অব্যাহত। ত্রিশের দশক থেকে শোভা সেন ঐ বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি সারদামন্দিরের আবাসিক ছিলেন। ছাঁটকাট, সূচীশিল্প, লেপবোনা, উলবোনা এবং নানাবিধ হাতের কাজ নিপুণভাবে ছাত্রীদের এবং বহু দরিদ্র অসহায় মহিলাকে শেখানো হত। সেইসব সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্র ছাত্রীদের জন্যই ব্যয়িত হত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকীতে শোভা দেবীর নেতৃত্বে যে সূচীশিল্পের প্রদর্শনী হয় তা সমাগত সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমতী গৌরী দেবী বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিলেন। মায়ের মতো স্নেহে তিনি ছাত্রীদের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি শ্রীসারদা মঠের পূজনীয়া সন্ন্যাসিনী দয়াপ্রাণামাতাজী।

বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বে একেবারে গোড়ার দিক থেকে শুরু করে সময়ে সময়ে বিদেশিনী রমণীরাও মাঝে মাঝে এসে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন মেয়েদের। নিবেদিতার লেখা থেকে জানা যায়— ডাফরিন হাসপাতালের প্রধানা তাঁর বন্ধুস্থানীয়া ক্যাথরিন ভগান, গ্রীষ্মের দুপুরে এসে বয়স্কা মহিলাদের ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ত্রিশের দশকে রমা দেবী (বিদেশিনী মহিলা) ছাত্রীদের ড্রিল শেখাতেন। কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের জার্মান স্ত্রী শ্রীমতী এটা ঘোষ শান্তিনিকেতন থেকে মাঝে মাঝে এসে সূচীশিল্পের ক্লাস নিতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে শিক্ষিকা নেওয়ার প্রয়োজন আগেই অনুভূত হয়েছিল। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সুষমা রায়, স্নেহ রায়, জ্যোৎস্না দেবী, ইন্দিরা দেবী প্রমুখ অনেকেই স্কুলের শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ের জীবনে পালাবদলের হাওয়া এসে লাগল। ঐ সময়ে মীরা দেবী, বাণী দেবী পদত্যাগ করলেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই সারদামন্দিরের আবাসিক শিক্ষিকাদের অনেকেই অবসর নিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা ও সারদামন্দিরের পরিচালিকা হয়ে এলেন রেণুকা দেবী— বর্তমানে শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা পূজনীয়া প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী সারদানন্দ

ক্রিস্টিন ও ভগিনী সুধীরার সঙ্গে সেকালের ছাত্রী

পুরস্কার বিতরণী উৎসব ; সমবেত সঙ্গীতে একালের ছাত্রী

সায়েন্স ল্যাবরেটরি

শিক্ষিকাসহ প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী ছাত্রীরা

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে এলেন লক্ষ্মী দেবী, বর্তমানে শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা পূজনীয়া প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজী । এই সময়ের আগে-পরে এলেন ত্যাগব্রতী কয়েকজন মহিলা— সুরনলিনী দেবী, কল্যাণী দেবী, মায়া দেবী, সুষমা দেবী, গীতা দেবী, নীলিমা দেবী প্রমুখ । এঁরা সকলেই পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ত্যাগ ও সেবার পথ বেছে নিয়েছেন । বিদ্যালয় জীবনে সকল সঙ্কট ও সমস্যা সমাধান করে উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার কৃতিত্ব এঁদের ।

নিবেদিতার 'হৃদয়-শোণিত-সিঞ্চিত' সাধনা সার্থক । তাঁর পুণ্যজীবনের পবিত্র দীপশিখাটি কত না জীবনের দীপকে প্রজ্বলিত করেছে । ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দূরে ফেলে স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ এইসব জীবন— নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সেবার কাজে তাঁরা নিজেদের সঁপে দিয়েছেন । আজ তাঁরা সকলেই আমাদের নমস্যা ।

প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল ।

অপর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতই বিশেষভাবে মহীয়সী নারীকুলের জন্মদাত্রী । ইতিহাস, সাহিত্য, যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্বত্র তাঁহাদের মহিমময় মূর্তি উদ্ভাসিত ।... ভারতের ইতিহাস এবং সাহিত্যে নারীত্বের যে জাতীয় আদর্শ বিরাজমান, যে শিক্ষা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সেই আদর্শকে উচ্চ স্থান প্রদান না করে, তাহা কখনই ভারতীয় নারীগণের প্রকৃত শিক্ষারূপে পরিগণিত হইতে পারে না ।

নিবেদিতা

ছাত্রীদের স্মৃতির আলোয় নিবেদিতা

দীপ্তি ঘোষ

উত্তর কলকাতার অখ্যাত পল্লীর মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা যে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন, আজ সে বিদ্যালয় শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত । শতবার্ষিকীর এই স্মরণীয় মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রীর কথা ।

প্রতিভাময়ী নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব ছিল বহুমুখী, তাঁর বর্ণময় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে সেদিনকার স্থবির ভারতীয় সমাজ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল । বাগবাজার পল্লীর ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি ছাড়িয়ে তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছিল ভারতের সর্বত্র । তিনি নিজে কিন্তু শিক্ষয়িত্রীরূপে আপন পরিচয় দিতে ভালবাসতেন । নানাকাজে ব্যস্ত থাকলেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আর তার ছাত্রীরা ছিল তাঁর একান্ত আদরের ।

জীবনের প্রারম্ভেই শিক্ষাদানকে ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন মনস্বিনী নিবেদিতা । কেসউইক, রেক্সহ্যাম, চেস্টার প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে শিক্ষকতা করেন সদ্যকৈশোরোত্তীর্ণা মার্গারেট নোবল । কিন্তু শুধু গতানুগতিক পাঠদানের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না তাঁর শিক্ষকতা । ইউরোপীয় শিক্ষাবিদ্ পেস্তালৎসি ও ফ্রবেলের শিক্ষাসম্বন্ধে অভিনব চিন্তাধারা উদ্দীপিত করেছিল মার্গারেটের শিক্ষকসত্তাকে । তাঁর এই নবজাগ্রত চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করার সুযোগ তিনি পেলেন উইম্বলডনে, মিসেস ডি. লিউয়ের বিদ্যালয়ে । কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী মার্গারেট স্বাধীনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে গড়ে তুললেন নিজস্ব বিদ্যালয়— রাস্কিন স্কুল । স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ভারতবর্ষে আসার আগেই শিক্ষয়িত্রী নিবেদিতার ভাণ্ডার ভরে উঠেছিল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায়, শিক্ষকতা সম্পর্কে গভীর মননে ।

স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের জীবনে আনল আমূল পরিবর্তন । বিদুষী আয়ার্ল্যান্ড-তন মার্গারেট হলেন ভারতসেবিকা নিবেদিতা । স্বদেশীয় নারী দুর্গতি অনেকদিন থেকেই পীড়িত করেছিল দেশপ্রেমিক স্বামী বিশাল হৃদয় । স্বদেশীয় রমণীদের শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যক্তি সন্ধানে নিমগ্ন তাঁর দৃষ্টি জহুরির মতোই চিনে নিয়েছিল মার্গা নোবলের অন্তর্নিহিত বিপুল সম্ভাবনাকে । কিন্তু স্বামীজীর ভারতবর্ষের কন্যাদের শিক্ষাদানের মহৎ দায়িত্ব যিনি গ্রহণ কর তাঁর এই বহুব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, মননশীলতাও পর্যাপ্ত ছিল স্বামীজীর বিবেচনায় । তাই দিনে দিনে নানা আঘাতে, শিক্ষায় তিনি তাঁকে প্রস্তুত করে তুললেন ভারতীয় না শিক্ষাদানের জন্য ।

বাগবাজারের একান্ত রক্ষণশীল পল্লীতে যে ক্ষুদ্র বিদ্যা স্থাপন করলেন ভগিনী নিবেদিতা, সেদিনের বাংলাদেশে সে একতম বা প্রথম বিদ্যালয় ছিল না । কিন্তু মিশনারি পরি বাংলাদেশের অন্যান্য বিদ্যালয়গুলি বা সরকারের উদ্যোগে বিদ্যালয়গুলির থেকে নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের স্বাত অনন্যতা ছিল নানাক্ষেত্রেই । তাই নিবেদিতার ক্ষুদ্র বিদ্যা সর্বতোভাবে বঞ্চিতা শিক্ষার্থিনীদের কাছে হয়ে উঠতে পে প্রাণের সম্পদ । সমাজের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে উপকর আলোবাতাসহীন ঘরগুলিতে ছুটে আসার জন্য অধীর হয়ে তাদের প্রাণ । বিবাহিতা ও বালবিধবা রমণীদের জন্য পুরস্ত্রীবিভাগ গড়ে তুলেছিলেন ভগিনী, সমাজ-অবহে নারীদের কাছে সেটি ছিল প্রাণের আশ্রয় ।

কতদিনই বা বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেত এই বিকা প্রাণগুলি ? পরম যত্নে, পরম স্নেহে যাদের গড়ে তোলবার

নিবেদিতার ছাত্রী প্রফুল্লমুখী দেবী

করেছেন ভগিনী, অকালে সংসারজীবনে প্রবেশ করে হারিয়ে গেছে তাদের সমস্ত সম্ভাবনা। বালবিধবা যে মেয়েদের প্রতি নিবেদিতার স্নেহ ছিল সর্বাধিক, তাদেরও স্কুলে আসার পথে সামাজিক বাধা ছিল বিস্তর। অভিভাবকেরা চাইতেন না এই বঞ্চিতা মেয়েরা অন্দরমহলের বাইরে এসে শিক্ষার সুযোগ লাভ করুক। তাই নানা অছিলায় ফিরিয়ে দেওয়া হত স্কুলের গাড়ি। নিবেদিতার ছাত্রীরা তাঁদের পরমপ্রিয় 'সিস্টার'কে কোনদিন ভোলেননি। শ্রীমতী গিরিবালা ঘোষের স্মৃতিচারণে পাই কেমন করে নতজানু হয়ে তাঁর মাতুলের কাছ থেকে সিস্টার ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন তাঁর ছাত্রীটিকে, পাছে ভবিষ্যতে কোনও বাধা আসে, সেজন্য বড় একখানা বোম্বাই চাদর তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন সিস্টার: "আমার মেয়ে এইরূপে চাদর জড়াইয়া গাড়িতে উঠিবে।"

ভগিনী নিবেদিতার কাছে প্রতিটি ছাত্রীই ছিল পরম আদরের। প্রতিটি শিক্ষার্থিনীকে পর্যবেক্ষণ করে তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের অভ্যাস, তাদের আচার-ব্যবহার, তাদের কর্মনৈপুণ্য, তাদের বিশেষ প্রবণতা, তাদের আত্মোন্নতির প্রচেষ্টা। তবুও বালবিধবা ছাত্রীদের উপর তাঁর স্নেহ ছিল সমধিক। প্রফুল্লমুখী দেবীর স্মৃতিচারণে তাঁর এই অসীম স্নেহের পরিচয় মেলে। তাঁর কাছে জননীর অধিক ছিলেন সিস্টার। একাদশীর দিন ছাত্রীর শুষ্ক মুখ বিচলিত করত সিস্টারকে। তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে মিষ্টি ও দুধ কিংবা ঘোল খেতে হত প্রফুল্লমুখীকে। এক একাদশীর দিনে তাঁকে খাওয়াতে ভুলে গিয়েছিলেন সিস্টার। বিকেলে জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতে গিয়ে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেছে সেকথা, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে স্কুলে ফিরে এসেছেন, দারোয়ান পাঠিয়ে বাড়ি থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন প্রিয় ছাত্রীটিকে, দুহাতে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বার বার আক্ষেপ করেছেন: "ও আমার মেয়ে, আমি খেয়েছি কিন্তু তোমাকে খাওয়াতে ভুলে গিয়েছি!" অভিভূত প্রফুল্লমুখী দেবী আজীবন মনে রেখেছিলেন এই দিব্য স্নেহের কথা।

সিস্টার নিবেদিতার শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্যে ছাত্রীদের মনে শিক্ষণীয় বিষয়টি সুমুদ্রিত হয়ে যেত, শিক্ষার্থিনীদের মনে জেগে উঠত জ্ঞানস্পৃহা। নির্ঝরিণী সরকার বলেছেন: "অল্পদিনের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারে নিবেদিতা আমাদের জীবনস্বরূপ হয়ে পড়লেন, তাঁকে আমাদের তখন কি যে ভাল লাগত! তিনি কখন আমাদের কাছে আসবেন ও কিছু বলবেন সেইজন্য আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতাম।"

সিস্টার সাধারণত ছাত্রীদের অঙ্ক, ইতিহাস ও ছবি আঁকা'

নিবেদিতার ছাত্রী নির্ঝরিণী সরকার

শেখাতেন । সাধারণ অন্য শিক্ষয়িত্রীর মতো পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে ইতিহাস পড়াতেন না । তিনি ইতিহাসের গল্প বলে যেতেন, ছাত্রীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত । এক একদিন এক একটি বিষয় নিয়ে আরম্ভ করতেন আর সেই বিষয়ের মধ্যে ডুবে যেতেন । রাজপুত জাতির শৌর্য-বীর্যের কথা, দেশের জন্য তাদের ত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা অগ্নিগর্ভ ভাষায় বর্ণনা করতেন সিস্টার । রাজপুতরমণীদের বীরত্ব, তাদের আত্মাহুতির কাহিনী বর্ণনা করতে করতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠত তাঁর মুখ ; ছাত্রীরা মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকত তাঁর দিকে । তিনি নিজে রাজপুতানার নানা স্থানে গিয়েছেন— চিতোরে পদ্মিনী যেখানে জহরব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন, সেই মহাতীর্থে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন সিস্টার ; স্থান-কালের বোধ তাঁর ছিল না । তাঁর সেই অনুভূতি ছাত্রীদের কাছে বর্ণনা করতে করতে তিনি যেন ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন, তখন তাঁকে 'স্নিগ্ধ, শান্ত জ্যোতি দিয়ে গড়া দেবীমূর্তি' বলে মনে হত ছাত্রীদের ।

সিস্টারের অঙ্ক শেখানোর পদ্ধতিও ছিল সমান চিত্তাকর্ষক । সাধারণ নিয়মে তিনি অঙ্ক শেখাতেন না, তাই অঙ্ক ক্লাসকে খেলার ক্লাস বলে মনে হত ছাত্রীদের । মুখে মুখে যোগ-বিয়োগ করিয়ে ছাত্রীদের উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতেন তিনি । কোনও ছাত্রীর বুঝতে দেরি হলে অসহিষ্ণু না হয়ে বেশি মনোযোগ দিতেন তার প্রতি । কিন্তু কোনও ছাত্রী যদি অপরের উত্তর দেওয়ার সময় অতিরিক্ত উৎসাহে সঠিক উত্তরটি দিয়ে ফেলত, প্রচণ্ড বিরক্ত হতেন সিস্টার । কোনও তিরস্কার না করেই প্রশ্ন করার সময় গম্ভীরভাবে তাকে উপেক্ষা করে তার শাস্তিবিধান করতেন । ভুক্তভোগী নির্ঝরিণী সরকার পরিণত বয়সেও ভোলেননি তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থা ।

সিস্টারের বিজ্ঞান শেখানোর পদ্ধতিও ছিল যথেষ্ট আধুনিক । সেযুগেই তিনি ছাত্রীদের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে শেখাতে চেয়েছেন বিজ্ঞানের রহস্য । রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী (সরলাদেবী) উত্তরকালেও মনে রেখেছেন অণুবীক্ষণের মাধ্যমে রক্তবিন্দু বা জীবাণু দেখার প্রথম রোমাঞ্চ ।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সিস্টার ছাত্রীদের সেযুগেও বেড়াতে নিয়ে গেছেন মিউজিয়ামে । বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিলালিপি দেখিয়ে ছাত্রীদের মনে সঞ্চার করতে চেয়েছেন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ।

শিল্পের প্রতি নিবেদিতার ছিল আন্তরিক অনুরাগ, তাই ছবি আঁকা ও রঙ তুলির কাজ তিনি নিজেই শেখাতেন ছাত্রীদের । শিল্পানুরাগিণী নিবেদিতা ভারতের নিজস্ব শিল্প পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট ছিলেন, ছাত্রীদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন । যেসব মেয়েদের এসব বিষয়ে দক্ষতা আছে, তাদের ডেকে এনে ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়াতেন তিনি । আলপনা, মাটির ছাঁচ, কাশ্মীরী স্টিচের

বিদ্যালয়ে ভারতের মানচিত্র

শাল, কাঁথার কারুকার্যের সঙ্গে ছাত্রীদের অপটু হাতের শিল্পকর্মে ভরে উঠত তাঁর গৃহ ।

বিদ্যালয়ের খুঁটিনাটি বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল নিবেদিতার । কোনও জিনিসের অপচয় তিনি পছন্দ করতেন না । ছাত্রীদের বসার ভঙ্গিটিও যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয়, সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল । নির্ঝরিণী সরকার বলেছেন : "মাটিতে বসে ছাত্রীদের ক্লাস করতে হত, সামনে থাকত নীচু কাঠের ডেস্ক । ছাত্রীদের বসার ভঙ্গি ঠিক না হলে তিনি নিজে তাদের ধরে সোজা করে বসিয়ে দিতেন । মেরুদণ্ড সোজা করে কেমনভাবে বসতে হয়, নিজে দেখিয়ে দিতেন ।" শারীরশিক্ষার দিকেও যে তাঁর দৃষ্টি ছিল, সেকথা জানি প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর স্মৃতিচারণে । সিস্টার নিজেই ছাত্রীদের নানা ব্যায়াম শেখাতেন, স্কিপিং রোপের অভাবে নিজের কোমরে বাঁধা দড়িটি তাদের স্কিপিং করতে দিতেন ।

ছাত্রীদের মনে স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করতে সকলসময় সচেষ্ট ছিলেন নিবেদিতা । 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হত বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের কার্যসূচী । স্বদেশপ্রেম-মূলক অন্যান্য সঙ্গীত গাইতেও তিনি উৎসাহিত করতেন মেয়েদের । শ্রীমতী গিরিবালা ঘোষের স্মৃতিপটে অমলিন হয়ে আছে এমনই একটি দিনের ছবি । লেডি অবলা বসু (জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী) এসেছেন বিদ্যালয়ে, ছাত্রীরা তাঁকে "বঙ্গ আমার, জননী আমার" গেয়ে শোনাচ্ছেন— আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছেন সিস্টার । অঙ্গভঙ্গিতেই পরিস্ফুট হচ্ছে ভারতপ্রেম আর চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অবিরল জলধারা । এমনই আর একটি দিনের কাহিনী

শুনিয়েছেন প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী । "তোমাদের রানী কে ?" প্রশ্নের উত্তরে মেয়েরা যখন বলেছে : "কুইন ভিক্টোরিয়া", ক্ষুব্ধ হয়েছেন সিস্টার । বলেছেন : "তোমাদের রানী সীতা, ইংল্যান্ডেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া নন ।" কী প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে তিনি 'সীতা' নামটি বার বার উচ্চারণ করে ছাত্রীদের মধ্যে জাগাতে চেয়েছেন স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা— সেকথা স্মরণ করে আপ্লুত হয়েছেন প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী । শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারও জানিয়েছেন : "একদিন তিনি একটি কালো রঙের মসৃণ পাথরের ছোট চৌকো টুকরো, অত্যন্ত বহুমূল্য পাথরের মতো সযত্নে আমাদের দেখিয়ে বললেন : 'এইটি মহারাজা অশোকের স্তম্ভের প্রস্তরের টুকরো, আমি এইটি যখন স্পর্শ করি তখন আমি মনে করি হয়তো একদিন কোনও এক সময়ে মহারাজা অশোক এই প্রস্তর স্পর্শ করেছিলেন ।' বলতে বলতে ভাবাবেশে তাঁর চোখদুটি বন্ধ হয়ে এল । কোনও একটি পবিত্র পূজার জিনিস স্পর্শ করছেন ঠিক সেইভাবে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পাথরটি স্পর্শ করলেন । তারপর আমাদের সকলকেই সেই পাথরটি স্পর্শ করতে বললেন, আমরা সকলেই সেই পাথরটি স্পর্শ করলাম । তখন আমাদের অন্তরও একটি পূজা ও শ্রদ্ধার ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল ।"

তাঁর ছাত্রীরা যেন তাদের পূর্ববর্তিনীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, ভক্তি, সেবাপরায়ণতা, আশ্রিতবৎসলতা, সরলতা প্রভৃতি গুণ হারিয়ে না ফেলে, সেজন্য বার বার তাদের সেকথা স্মরণ করিয়ে দিতেন । গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রণামের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন সিস্টার ।

সিস্টারের শিক্ষার গুণে সেদিনের সেই ছাত্রীরা বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ না পেলেও সুশিক্ষিতা হয়ে উঠতে পেরেছিল তাঁর মহৎ চরিত্রের সান্নিধ্যে এসে, ঐ অল্পবয়সেই তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল তাঁর অতুলনীয় মাহাত্ম্য । তাই তাদের স্মরণে ও মননে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হয়ে আছেন শিক্ষয়িত্রী নিবেদিতা ।

সিস্টার নিবেদিতার তিরোধানের পর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে । বিদ্যালয়ের শতবর্ষের যাত্রাপথে বহু ছাত্রী এসেছে এই বিদ্যামন্দিরে, তারা এই মহীয়সী শিক্ষয়িত্রীকে পেয়েছে তাদের অন্তরে, শ্রদ্ধা করতে শিখেছে তাঁর মহান আদর্শকে, বহন করে চলেছে এই মূল্যবান ঐতিহ্যের ধারা । আজও ভারতীয় প্রথা অনুসরণ করে তারা বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর নির্দিষ্ট স্থানে জুতো খুলে রাখে এবং ক্লাস চলা কালে মাটিতে চটের আসনে বসে ; প্রতিদিন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তারা যেমন প্রতিষ্ঠাত্রীর মুখোমুখি দাঁড়ায়, তেমনই তাদের দৃষ্টি পড়ে একটু বামে ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপরে । তারা স্মরণ করে ভগিনী নিবেদিতার বাণী : "ভারতবর্ষের কন্যাগণ, তোমরা জপ করবে— ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, মা, মা, মা ।" এখনও স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে মেয়েরা নিবেদিতার স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা, তাঁর প্রেরণাময়ী বাণী নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করে । প্রত্যক্ষ না হলেও, ছাত্রীদের স্মৃতিতে তিনি চিরজাগরূক ।

প্রাক্তন শিক্ষিকা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল ।

কত স্মৃতি, কত ছবি

স্মৃতিচারণ কখনই ইতিহাসচর্চার বিকল্প নয় । তার চলার ধারা অন্য । ঐতিহাসিকের মতো নির্মোহভাবে তথ্যনিষ্ঠ থাকার কোনও দায় স্মৃতিচারকের নেই । বরং ব্যক্তিগত পছন্দ, আবেগ, বিস্মরণ সব মিলেমিশে সে এক অন্য সৃষ্টির পথ । কোনও এক সময়কালের প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণার দ্বারস্থ হতেই হবে । নিবেদিতা স্কুলের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে তার ঘনিষ্ঠ মানুষ কয়েকজনের স্মৃতি-রোমন্থনকে তাই এক আলাদা মর্যাদায় আমরা উপস্থাপিত করতে চাই ।

সময়ের এক নিজস্ব প্রবহমানতা আছে । সালের বেড়া দিয়ে তাকে নানান পর্যায়ে বিভাজন করতে যাওয়া সম্ভব নয় । ছাত্রী-শিক্ষিকা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ তুলির ছোট ছোট টানে ফুটিয়ে তুলেছেন । গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি আপাততুচ্ছ অভিজ্ঞতা স্মৃতিধার্যতার আন্তরিকতায় আশ্চর্য উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে । বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বের ছাত্রীদের স্মৃতিকথা ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তী ও প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যায় এবং নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যায় মুদ্রিত । ঐ বহুপরিচিত স্মৃতিচারণকে আমরা অতিসংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছি । পরবর্তী পর্বের ছাত্রীদের স্মৃতির সরণি ধরে এগিয়ে গেলে অনুভব করা যায় নিজস্ব আদর্শ আর ঐতিহ্যের মধ্যে নিজের শিকড়কে দৃঢ় প্রোথিত রেখেও নিবেদিতা স্কুল কেমন এক শতাব্দী ধরে বরাবর যুগোপযোগী থেকে চলেছে । এখানেই তো এই বিদ্যালয়ের প্রাণশক্তি ! এখানেই এই স্মৃতিমাল্যেরও সার্থকতা !

[সময়কাল : ১৮৯৮-১৯২০]

সরলাবালা সরকার

"এই শিক্ষালয়ে ছোট ছোট বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তা বধূ, গৃহিণী ও বিধবাগণের সকলকেই— যিনি যেরূপভাবে শিক্ষালাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে সেইরূপভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল । ভাষা, অঙ্ক, শিল্পকার্য, সেলাই এবং চিত্রবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত । নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট মেয়েদের উচ্চশ্রেণীর মেয়েরাই শিক্ষা দিত ।... বড় মেয়েদের শিক্ষা দিবার ভার প্রধানত ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা ও শ্রীমতী সুধীরার উপর ছিল, কিন্তু নিবেদিতা যখনই অবসর পাইতেন তখনই ঐ ছাত্রীদের শিক্ষার ভার লইতেন । গণিত ও চিত্রবিদ্যা— এই দুইটিই তিনি বেশির ভাগ শিক্ষা দিতেন । অবসর মতো ইংরেজী ভাষাও শিখাইতেন । তাঁহার শিখাইবার প্রণালী অত্যন্ত সুন্দর ও নূতন ধরনের ছিল । তিনি গণিত ও চিত্রবিদ্যা যে-প্রণালীতে শিখাইতেন, তাহাতে যাহাদের শিখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা কম, তাহারাও অতি সহজে উহা আয়ত্ত করিয়া লইত । ছোট ছোট মেয়েরা তেঁতুলের অথবা অন্য কোনও ফলের বীজ লইয়া খেলা করিতে করিতে প্রথমে গণনা শিখিত । 'জোড় কি বিজোড়' খেলাতেই প্রথমে ছোট ছোট মেয়েদের যোগবিয়োগ অভ্যাস হইত, তাহার পর তাহারা শ্লেটে লিখিয়া অঙ্ক কষিতে শিখিত ।

নিবেদিতা যখন ছবি আঁকিতে শিখাইতেন, তখন সকল মেয়েকে সারি দিয়া বসাইতেন, ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিতেন না । শিক্ষয়িত্রীরাও সেসময় ছাত্রীদের শ্রেণীভুক্ত হইতেন । সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানাকেও নিবেদিতা ছাড়িতেন না, তাঁহাকেও ঐ সঙ্গে ছবি আঁকিতে বসিতে হইত ।... ছবি আঁকিবার সময় মেয়েরা প্রত্যেকে রঙ, তুলি, পেনসিল ও একখানা করিয়া কাগজ পাইত। নিবেদিতার নিজের হাতেও তুলি আর কাগজ থাকিত ।"...(সরলাবালা সরকারের রচনাসংগ্রহ থেকে)

* * *

সুধীরা যখন প্রথম নিবেদিতা শিক্ষালয়ে আসেন তখন নিবেদিতা ভারতবর্ষে ছিলেন না । সিস্টার ক্রিস্টিনই শিক্ষালয়ের

সরলাবালা সরকার

ভার নিয়েছিলেন । ভগিনী ক্রিস্টিন সুধীরা এলেই যেন তাকে দুই হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন । সুধীরা পেলেন স্নেহের অতলস্পর্শ গভীরতা, আর ক্রিস্টিন পেলেন যেন তাঁর নিজের ছোট বোনকে ।

সেদিনের সুধীরাকে আজ বারবার মনে পড়ছে । দেখতে সুন্দরী ছিলেন না অথচ অপরূপ মাধুর্যময়ী । ক্রিস্টিনকে 'ছোড়দি' বলতেন, আর তাঁর ছাত্রীরা তাঁকে বলত সুধীরাদিদি । স্কুল তো স্কুল নয় । যেন আনন্দের একটা হাট ।

নিবেদিতা আসছেন শুনে সুধীরার সে কি ভয় ! আবার সেই নিবেদিতা যখন এলেন তখন দু-চার দিনের ভিতরই সুধীরার তিনি একান্ত আপন জন হয়ে গেলেন ; সুধীরা তখন একদিন বললেন : "ডাবের উপরের খোলা শক্ত কিন্তু ভিতরে কি মধুর জল । আমাদের সিস্টার ঠিক সেইরকম । যারা তাঁর সঙ্গে কিছুদিন ঘনিষ্ঠ হয়েছে তারাই বুঝেছে তাঁর মন কত মধুর আর ভালবাসায় ভরা ।"

নিবেদিতা বিদ্যালয় যেন এক প্রেমের সংসার । মেয়েরা সুধীরাকে বোধহয় নিজেদের মা কি দিদিদের চেয়েও আপনার জন মনে করে । সুধীরা মেয়েদের সুখদুঃখের সমভাগিনী । মেয়েদের কত যে আদর আবদার তাঁর কাছে তার সীমা-পরিসীমা নাই । তাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তাদের সঙ্গে খেলা করছেন । তাদের সঙ্গে 'মায়ের বাড়ি' যাচ্ছেন, আর মা— এই বালিকাবাহিনীর পরিচালিকা হয়ে সুধীরা যখন তাঁর ঘরে এসে ঢুকত স্নেহে আর আনন্দে তাঁর চোখের তারা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠত । জনে জনে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন আর থুঁতি ধরে চুমো দিচ্ছেন । কলাপাতায় করে সকলকে প্রসাদ দিচ্ছেন । মেয়েরা যখন আবার স্কুলে ফিরে আসত মায়ের গল্প আর তাদের ফুরাতে চাইত না ।

নিবেদিতার স্কুল ছিল অতি গরিব স্কুল । গরিবের পাড়া, গরিব মেয়েরা স্কুলে আসে সাহায্যপ্রার্থিনী হয়ে, নিবেদিতা তাদের সকলকেই কাজ দিতেন । জামা সেলাই করতে দিতেন, তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য । কাপড় নিবেদিতাই দিতেন, যে যেটি সেলাই করত সে সেটি বাড়ি নিয়ে যেত । নিবেদিতা জামা কেটে দিতেন আবার টেঁকেও দিতেন । টেঁকে দেওয়ার পর জামা সেলাই হয়ে গেলে সূতাগুলি আবার সযত্নে খুলে নিয়ে গুছিয়ে রাখতে হত অন্য জামা টাকতে ব্যবহার করা হবে বলে । একগাছি সূতাও যেন না হারায় সে দিকে নিবেদিতার কঠোর নির্দেশ ছিল । সুধীরা আর ক্রিস্টিনার এই নিয়ে একদিন কথা হল, সন্ন্যাসিনীর আবার এতো ঘর গেরস্থালী কেন ? ক্রিস্টিনা একদিন সাহস করে নিবেদিতাকে বললেন : "সুধীরা বলে যে, সন্ন্যাসিনীরা ত্যাগী, সামান্য সুতোর সম্বন্ধে তাদের এতো মনোযোগ দেওয়া ঠিক নয় ।" নিবেদিতা বললেন : "না, না, সুধীরা কখনই এরূপ কথা বলিতে পারিবে না, সুধীরাকে এরূপ কথা বলিতে দিবে না । সূতাগুলি গুছিয়ে রাখা তো পূজারই কাজ ।"

তারপর এল কঠোরতম আঘাত, মায়ের দেহত্যাগ । নিবেদিতা স্বামীজীর অন্তর্ধানের পর আর বেশিদিন রইলেন না । সুধীরার উপরেই শিক্ষালয়ের ভার ন্যস্ত হল । সুধীরার বড় ভাই দেবব্রত সন্ন্যাসগ্রহণ করে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে খ্যাত হয়েছিলেন । দুই ভাইবোন ছিলেন যেন এক বোঁটায় দুটি ফুল । একই আদর্শ ধরে তাঁরা জীবনতপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন । তিনিও ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন । এরপর সুধীরা আরও একটি আঘাত পেলেন শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনীর মৃত্যুতে । সুধীরা আমাকে বলেছিলেন : "দাদা চলে গেলে যে শোক পেয়েছি তার চেয়েও বেশি মর্মান্তিক হয়েছে বেচারি মীনুর এইভাবে চলে যাওয়া । " মৃণালিনী ছিলেন সুধীরার প্রিয়সখী ।

সুধীরা প্রতিদিনই মায়ের রোগশয্যার পার্শ্বে থাকতেন, শেষের কয়েকদিন নিবেদিতা স্কুলের মেয়েরাও তাঁর সঙ্গে মায়ের বাড়িতে যাতায়াত করত ।

এইসব মেয়েরা তাঁর কত ভালবাসার পাত্রী ছিল কথায় বলে তা বুঝানো সম্ভব নয় ।... একটি মেয়ে অসুস্থ হয়েছিল, সুধীরা প্রতিদিন তাকে নিজের হাতে তেল মাখানো, তার জন্য গরুদোয়া কবোষ্ণ দুধ আনা প্রভৃতি কতরকম শুশ্রূষা করেছেন, এমনকি সব কাজ ফেলে অধিকাংশ সময় তারই কাছে থাকতেন ।...

সকলকে নিয়ে যখন সুধীরা শেষবার কাশী যান আমিও সেই দলের সঙ্গে ছিলাম । সুধীরা আমাকে গুরুজনের মতোই মান্য করতেন এবং একান্ত আপনার জন বলে অনেক সময় আবদার করতেন । আর ছিলেন তাঁর পিতৃতুল্য স্বামী সারদানন্দ । স্বামী সারদানন্দ তাঁকে সন্তানের অধিক স্নেহ করতেন এবং শুধু স্নেহ নয়

শ্রদ্ধাও করতেন ।

সুধীরা কাশী গিয়ে যে-বাড়িতে ছিলেন সেটি কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ি । মনের আনন্দে দিন চলে যাচ্ছিল, মধ্যে চন্দ্রগ্রহণের উপবাস ও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে সকলে গঙ্গাস্নান, দেবালয়ে গিয়ে দর্শন— এইসব নিয়ে মেয়েদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা ছিল না । তারপর বৃন্দাবন যাওয়ার কথা ঠিক হয়ে গেল । বৃন্দাবন দর্শন করে ফিরবার পথে কাশীর কাছাকাছি এসে সুধীরা গাড়ি থেকে পড়ে গেলেন । দরজাগুলি তখন বাহিরের দিকে খুলত, হঠাৎ দরজা খুলে গিয়েছিল এবং সুধীরাও সেইসঙ্গে চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত লেগে অজ্ঞান হয়ে যান । আর তাঁর জ্ঞান হয়নি ।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এরপর বলেছিলেন : "মা সারদা নিজেই সুধীরাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন তাই সুধীরার কোনও কষ্টই অনুভব করতে হয়নি । যেন মায়ের কোলে উঠেই অমরধামে চলে গিয়েছেন ।"

সুধীরার অভাবে নিবেদিতা বিদ্যালয় যেন হালভাঙ্গা নৌকার মতো অবস্থায় পড়ল । সেই নিবেদিতা বিদ্যালয় মায়ের কৃপায় আজ সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়েছে, অমরধামবাসিনী দেবী সুধীরা এতে কি আনন্দিতা হবেন না ? নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সঙ্গে নিবেদিতার নাম এক হয়ে আছে, আর সুধীরার কর্ম- তপস্যাও যে এই মহান বিদ্যালয় গঠনে কতখানি সহায়ক চিরদিনই তা বিদ্যালয়ের যাঁরা অনুরাগী তাঁদের মনে মুদ্রিত হয়ে থাকবে ।

নির্ঝরিণী সরকার

আমি যখন প্রথম স্কুলে যোগদান করি, তখন সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে ছিলেন না । আমি তাঁকে তখনও দেখিনি, স্কুলের ভার ছিল সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানার উপর । যতদিন নিবেদিতা আসেননি, ক্রিশ্চিয়ানা আমাদের ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়ের ক্লাস নিতেন । তিনি এতো মাধুর্যময়ী ছিলেন যে, যখন আমাদের পড়াতেন তখন আমরা তাঁকে শিক্ষক বা গুরুর চেয়ে বন্ধু বলেই বেশি মনে করতাম, যেন তিনি আমাদের কত আপনজন । তাঁকে আমাদের একটুও ভয় হত না, তাঁর কাছে আমরা পড়বার সময় ভুল করলে তাঁর সেই ক্ষমাপূর্ণ সস্নেহ হাসি এখনও মনে হয় । ক্রিশ্চিয়ানা আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর নিবেদিতা অনেকবার আমাদের কাছে তাঁর দৃঢ়তা, নিয়মানুবর্তিতা, সাহস ও পাণ্ডিত্যের কথা বলেছেন, যা শুনে আশ্চর্য হতে হয় ।

নিবেদিতাকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে । সিস্টার সেইদিনই ফিরে এসেছেন । অল্পদিনের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারে নিবেদিতা আমাদের জীবনস্বরূপ হয়ে পড়লেন, তাঁকে আমাদের কী যে ভাল লাগত, তিনি কখন আমাদের কাছে আসবেন ও কিছু বলবেন সেইজন্য আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতাম । তাঁর কোনও প্রয়োজনে লাগলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না ।...

গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও প্রণামের উপর সিস্টার অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন । স্কুলের ছুটির পর বাড়ি যাওয়ার আগে আমাদের প্রত্যেককে তিনি নমস্কার করাতেন । একবার আমাদের ক্লাসে দুটি মাদ্রাজী মেয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ।... মেয়ে দুটি প্রথম দিনে ছুটির পর নমস্কার না করেই চলে যাচ্ছিল । সিস্টার তখনই আবার তাদের ফিরিয়ে নমস্কার করিয়ে তবে ছুটি দিলেন । আমাদের পূর্বকালের হিন্দুরমণীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, ভক্তি, সেবাপরায়ণতা, আশ্রিত-বৎসলতা ও সরলতা যেন আমরা কখনও হারিয়ে না ফেলি, সেজন্য বারবার আমাদের বলতেন । তিনি বলতেন আমাদের পূর্বপিতামহীদের অনেকে বহু পরিজনের মধ্যে সংসারের সেবাকার্যের ভিতরে ডুবে থেকেও অনায়াসে এতো উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছিলেন, যা তপস্যা দ্বারাও সম্ভব হয় না ।...

[সময়কাল : ১৯২২—১৯৪৪]

সুষমা বিশ্বাস

আমি যখন নিবেদিতা বিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হলাম, তখন আমার বয়স আট বছর । তখন প্রথম, দ্বিতীয় এরকম কোনও শ্রেণী ছিল না । বাংলা পাঠ্যবইয়ের নামানুসারে শ্রেণীর নামকরণ ছিল । যেমন, কথামালা, শিশুবোধ, সীতার বনবাস ইত্যাদি । পরে বছরে বছরে একটি করে ক্লাস বাড়তে লাগল ।

বিদ্যালয় ভবনটির স্থাপত্য-শিল্প দেখে অভিভূত হয়ে যেতে হয় । প্রথমেই গেটের দুইধারে পাথরে খোদাই করা গঙ্গা-যমুনার মূর্তির সৌন্দর্য অপূর্ব । সেই গেটের পাশে ছোট্ট একটি টুলে বসে আছে একমাত্র পুরুষ কর্মচারী দারোয়ানজী । দুই পাশে দুইটি ঘরে কিছু চেয়ার-টেবিল সাজানো । এই দুইটি ঘরে ছাত্রীদের অভিভাবকগণ মাসে দুবার করে এসে ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন ।

বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে বাঁদিকে বড় ঠাকুরদালান । মাঝখানে শ্রীশ্রীমায়ের বিশাল ফটো । ডানপাশে সিস্টার নিবেদিতার প্রকাণ্ড একখানা ফটো, বাঁপাশে সিস্টার ক্রিস্টিনের একখানা ফটো টাঙ্গানো ছিল । মেঝেটা ঘন সবুজ । চারপাশে লাল বর্ডার । ভারি সুন্দর । মনে হত যেন গালচে পাতা রয়েছে । সেইখানে বিদ্যালয় বসার আগে প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া হত ।

দোতলায় লাইব্রেরি ছিল । খুব সুন্দর । কত যে মূল্যবান বই ছিল, তার ইয়ত্তা নেই । একটি চমৎকার ভূগোলের ঘর ছিল । বিশাল ঘরের মেঝেতে একটি বিরাট সৌরমণ্ডলের গ্লোব ছিল । সৌরমণ্ডলের মাঝখানে লাল রঙের বড় বল লাগানো । ওই গ্লোবটির মধ্যে সব গ্রহ-উপগ্রহ লাগানো আছে । ইলেকট্রিকের সাহায্যে সবগুলি ঘুরত । এর সাহায্যে খুব সহজেই দিনরাত্রি— সব ঋতুর আবর্তন ভালভাবে বোঝা যেত । এটি সিস্টার

নিবেদিতা বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন । অপর একটি ঘরে তাঁত, চরকা, টাকু, উল ও নানান রকমের সেলাই শেখানোর ব্যবস্থা ছিল । বাগবাজার অঞ্চলের বয়স্কা মহিলারা দুপুরবেলা এসে শিখতেন । ছোট্ট একটি ঘরে গান-বাজনা শেখার ক্লাস হত । নানারকমের বাদ্যযন্ত্র ছিল । শিক্ষিকা মোহিনী সেনের নাম তখনকার দিনে কে না জানত ? তাছাড়া অন্যসব ঘরে পঞ্চম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস হত ।

এরপর তিনতলা । তিনতলার পূর্বদিকে ঠাকুরঘর । অন্যপাশে ছাদ । সেখানে নানারকমের ফুল গাছ টবে লাগানো ছিল । আমরা পালা অনুসারে গাছ পরিষ্কার করা, জল দেওয়া, সার দেওয়া এইসব কাজ করতাম । তারপর মেয়েদের শোবার ঘরগুলি ছিল । এইসব ঘরের শেষপ্রান্তে হোস্টেলের প্রধানাদের থাকার জায়গা ছিল । সেই ঘরে সিস্টারের একটি ক্যাম্পখাট ছিল । তাছাড়া ঘরে খুব বড় একখানা গ্রুপ ফটো ছিল । তাতে সিস্টার নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিস্টিন, সুধীরা মাসীমা, প্রফুল্ল মাসীমা, সরলা মাসীমা, গিরিবালা মাসীমা, নরেশনন্দিনীদি, মীরাদি, বাণীদি ও তৎকালীন আরও অনেকের ছবি ছিল ।

বিদ্যালয়ের একটি ঘরে খাতা, কলম, ম্যাপ, নিব, জে. বি. দত্তের কালির বড়ি, দোয়াত, ফণীভূষণের পেনসিল, রবার ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যেত । পরের ঘরখানায় এক জার্মান মহিলা থাকতেন । নাম লিজা ব্রাউন । আমরা তাঁকে রমাদি বলে ডাকতাম । ইনি আমাদের ভোরবেলায় ছাদে নিয়ে নানারকম ড্রিল শেখাতেন ও পরে বেলায় স্কুলে ড্রিল শেখাতেন । উনি ভাত-রুটি খেতেন । ওঁর ঘরে আমরা লজেন্স, বিস্কুট, চকোলেট খাওয়ার লোভে প্রায়ই যেতাম । উনি খুব আনন্দ করে আমাদের খেতে দিতেন । ইনি শরৎ মহারাজের শিষ্যা ছিলেন ।

প্রতিদিন ঠিক সময়ে ঠাকুরের মঙ্গলারতি হত । প্রথমে ঠাকুরের স্তব-গান গাওয়া হত । তারপর হত গঙ্গার স্তব । ব্রহ্মসঙ্গীতও গাওয়া হত । প্রত্যেক একাদশীতে হত 'রামনাম-সঙ্কীর্তন' । মঙ্গলারতির পর প্রত্যেককে মিছরি ও মাখন প্রসাদ দেওয়া হত ।

যাদের রান্না করার পালা থাকত (ছয়জন করে— বড় চারজন, ছোট দুজন) তারাই টিফিনে হালুয়া তৈরি করত । এই হালুয়া টিফিন নিয়ে খুব হাসি-মস্করা হত । এক-এক দলের হাত দিয়ে এক একরকম হালুয়া তৈরি হত । কখনও বেশি ভাজা হয়ে ঝুরঝুরে, কখনও আঠালো ল্যাতপেতে, কখনও মোটামুটি চলনসই হত । কিন্তু সবাই মিলে হৈ চৈ করে ঐ জিনিসই খেতে ভাল লাগত । শনি-রবি দুদিন স্কুল ছুটি থাকত । সেইসময় এক এক সপ্তাহে এক একরকম টিফিন দেওয়া হত । আবার তারই মধ্যে পড়াশুনা চলত । বড় তিনজন ও ছোট একজন সব রান্নাই রাঁধত । আবার বড় একজন ও ছোট একজন নিরামিষ রান্না করত বিধবাদের জন্য । ভাতের প্রকাণ্ড হাঁড়ির মুখে গামছা বেঁধে হেঁইও হেঁইও বলে হাঁড়ি মাটিতে চারজনে মিলে নামানো হত । তারপর টানতে টানতে নালির ধারে নিয়ে গিয়ে উপুড় করে ফেলা হত । সেও খুব হাসাহাসির বিষয় ছিল । তারপরে ঠিক সাড়ে নয়টায় সবাই এসে খেতে বসত । খাবার আগে চারজন মিলে জায়গা করে রেখে যেত । যার যার থালা গ্লাসে সে সে বসে পড়ত । চারজনে পরিবেশন করত । ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ খাওয়া হত ।

ছুটির দিনে অনেক বাড়তি কাজ করতে হত । যেমন কাউকে কাউকে দরজা জানালা ঝাড়া, দরজার গায়ে পিতলের গোল গোল গুলটি, দরজার পিতলের হ্যান্ডেল (হাতি, ঘোড়ার মুখ) গুলি ব্রাসো দিয়ে পরিষ্কার করতে হত । কারণ গণ্যমান্য অতিথিরা প্রায়ই আসতেন স্কুল দেখতে । তাছাড়া বড়ি দেওয়া, আচার করা, পিঠে তৈরি করা ইত্যাদিও করতে হত । নিজেদের কাপড়-চোপড় কাচা, থালাবাসন মাজা, মাছ কাটা এই সমস্ত কাজও করতে হত । তাতে কিন্তু আমরা মোটেই দুঃখিত হতাম না, বরঞ্চ খুব খুশি মনেই সব কাজ সমাধা করতাম । নিজের মায়ের কাছে এসব কিন্তু কিছু শিখিনি । সবই স্কুলের হোস্টেল থেকেই শিখেছি ।

একবার ঠাকুরদালানে স্বামীজীর শিষ্যা মিস ম্যাকলাউড এসেছিলেন । বৃদ্ধা মহিলা, কিন্তু অপূর্ব তাঁর শ্রী । তিনি বেলুড় মঠে গেস্টহাউসে থাকতেন । আর মেয়েদের কাছে তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে নানান গল্প বলেছিলেন ।

আগে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব স্কুলে হত । মঠে হত না । পৌষ মাস পড়লেই বাগবাজার অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে সাড়া পড়ে যেত । বৃদ্ধা মহিলারা অতশত বুঝতেন না । ওঁরা এসে খালি জিজ্ঞাসা করতেন : "হ্যাঁগা, তোমাদের এখানে মচ্ছব কবে হবে গা ?" মায়ের উৎসব 'মচ্ছবে' পরিণত হয়েছিল বাগবাজারি ভাষায় । উৎসবের দিন খুব ভোরে উঠে, স্নান সেরে সবাই মিলে পূজার আয়োজনে মেতে উঠত । পূজা-পার্বণ, ভোগ-রান্না এবং সবাইকে প্রসাদ বিতরণ সবই মহিলারা করতেন । প্রধান পূজারিণী ছিলেন ছেনুদি (মৈত্রেয়ী বসু), তন্ত্রধারিকা ছিলেন হোস্টেল-প্রধানা মীরাদি । বিরাট বিরাট হাণ্ডায় খিচুড়ি, বাঁধাকপির তরকারি, চাটনি ইত্যাদি আমরা সবাই মিলে রান্না করতাম । ছাদে সামিয়ানা খাটিয়ে খাওয়ানো হত । এই উপলক্ষে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ, স্কুলের সেক্রেটারী স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজ (সত্যেন মহারাজ) আসতেনই । পরে লোক অনেক বেশি হতে লাগল । স্কুলে স্থান-সঙ্কুলান করা মুশকিল হল । সেইজন্য মায়ের উৎসব স্কুল হতে সরিয়ে বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়া হল ।

সরস্বতীপূজাও সাড়ম্বরে ঠাকুরদালানেই হত । আগের দিন রাত্রে ঠাকুর সাজানো হত । আলপনা দেওয়া হত । মস্ত একখানা কাঠের জলচৌকির (আলপনা আঁকা) উপরে প্রতিমা বসান হত । মেয়েরা সবাই বাসন্তী রঙের শাড়ি, ব্লাউজ, ফ্রক পড়ে আসত । শিউলি ফুলের বোঁটা শুকিয়ে রাখা হত, আর তাই দিয়ে সব কাপড় ছোপান হত । সে এক পরমানন্দের ব্যাপার ছিল । তারপর দলে দলে ঠাকুরদালানে গিয়ে অঞ্জলি দেওয়া হত । অনেকসময় অঞ্জলির পর গান-বাজনার আসর বসত । রেবা সোম, বাসন্তীদি (বেলু), মুক্তকেশী, যূথিকা, মোহিনীদি— এঁরা সব গান

গাইতেন । বিন্দুর ছেলে, জনা, মেবারপতন, শিবাজী— এই সমস্ত নাটক এক এক বছর হত । আমরা সবাই মিলে করতাম । এতে কোনও আড়ম্বর ছিল না ।

শিবরাত্রির দিনও খুব মজা হত । সারাদিন মেয়েরা উপোস করে থাকত । দারোয়ানজী গঙ্গার মাটি এনে দিত । সারা দুপুর ধরে প্রত্যেকে যার যার শিবমূর্তি গড়ে নিত । তার আগে মাটি বাছা, পূজার আয়োজন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজ করে রাখতে হত । বিকালবেলা সবাই মিলে দল বেঁধে গঙ্গাস্নানে যাওয়া হত । সন্ধ্যার সময় প্রথমে ছোটরা একসঙ্গে চারবার শিবের পূজা করে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমোতে যেত । তারপর বড়রা দল বেঁধে সারি সারি পূজায় বসত । এক-এক প্রহরে একটি করে শিবঠাকুর নিয়ে চার প্রহরে চারটি শিবপূজা হত । মাঝখানের অর্থাৎ এক-এক প্রহরের মধ্যে ফাঁকা সময়টুকু গান-বাজনা, নানারকম হাসি-তামাশায় কাটানো হত । সারা রাত্রি জেগে পূজা হত । পরের দিন যার যার শিব সঙ্গে নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে, স্নান করে ফিরে আসা হত । তখন আমরা সবাই খাওয়া-দাওয়া করতাম ।

বৈশাখ মাসে প্রতিদিন সকালবেলা স্কুল হত । আর প্রতিদিন প্রত্যেক মেয়েকেই শিবপূজা করতে হত । তখন আমরা রাত থাকতে উঠতাম । এরপরেই গরমের ছুটি পড়ত ও আমরা যার যার বাড়ি যেতাম । বহুদিন পরে বাবা মা ও দাদাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব আনন্দে দিন কাটাতাম ।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে থাকাকালীন আমরা অনেক মহাপুরুষ ও বিদুষী মহিলার দর্শন লাভ করেছি । এইসময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে সারা ভারত জুড়ে একটি রচনা প্রতিযোগিতা হয় । বাংলা ভাষায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম, অবশ্য আমার বড় ভাইয়ের উৎসাহ ও সাহায্যই আমাকে প্রথম স্থান লাভে সাহায্য করেছিল । আমি অনেক পুরস্কার পেয়েছিলাম । আমাদের প্রধানা শিক্ষিকা তাপস বালা চট্টোপাধ্যায় আমাকে এ্যালবার্ট হলে নিয়ে গিয়েছিলেন । সেখানে দেশপ্রেমিক সরোজিনী নাইডু, স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্বামী পরমানন্দ, অখিলানন্দ, অনুরূপা দেবী ইত্যাদি আরও অনেক শ্রদ্ধেয় জনের দর্শন পাই । তাছাড়া স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ), স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদদের পদধূলি নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল । দেখতে দেখতে স্কুলের নয় বছর কেটে গেল । ক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে উঠলাম । সামনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা এসে গেল । পরীক্ষা দিয়ে চিরদিনের মতো এই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হল, কিন্তু মনে রইল এর সুখময় স্মৃতি । যতদিন বাঁচব ততদিন এই বিদ্যালয়ের কথা ভুলব না । জীবনে যা কিছু শিখেছি সবই এখানে ।

প্রব্রাজিকা শ্রুতিপ্রাণা

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেই অভিভূত হয়েছিলাম, এ কোথায় এসেছি ! এ যে দেবভূমি— শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদধন্য, ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র এই বিদ্যাস্থানকে মন্দির ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি । বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম এর শিল্প সুষমা দেখে । যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু সুন্দর, তার মধ্যেই তো আনন্দের অভিব্যক্তি । বিদ্যালয়টি যেন আনন্দ-নিকেতন । বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাসের শাসন-শৃঙ্খলা, বিধি-নিয়ম সবই আমি

প্রব্রাজিকা শ্রুতিপ্রাণামাতাজী

নূতন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম । সম্প্রসারিত হল আমার দৃষ্টিভঙ্গি । কঠোর শাসনের অন্তরালে মধুর স্নেহসিক্ত অন্তরের পরিচয় আমি সেই বয়সেই অনুভব করেছিলাম, যাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় ছিলাম তাঁরাই আমাকে দিয়েছিলেন ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম সর্বোচ্চ পথে চলবার অনুপ্রেরণা । বিনম্রচিত্তে আজ তাঁদের স্মরণ করি ।

বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী পূজ্যপাদ স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজ উদ্বোধন থেকে মাঝে মাঝে এসে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনকাহিনী আমাদের শোনাতেন । প্রত্যেকটি কাজ যে মায়ের পূজা— মনে এই ভাবটি দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করেছিলেন । মহৎ জীবনের সান্নিধ্যে এসে চরিত্রগঠনের দুর্লভ সুযোগ লাভ, সে তো এই বিদ্যালয়ে এসেছিলাম বলে ।

আমরা পঁচিশ জন ছাত্রী ছিলাম । বিজলীদি (বিদ্যাপ্রাণা), কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের বোন হেলেন (আশা চট্টোপাধ্যায়), সুলেখক তামসরঞ্জন রায়ের বোন সুষমা রায় ও আরও অনেকে ।

এখানেই প্রখ্যাত দার্শনিক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বড়

শোনার সুযোগ হয়েছিল। এখান থেকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখেছিলাম পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে কমলা নেহরুকে। বিদ্যালয়ের পরিচালিকা শ্রদ্ধেয়া মীরাদি ও বাণীদির সস্নেহ অভিভাবকত্বে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ দর্শন করে দুর্গম সেই তীর্থে যাত্রায় অমেয় আনন্দ আজ নূতন করে আস্বাদন করছি।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মমহাসম্মেলনে পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বক্তৃতা শুনেছিলাম। দেখেছিলাম বিরাট শোভাযাত্রা, বিপুল জনসমাবেশ। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে মকর সংক্রান্তির প্রভাতে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবনির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠার পরম লগ্নে উপস্থিত থাকার পুণ্যস্মৃতি আজও রোমাঞ্চ জাগায়।

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে আমরা এই বিদ্যালয় থেকে ১৬ জন পরীক্ষা দিয়ে সকলেই কৃতকার্য হয়েছিলাম। কয়েক বছর পরে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ের আশ্রম বিভাগে যোগদান করে শিক্ষিকাপদে নিযুক্ত হয়েছিলাম। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে যুগাচার্য স্বামীজী পরিকল্পিত শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হলে সেই বছরেই মঠে চলে আসি।

বীণাপাণি বসুরায়

১১ নভেম্বর, ১৯৩৯— আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজের চিঠি নিয়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন দুজনে— উষা ও অনিলা। সেদিন ছিল রবিবার। নিষ্ফলা রবিবারকে শুদ্ধ করে নেবার জন্য মহারাজের নির্দেশে আমরা উদ্বোধন-এ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলাম। এখন যেখানে ভারতবর্ষের মানচিত্র— সেখানে মহারাজ বসেছিলেন, আর ছিলেন মাসীমা (মীরা দেবী) ও বাণীদি। নূতন পরিবেশে নিজেকে ঠিকমত মানিয়ে নেবার দুশ্চিন্তা আর শিক্ষিকা হবার ছেলেবেলার স্বপ্ন সত্য হবার সূচনায় আনন্দ— এই দুই অনুভূতি সেদিন আমাকে একেবারে নির্বাক করে দিয়েছিল। সকলকে প্রণাম করেছিলাম আর প্রার্থনা জানিয়েছিলাম মনে মনে অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

আজ মনে পড়ছে সকলের কথা— যাঁরা সেদিন আমার সকল ভয় কাটিয়ে দিয়ে নিজের করে নিয়েছিলেন— স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে— নির্মলাদি, কমলাদি, বেণুদি, পাখিদি, উষা, অনিলা, বিজলী— আর সবার উপরে মায়ের মতো ছিলেন মাসীমা ও বাণীদি— সকলের ভক্তি-ভালবাসা আপনা থেকে যাঁদের দিকে বর্ষিত হত। মাসীমা ও বাণীদি আজ আর আমাদের পৃথিবীতে নেই

মেয়েদের ভালবেসেছি— তাদের ভালবাসা পেয়েছি— চেষ্টা করেছি সাহায্য করতে এগিয়ে যাবার পথে। যতটুকু দেবার সবটুকু হয়তো দিতে পারিনি— তবু চেষ্টা করেছি— এই আমার সান্ত্বনা।

মাসীমা, বাণীদির পরে যাঁরা বিদ্যালয়ের কর্ণধার হয়েছেন— শ্রদ্ধেয়া রেণুদি, আশাদি, লক্ষ্মীদি, সুশ্রী, কল্পলতা, স্বরূপপ্রাণা— সকলকেই শ্রদ্ধা ভালবাসার সঙ্গে মনে রেখেছি— এবং রাখব। আর মনে রেখেছি— আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মিণীদের— ছোট-বড় সকলকে— তাদের নাম নাইবা লিখে জানালাম! আর আমার স্নেহের ছাত্রীরা— মধ্যে মধ্যে নাম ভুলে গেলেও তারা আমায় ভুল বুঝবে না— তারা আমার স্মরণে থাকবে।

ইন্দিরা গুহ

সুধীরা দেবীর প্রয়াণের পর শ্রীযুক্তা চপলা দেবী ও শ্রীযুক্তা মীরা দেবী যুগ্মভাবে স্কুল ও মাতৃমন্দির পরিচালনা করতেন। বাগবাজারের মতো অনগ্রসর পল্লীতে মেয়ে যোগাড় করে একটি নিয়মমাফিক স্কুল সংগঠন ও পরিচালনা করা সোজা ছিল না। কারণ তখনও অল্পবয়সে সামান্য লেখাপড়া শিখলেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত।

স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের জন্য সুধীরা দেবীকৃত স্বতন্ত্র শিক্ষণ পদ্ধতি ও সিলেবাস ছিল। সুধীরা দেবী অল্পসময়ের মধ্যে মেয়েদের অক্ষর পরিচিতির এক অভিনব পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। প্রতিষ্ঠানের ত্যাগী কর্মীদের সযত্নে শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠ দেওয়া হত। ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী গ্রহণ নিবেদিতা সমর্থন করতেন না। সেইজন্য শিক্ষাকর্মিগণ নিজেরা পড়াশোনা করে নিজেদের ছাত্রীদের পাঠ দেবার উপযোগী করে তুলতেন। কখনও কখনও বড় মেয়েদের ছোটদের ক্লাস নিতে পাঠানো হত। অতি যত্ন ও সুশৃঙ্খলার সঙ্গে নীচের ক্লাস থেকে ওপরের ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হত। মীরা দেবী ও বাণী দেবী প্রতিদিন প্রতিটি ক্লাস ঘুরে ঘুরে দেখতেন— ঠিকমত পড়াশোনা হচ্ছে কিনা। মীরা দেবী বাংলা ও সংস্কৃত এবং বাণী দেবী ইংরেজী পড়াতেন। আমি তাঁদের অধীনে পড়াশোনা করেছি। আমরা অনেকে অষ্টম শ্রেণীতেই সহজ শুদ্ধ ইংরেজীতে বাক্যরচনা করতে ও গল্প লিখতে পারতাম এবং বিশুদ্ধ বাংলায় অথবা ছোট ছোট সংস্কৃত বাক্য সাজিয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারতাম। তাঁরা দুজনেই দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াতেন। সেভাবে পড়ানোর তুলনা আমি আজও দেখি না। আমি পরবর্তী কালে B.T./B.Ed বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলাম। সেই কোর্সে শিক্ষয়িত্রীর ট্রেনিং দিতে গিয়ে বুঝলাম যে, মীরা দেবী ও বাণী দেবী শিক্ষণ-বিষয়ক মোটা মোটা বই না পড়েই, সঠিক লাইনে শিক্ষা দিতেন। আমাদের সিলেবাসে তৃতীয় শ্রেণী থেকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হত এবং সেইসঙ্গে বাংলা ও ইংরেজী ছিলই। এছাড়া শ্রেণী উপযোগী অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল বিষয়ে পাঠ দেওয়া হত। রামায়ণ, মহাভারত এবং জাতকের গল্প নিয়মিত পড়ানো হত। সহজে প্রাথমিক সংস্কৃত শেখার জন্য মীরা দেবী লেখেন 'কিশলয়' নামে পুস্তিকা। এই বই থেকে প্রাথমিক পাঠ নেবার পর পরবর্তী

পর্যায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়া এবং বোঝা অনেক সহজ হত । ঐ পুস্তিকার 'কিশলয়' নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া । তিনি নিজে ঐ বইটি পড়েই ঐ নাম দেন ।

আবাসিকদের জন্য আঁকা ও আলপনা শিক্ষার বিশেষ ক্লাস হত । আমি যখন আবাসিক ছাত্রী ছিলাম (১৯৩২-১৯৩৯) তখন শান্তিনিকেতনের শ্রীনন্দলাল বসুর ছাত্রী শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষ (Fine arts-এর শিক্ষিকা ছিলেন) নিয়মিত বিনা পারিশ্রমিকে আমাদের আঁকা শেখাতেন । কাজকর্ম ও শিক্ষার মধ্যে ছাত্রীরা আনন্দ পেত ও প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠত ।

মুক্তি চট্টোপাধ্যায়

ডিহং নদীর উঁচু পাড়ে চা বাগানের ধারে সেগুনকাঠের বাংলোয় যে দুটি মেয়ে বড় হয়ে উঠছিল তাদের শিক্ষার ভাবনায় ভাবিত হয়ে তাদের মা যোগাযোগ করলেন নিবেদিতা স্কুল ও তৎসংলগ্ন ছাত্রীনিবাসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে । আসাম থেকে চিঠিতে মা কী লিখেছিলেন জানি না । আমরা একদিন শুনলাম আমাদের নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং হাউস-এ ভর্তি করা হবে । এই উপলক্ষে বাবা-মা আমাদের নিয়ে কলকাতায় এলেন ।

কলকাতায় এসে বাবা-মা বোর্ডিং-এর নিয়মাবলী দেখে থালাবাসন, বিছানা, জামাকাপড় সব কিনলেন । আমি বড়, বছর দশেক বয়স, তখনও ফ্রক পরতেই অভ্যস্ত । কিন্তু নিয়মাবলীতে শাড়ির কথাই শুধু লেখা ছিল । তাই আমার জন্য শাড়ি কেনা হল । ছোট বোন দীপ্তি মাত্র আট বছরের— ও কী করে শাড়ি পরবে ? তাই ওর জন্যে নিয়মাবলীতে না থাকলেও ফ্রকই কেনা হল ।

বোর্ডিং-এ যাবার দিনটা কত তারিখ ছিল মনে না থাকলেও আন্দাজ করতে পারি সেদিন ছিল ১৯৩৫ সালের জানুয়ারির ২/৩ তারিখ । দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা-মা আমাদের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ট্যাক্সিতে করে বোর্ডিং হাউস-এ পৌঁছালেন । বাবা 'ভিজিটার্স রুম'-এ অপেক্ষা করতে লাগলেন, মা আমাদের নিয়ে ভিতরে গেলেন । ভিতরে ঢুকে মনে হল কোনও প্রাসাদে প্রবেশ করলুম । দারুণ ঝক্‌ঝকে সবুজ রঙ-এর পালিশ করা বিশাল ঠাকুর দালান । মাঝখানে মস্ত কাঠের কারুকার্য করা সিংহাসনে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি । দুপাশে সিস্টার নিবেদিতা ও সিস্টার ক্রিস্টিনের ফটো । মা কথা বলছিলেন প্রধানা পরিচালিকার সঙ্গে । সমবয়সী কয়েকজন মেয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করতে লাগল । চা-বাগানে আমাদের কোনও সঙ্গী-সাথী ছিল না । এর আগে আমরা কোনও স্কুলেও পড়িনি, তাই সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারলাম না । মা যখন আমাদের রেখে ফিরে গেলেন তখন আমরা দারুণ কান্নাকাটি শুরু করলাম । আজও আমার মনে আছে আমি ঠাকুর দালানে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিলাম । বড় মেয়েরাও আমাদের থামাতে পারছিল না । বিজলিদি আর লীলাদিকে আমাদের দেখাশুনার ভার দেওয়া হল । ওঁরা আমাদের বোর্ডিং-এর সব নিয়ম-কানুন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । স্কুলের ক্লাস শুরু হওয়ার আগে প্রার্থনা হত । বোর্ডার, ডে-স্কলার সবাই একসঙ্গে প্রার্থনা করে যে যার নিজের ক্লাসে চলে যেত । ক্লাসে মাদুর পেতে মেঝেতে বসা হত । সামনে একটা বেঞ্চ থাকত । সেটা ডেস্কের মতো ব্যবহার করা হত । ক্লাসরুমে দেওয়াল জুড়ে বড় ব্ল্যাকবোর্ড এবং টিচারের বসার আসন । মেয়ের সংখ্যা খুব বেশি থাকত না । নীচের ক্লাসে ছাত্রীসংখ্যা বেশি ছিল । যত উপরে উঠত ততই সংখ্যা কমত । ক্লাস ফাইভ-এ মনে হয় জনা তিরিশ মেয়ে ছিল । যখন ক্লাস নাইনে উঠেছি মেয়ের সংখ্যা বারো । স্কুলের একটা বাস ছিল, কিছু মেয়ে বাসে আসত । অনেক বাইরের টিচার স্কুলবাসে আসতেন । সোমবার থেকে শুক্রবার স্কুল হত ।

টিচারেরা আন্তরিকতা ও যত্নের সঙ্গে পড়াতেন । ক্লাস সিক্স-এ বাংলার টিচার ইন্দিরাদি ও জ্যোৎস্নাদিকে আমার খুব ভাল লাগত । এখনও তাঁদের কথা মনে আছে । ক্লাস নাইনে বীণাদি ইংরেজী পড়াতেন । ইংরেজী থার্ড পেপার পড়াতেন মৈত্রেয়ী বসু । উষাদি অঙ্ক করাতেন । একটায় স্কুলের টিফিনের সময় আমরা বোর্ডিং-এ এসে টিফিন খেতাম । স্কুল ছুটি চারটের সময় হত

শুক্রবার সন্ধেবেলা প্রার্থনার পর সবাই লাইব্রেরি রুমে জমা হতাম । এইসময় বই পড়ে শোনান হত । 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' এইসব বই শুনতে শুনতে চোখের জলে বুক ভাসত । সাহিত্য সভার পর খাওয়ার ঘণ্টা । সেইদিন 'স্টাডি' বাদ যেত । শনিবার দুপুরে ড্রইং করা নিয়ম ছিল । শনিবার সন্ধেবেলা মাঝে মাঝে দুটো ঘণ্টা বাজত । এই ঘণ্টায় বুকে কাঁপুনি শুরু হত । ঘণ্টা পড়লে সবাইকে মাসীমার (প্রধানা পরিচালিকার) ঘরে জমা হতে হত । অন্য আশ্রমিকারাও থাকতেন । সে ছিল এক বিচার সভার মতো । সারা সপ্তাহে বোর্ডিং-এ কোনও মেয়ের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে সেটা মাসীমার দপ্তরে রিপোর্ট করা হত । অভিযুক্তের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে এখানে প্রকাশ্যে আলোচনা করে সবার সামনেই তাকে শাস্তি দেওয়া হত । বড়-ছোটর কোনও ভেদ ছিল না । কারুর সম্বন্ধে কোনও ভাল রিপোর্ট থাকলে সেটাও সভায় আলোচনা করে তাকে প্রশংসা করা হত । ক্লাস সেভেন-এ যখন পড়ি, ইন্দিরাদি বাংলা পড়াতেন । তিনি রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি পড়াবার সময় গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র লিখতে দিয়েছিলেন । তিনি আমার খাতাটার সম্পর্কে উচ্চ মন্তব্য করে মাসীমার দপ্তরে জমা দিয়েছিলেন । আমি প্রশংসিত হয়েছিলাম । অবশ্য একবার অদ্ভুতভাবে অভিযুক্ত হয়ে কঠিন বিচারেরও শিকার হয়েছিলাম ।

খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সরস্বতীপূজা হত । উপবাস করে সবাই অঞ্জলি দিতাম । হোম, আরতি ও ভোগের পর স্কুলের ও

বোর্ডিং-এর মেয়েদের একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ানো হত । হালুইকর বড় বড় উনানে রান্না করত । আগের দিন সারারাত পান্তুয়া আর বোঁদে তৈরি হত । মেয়েদের মধ্যে কে বেশি পান্তুয়া খেতে পারে তার প্রতিযোগিতা হত । আমাদের দুবছরের সিনিয়র কল্যাণীদি উনিশটা পান্তুয়া খেয়েছিল । আমি তিন গ্লাস কুলের চাটনি খেয়েছিলাম । একবার জগদ্ধাত্রীপূজা হয়েছিল । স্কুলের সব মেয়েরা এতে যোগ দিয়েছিল । বেলুড় মঠের একজন মহারাজ এসে পূজা করেছিলেন । স্কুলের একটি ছয়-সাত বছরের মেয়েকে কুমারী পূজা করা হয়েছিল । মনে আছে, সূর্যগ্রহণকালে একবার গঙ্গাস্নান করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । ছাদে উঠে টেলিস্কোপে গ্রহণ দেখানো হয়েছিল ।

দু বছর অন্তর স্কুলের প্রাইজ হত । আমি সবসময় ফার্স্ট প্রাইজ,. সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য স্পেশাল প্রাইজ পেতাম । যখন ক্লাস এইটে পড়ি সেইসময় ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর স্বামীজীর শিষ্যা মিস ম্যাকলাউড আমাদের প্রাইজ দিয়েছিলেন । আমার বোন দীপ্তি সেলাই-এ ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল । আমি একবার সেভেন, এইটে প্রথম হওয়ার জন্য স্কলারশিপ পেয়েছিলাম । সব টাকা একসঙ্গেই পাই । ঐ টাকা থেকে আমি স্কুলের ও বোর্ডিং-এর মেয়েদের চানাচুর, মিষ্টি খাইয়েছিলাম ।

আমাদের বোর্ডিং চার্জ লাগত বারো টাকা করে । এছাড়া কিছু হাতখরচের টাকাও বাবা পাঠাতেন । খাতা, পেন্সিল, রবার, কালি, তেল, সাবান, পেস্ট ইত্যাদি কেনার জন্য । বোর্ডিং-এর কমলাদি মেয়েদের টাকার হিসাব রাখতেন । ছুটির সময় যখন বাড়ি যেতাম উনি আমাদের হিসাবের খসড়া দিতেন বাড়িতে দেখাবার জন্য । কিছু দুঃস্থ মেয়ে বোর্ডিং চার্জ ছাড়াই থাকত ।

আমাদের বোর্ডিং-এ শ্রীশ্রীমায়ের ভাইঝি রাধুদি থাকতেন তাঁর মেয়ে নির্মলাকে নিয়ে । নির্মলা আমাদের সমবয়সী । স্কুলে পড়ত । ওকে সবাই নিমি বলে ডাকত । কারও সঙ্গে ঝগড়া হলে নিমি রেগে গিয়ে বলত : "আমি দাদামশাইকে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) বলে দেব ।" এই বলে ধ্যানের ভঙ্গি করে চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসত । নির্মলার চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে ঠাকুরের কোনও এক ভক্তপরিবারে বিয়ে হয়ে যায় ।

নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং থেকে চলে আসার আটান্ন বছর পরে সেদিন নিবেদিতার স্মরণ দিবস উপলক্ষে ৫ নং নিবেদিতা লেনে গেলাম । দেখলাম ভগিনী নিবেদিতার ছবি সুন্দরভাবে ফুলে মালায় সাজানো হয়েছে । ধূপদীপ, আলপনায় সুন্দর পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে । অনেক শ্রদ্ধেয়া প্রব্রাজিকারা নিবেদিতার জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলেন । নিবেদিতার উদ্দেশে রচিত সঙ্গীত মেয়েরা সমবেতকণ্ঠে গাইল । এইসব দেখে গভীর তৃপ্তি ও আনন্দ পেলাম ।

আশা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এ আমরা ভোরে উঠতাম । বিছানা তুলে প্রাত্যহিক কাজের পর ঠাকুরঘরে যেতাম । স্তবপাঠ হত । পরে কিছুটা সময় পঠন-পাঠন । পড়াশোনা ছাড়াও সবার ওপরে, বিশেষ করে বড় মেয়েদের ওপরে অন্যান্য দায়িত্বভার ছিল । যেমন ঠাকুর ঘরের কাজ, পরিবেশন, রান্নায় সাহায্য, রুটিবেলা ইত্যাদি । আমি শেষেরটি পালন করতাম । বাণীদি নিত্যকার তরকারি কেটে দিতেন । বোর্ডিং-এ পালা করে পরিবেশন করতাম । প্রয়োজনে তরকারি কুটতাম । মোচা, লাউ, থোড় কাটায় পারদর্শিনী ছিলাম । রান্নাতেও সুনাম ছিল । মাংস রান্নার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর । পাখিদির সঙ্গে কয়েকবার মায়ের বাড়ির সাধুদের জন্য রান্না করেছি । তখন আমাদের পরিধি অনেক ছোট ছিল, তাই সম্ভব হয়েছিল এ কাজ । দুজনের কথা খুব মনে হয়— যুগলদি ও কিরণদি । তাঁরা সাহায্য করতেন দৈনন্দিন সংসার চালনায়— বাসনমাজা, ঘরঝাঁট, ঘরমোছা, রান্নাঘর পরিষ্কার । নিবেদিতা স্কুলে তাঁদের অবদান কম নয় ।

এই স্কুল থেকেই কতবার বেলুড় মঠে গেছি । নিবেদিতা স্কুলের বড় মেয়েরা ঠাকুরের জন্মতিথি ও অন্যান্য উৎসবে মঠে গিয়ে পরিবেশন করত । আমিও কতবার পরিবেশন করেছি । পূজনীয় সূর্য মহারাজও পরিবেশন করতেন, মনে আছে । তখন নতুন মন্দির তৈরি হয়নি । বেলুড়ে সেইসময় মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করেছি, প্রণাম করেছি, তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি । আমার জীবন তাঁর আশীর্বাদে ধন্য ।

নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রী থাকাকালীন স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ উদ্বোধন-এ গীতার ক্লাস নিতেন । মাসীমা আমাকে সেই ক্লাসে যোগ দেবার সুযোগ দিয়েছিলেন । সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যায় মাসীমা, বাণীদি ও আরও কয়েকজন আমরা গীতার ক্লাসে থাকতাম ।

ইন্দুসুধা ঘোষ

কলাভবনের শিক্ষা সমাপ্ত হলে শ্রীনিকেতন শিল্পবিভাগে শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হলাম মাস্টারমশায়েরই (নন্দলাল বসু) নির্দেশে । সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর একদিন তিনি ডেকে বললেন : "স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজ সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে (বাগবাজার) শিল্পবিভাগ খুলবেন । সেখানকার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী চান । আমার ইচ্ছা তুমি সেখানে গিয়ে কাজের ভার নাও ।"

মাস্টারমশায়ের আগ্রহে ও আদেশে আমি সিস্টার নিবেদিতা স্কুলের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজের কাছে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ১০ নভেম্বর একটি আবেদনপত্র দিয়েছিলাম । তিনি বিদ্যালয়ে আর্ট ও পেন্টিং সেকশন খুলতে চেয়েছিলেন । বিশেষ করে ভারতীয় পদ্ধতিতে ড্রইং ও পেন্টিং শেখাতে হবে— এই ছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ।

এখন ভেবে বিস্মিত হই, আমার মতো একজন সামান্য মেয়ের

জন্য গুরুদেব (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ) স্বয়ং একটি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ২ নভেম্বর, যার কপি সম্ভবত নিবেদিতা স্কুলের পুরোনো ফাইলে আজও সংরক্ষিত ।

পূজনীয় স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজের আগ্রহে আমি নিবেদিতা স্কুলে ড্রইং ও পেন্টিং শেখাবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম, সেই সঙ্গে পেলাম মহারাজের অযাচিত স্নেহ— যা অবিস্মরণীয় ।

প্রথমদিন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলাম— বিদ্যালয় ভবনের গাত্রে বিচিত্র কারুকার্য— সদর দরজা থেকে শুরু করে সর্বত্রই রয়েছে আমার মাস্টারমশায়ের প্রতিভার স্বাক্ষর । বুঝলাম, সিস্টার নিবেদিতার প্রতি শিল্পাচার্য নন্দলালের কী গভীর শ্রদ্ধা । শিল্পীর অনন্য প্রতিভা দিয়ে গড়া নিবেদিতার এই সাধনক্ষেত্র— যা আজ আমাদের সকলের জাতীয় সম্পদ ।

সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন এই পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি বিদ্যালয়ের পরিচালিকা শ্রদ্ধেয়া মীরাদির অক্লান্ত পরিশ্রম । সেইসঙ্গে মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয়া বাণীদিকে, যিনি সকল কাজে মীরাদিকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন । ১৯৩১-১৯৩২-এ অতি অল্প সময় যুক্ত ছিলাম এই বিদ্যায়তনের সঙ্গে । সময়ের রেখা অতি সীমিত কিন্তু ছাত্রীরা আমার সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করে সেই সীমারেখাকে দীর্ঘায়ত করেছে । কী আগ্রহ, উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা উপচে পড়ত তাদের চোখেমুখে— সে কথা মনে করে আজও অভিভূত হই । ভেবে আনন্দ পাই বিজলী (প্রব্রাজিকা বিদ্যাপ্রাণা), রাবেয়ার (প্রব্রাজিকা শ্রুতিপ্রাণা) কথা, যাঁরা পরবর্তী সময়ে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও অধুনা শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী । উষা, নির্মলা, বেদাঙ্গিনী, মৈত্রেয়ী, অরুণা— এই মুখগুলি স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে । 'লেটার মার্কস' পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে কৃতী ছাত্রী হিসাবে বিদ্যালয়ের সুনাম রেখে গেছে উষা, মৈত্রেয়ী ও বেদাঙ্গিনী ।

দীর্ঘদিন কাজ করার সুযোগ হয়নি এই বিদ্যালয়ে । কারণ, তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিলাম । কয়েক বছর বন্দী-জীবন যাপন করতে হয়েছিল । কারাকক্ষ থেকে মুক্তি পেয়ে যেদিন বিদ্যালয়ে ফিরে এলাম, সেদিন মীরাদি বললেন : "ইন্দু, তোমাকে যে তোমার মেয়েরা এতো ভালবাসে— আগে তা বুঝিনি । দু'বছর ধরে বোর্ডে তোমার আঁকা ড্রইং মেয়েরা মুছে ফেলতে দেয়নি ।" শিক্ষকতার জীবনে এর চাইতে বড় পাওয়া আর কী থাকতে পারে ? বিদ্যালয়, শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী— এই তিনে মিলে এক ।

[১৯৪৫—১৯৬৫]

দীপালি রায়

দমদম সাউথ সিঁথি রোডের 'পটেশ্বরী নিলয়' থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিছানাপত্র বেঁধেছেঁদে তেরো বছরের সেই মেয়েটি

বিদ্যালয়ের স্থাপত্যশিল্প

নিবেদিতা স্কুলের আবাসনে এসে হাজির । বাবা আর আমি হাসিমুখে সাদরে গ্রহণ করলেন পরমশ্রদ্ধেয়া তৎকালীন প্রধান শিক্ষিকা । ঋজু, দৃঢ়, বলিষ্ঠ গঠন । স্কুলের উঁচু ক্লাসে ইংরেজী পড়ান । সমগ্র স্কুলের তিনি দক্ষ পরিচালিকা । তিনিই লক্ষ্মীদি পরবর্তী কালে পরমশ্রদ্ধেয়া প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা । আমাকে আদর করে কাছে ডেকে নিলেন । উঁচু ক্লাসের এক দিদিকে ডেকে আমার সমস্ত ভার তার ওপর সঁপে দিলেন । দিদিটির নাম দীপালি মান্না । নবম শ্রেণীর ছাত্রী । নির্দিষ্ট সময়ের পরে বাবাও গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক সাহস দিয়ে বিদায় নিলেন ।

দুচোখে জল ভরে এল । বিস্তীর্ণ অচেনা জগৎ এবং ছোট্ট আমি । বাবা-মা-ভাইবোন কেউই তো এখানে নেই । তখন সন্ধেবেলা । ঠাকুরঘরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল । ইতিমধ্যে দীপালিদির কথামত জামাকাপড় বদলে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়েছি । মস্ত বড় ঠাকুরঘর । বেদীর ওপর যুগসংস্কৃতির তিন ধারার শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি । শ্বেতপাথরের মেঝে । ঋজুদেহী দিদিরা বসে আছেন— প্রশান্তির প্রতিমূর্তি । প্রত্যেকে মুদিতনয়নে জপরতা । আমরাও সার বেঁধে মন্দিরে আরতির সঙ্গে গান ধরলাম : "খণ্ডন-ভববন্দন জগবন্দন বন্দি তোমায় ।" আরতির পরে চলে এলাম 'স্টাডি রুমে' । সামনে বইপত্র রাখার ডেস্ক— জোড়াসনে পড়তে বসলাম

ঘণ্টাদেড়েক পরে ঢং ঢং করে বেজে উঠল খাবার ঘণ্টা । সবাই মিলে দল বেঁধে খাবার দালানে খেতে নেমে গেলাম ।

নৈশভোজনের পর রাতের ঘুম । পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙানোর ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং । শীতের আমেজ তখন সর্বাঙ্গে । এই ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে ভাবতেই কান্না পেতে লাগল । কিন্তু কোনও উপায় নেই । 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ ।' তৎক্ষণাৎ উঠে, বিছানাপত্তর তুলে, জামাকাপড় ছেড়ে আবার সকলে মিলে ঠাকুরঘরে প্রার্থনা সঙ্গীতে গিয়ে বসলাম । ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে বেজে উঠল প্রার্থনা সঙ্গীত : "প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর ।"

তারপর প্রভাতী আলোতে সবাই মিলে শরীরচর্চা, সকালের জলখাবার খাওয়া । আবার পড়তে বসা, স্নান খাওয়া সারা । স্কুল ইউনিফর্ম পরে, লাল ফিতে দিয়ে বো করে চুল বেঁধে, স্কুলের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদালানের সামনের মুক্ত প্রাঙ্গণে সম্মিলিতকণ্ঠে উচ্চারিত হত বেদমন্ত্র : "ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ ।"

শুরু হল ক্লাস— সেই মাটিতে বসে প্রাচীন বৈদিকযুগের অনুকৃতি ! টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই দৌড়াদৌড়ি, খাবার খাওয়া, হাসি-গল্পের হৈ-হুল্লোড় ।

দিদিদের পেয়েছিলাম ঘনিষ্ঠভাবে । শ্রদ্ধেয়া আশাদি ছিলেন সমগ্র স্কুলের সম্পাদিকা । সন্ন্যাসজীবনে তিনি প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা । আমরা ডাকতাম দিদিভাই বলে । গম্ভীর, রাশভারি অথচ ফল্গুধারায় অন্তঃসলিলা স্নেহপ্রবাহিণী । বাইরে থেকে আসতেন অঙ্কের শিক্ষিকা দীর্ঘদেহী আশাদি, ছোটখাট গৌরীদি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সুষমাদি, বাংলার কমলাদি । অসামান্য পড়াতেন এঁরা । অঙ্কের গৌরীদি পরম স্নেহে না বোঝা অঙ্কগুলি বুঝিয়ে দিতেন । অঙ্কে ভীতি আমার বরাবর । গৌরীদির নির্দেশ অনুসরণ করে কোনও রকমে স্কুল ফাইনাল উতরে গিয়েছিলাম । সুষমা চক্রবর্তী প্রখ্যাত কবি নীরেন চক্রবর্তীর স্ত্রী । সুন্দর চেহারা, পরিশীলিত ব্যবহার । ছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সহজ, মধুর । বাংলার প্রতি আমার আকর্ষণ কমলাদির বৈদগ্ধ্যে আকৃষ্ট হয়ে । প্লাবিত নির্ঝরিণীর মতো অনায়াস শৈলীতে উনি পড়িয়ে যেতেন । এখন কমলাদি প্রয়াতা । ওঁর ঝকৃঝকে চোখ দুটি আজও আমার মনে পড়ে । আর মনে পড়ে প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা— আমাদের প্রিয় বাসনাদির কথা । ওঁর সমগ্র মুখমণ্ডলে এক নির্মাল্যের দীপ্তি ছিল । সেদিন বাসনাদির প্রথম ক্লাস । বোর্ডে লিখে দিয়েছেন একটি বাংলা প্যারাগ্রাফ— ওপরে লেখা ট্রানশ্লেট ইনটু স্যান্স্ক্রিট । আমি সেদিকে না তাকিয়ে মহানন্দে লেখাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে নিয়ে গেছি । 'আরে একি করেছ তুমি !!' বাসনাদির বিস্ময়ব্যাকুল প্রশ্ন । 'কেন অনুবাদ করেছি ।' আমি ততোধিক হতচকিত । উনি অঙ্গুলিনির্দেশে ওপরের লেখাটি দেখিয়ে দিলেন । আমার 'ভ্যা' করে কান্না । গিয়েছি শহরতলির স্কুল থেকে । সংস্কৃতের অ-আ, ক-খ জানি না । অথচ ভাল ছাত্রী হিসেবে মনে প্রচ্ছন্ন অহমিকা । অসহায় অশ্রুতে সব গর্ব ধূলিসাৎ ।

না, তেমন কিছু হয়নি । হোস্টেলে ডেকে বাসনাদি পরম সহিষ্ণুতায় শেখালেন অচেনা, অজানা সংস্কৃত । ষান্মাসিক পরীক্ষাতেই পেয়ে গেলাম ৪৫ নম্বর । বার্ষিক পরীক্ষায় তাকে টেনে তোলা হল ৭৮-এ । আমাদের ক্লাসের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী নতি গাঙ্গুলি ও আরতি গোস্বামীরা অবশ্য অনায়াসেই ৮০/৯০ নম্বরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে যেত সংস্কৃতে । সুদর্শনা নতি এখন বেথুন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ।

মনে পড়ে কল্পলতাদির কথা । আর কখনও ভুলব না সেলাই-এর দিদিমণি স্নেহদিকে । ওঁর ক্লাসে ফাঁকি দেবার কোনও উপায় ছিল না । সদা-সতর্ক দৃষ্টি ।

ধীরে ধীরে একাত্ম হয়ে গেলাম রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের সঙ্গে । গভীর আনন্দে কাটছে শৈশব-কৈশোরের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলি ।

এগিয়ে আসছে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা । জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা । পড়ার চাপে আমি তখন রণক্লান্ত সৈনিক । রাত সাড়ে আটটায় 'স্টাডি রুমে'র আলো নিভে যায় । বাথরুমের ভিতর লুকিয়ে চলে পড়ার প্রহসন । একদিন ধরা পড়ে সেকি বকুনি । তখন আর সাতদিনও বাকি নেই পরীক্ষার । সব যোদ্ধাদেরই অবস্থা অসহায় করুণ । মাথায় অঙ্কগুলো গিজগিজ করছে । ইংরেজী সব ভুলে গেছি । ইতিহাস-ভূগোল, সংস্কৃত— কখনও পড়েছি কিনা মনে নেই । হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণ হল— আমাদের সবাইকে লক্ষ্মীদির সঙ্গে সিনেমায় যেতে হবে, আজ দুপুরে । 'অসম্ভব, মাথার ওপর পরীক্ষার খাঁড়া, তার মধ্যে সিনেমা ?' 'যেতেই হবে,' অমোঘ, অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ ।

হলটির নাম মনে নেই । বইটি ছিল 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ ।' সব টেনশন ভুলে হাসির হুল্লোড়ে কেটে গেল তিন ঘণ্টা । হল থেকে বেরিয়ে এসে হোস্টেলে ফেরার পথে মাথা একদম ফাঁকা, পরিষ্কার ।

স্কুল ফাইনালের প্রত্যাশিত সাফল্যে দিদিরা আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন । আশীর্বাদ করলেন সকলে । লক্ষ্মীদি ফোন করলেন লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল ডঃ রমা চৌধুরীকে— 'আমার মেয়েরা যাচ্ছে, ভর্তি করে নিন ।'

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

বাহান্ন সালের পরীক্ষার্থী হিসেবে স্কুলে ঢুকেছিলাম, সারদামন্দিরে থেকেছি একবছর । আমার সৌভাগ্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে সে এক সন্ধিক্ষণ । যে বিরাট ঘটনায় যুক্ত হওয়ার জন্য তখন এই প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্টভাবে প্রস্তুত হচ্ছে সেটি হল চুয়ান্ন সালে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীসারদা মঠের প্রতিষ্ঠা ।

নিবেদিতার স্কুলে একই সময়ে যাঁদের কাছে আমার পড়ার সৌভাগ্য হয় তাঁরা হলেন শ্রীসারদা মঠেরও প্রধান পরিচালক— রেণুদি, আশাদি, লক্ষ্মীদি ।

উৎসব উপলক্ষে অনেকে এসে এখানে থাকতেন । এরকমই এক সুযোগে আমরা কিছুদিন কাছে পেয়েছিলাম শ্রদ্ধেয়া ভারতীপ্রাণামাতাজীকে । তখন তাঁকে 'মাসীমা' বলে ডাকতাম আমরা । ছোটমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে, কথা বলতে, ফোটো তোলার আবদার রাখতে কখনও তাঁকে বিরক্ত হতে দেখিনি । কিন্তু কী কথা বলতেন তিনি, তা আর মনে করতে পারিনা ।

আমার ধারণা স্কুলে ভর্তি হয়ে আমি অনেক গুরুজনকে বিপদে ফেলেছিলাম । অঙ্ক মোটে জানতাম না আমি । তাতে প্রথম ধাক্কা আশাদির (আশা পাল) । জ্যামিতি, বীজগণিত, বা পাটীগণিতের কোনও একটিরও মূল নিয়ম জানা না থাকলে তিনি আমাকে নিয়ে কী করেন ? ফেলতে পারেন না, কারণ অন্যসব বিষয়ের উত্তর ভাল লিখতে পারি । গৃহবিজ্ঞানের সঙ্গে পাটীগণিতও রইল । আমাকে দিয়ে পাশ তো করাতে হবে স্কুলকে । সুতরাং লক্ষ্মীদি গৌরীদিকে বললেন : 'রাত্রে অন্তত কিছুক্ষণ একে অঙ্ক করাও ।' শুরু হল ঐকিক নিয়ম, সরল, প্রশ্নের অঙ্ক প্র্যাকটিস করার পালা । ঘুম চোখে সে যে কি কষ্ট ! মনে হত যারা অঙ্ক শিখে দু'শ নম্বরের উত্তর করে, তাদের ভাল নম্বর তোলা আমার চেয়ে অবশ্যই সহজ । শিশুবয়সে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের পরে আমি যে কোনও অঙ্কই করিনি আমার অভিভাবকরা সেকথা জানতেন না ।

স্কুলে তিনতলায় বোর্ডিং । একটি চমৎকার পাথরের ঘর ও বারান্দা আমাদের দখলে । সকালে স্কুলের আগে বারান্দায় মাদুর পেতে পড়তে বসেছি, গায়ত্রী, রাণুদি, আমি ও আরও কেউ । আমার ভূগোল বইয়ের যে পাতা খোলা, তাতে একটা ছবি— ভূকম্পনমাপার যন্ত্র । লক্ষ্মীদি সামনে দিয়ে গেলেন । অনেকক্ষণ পরে সামনে দিয়েই ফিরলেন, এখনই খাওয়ার ঘণ্টা পড়বে । ফেরার সময় চলতে চলতে বললেন : 'একই পাতা সেই সকাল থেকে খোলা, পড়ছিস না ঘুমোচ্ছিস ?' বলা বাহুল্য যে, এরপরেও আমি খুব দুর্দান্ত পড়ুয়া হয়ে উঠতে পারিনি ।

শীত পড়েছে । স্কুলে গিয়ে শাড়ি পরতে হয় । বোর্ডিং-এর নিয়ম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ভোরবেলা আর সন্ধেবেলা ঠাকুরঘরে ভজন, প্রার্থনায় যোগ দেওয়া । তখন ঠাণ্ডা থাকত । একদিন রেণুদি তাঁর কোণের ঘরে ডেকে পাঠালেন । ভয়ে ভয়ে গিয়ে দেখি তাঁর হাতে ধবধবে সাদা একটি উলের জামা । 'তোমার বোধহয় গরমজামা নেই, এই জামাটা নেবে ?' কেন জিজ্ঞেস করলেন কে জানে । আমি সসঙ্কোচে বলি : 'আমার তো লাগবে না, আমার জামা আছে ।' 'ঠিক তো ?' মাথা হেলাতেই বললেন : 'তাহলে এস ।' এখনও সেই জুঁইফুলের মতো জামাটি চোখের সামনে দেখতে পাই । তার সঙ্গে দেখতে পাই রেণুদির উদ্বিগ্ন মুখ ।

ঘরের কাজের সবরকম ট্রেনিং হল বিজলীদির কাছে । কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারা ছিল দুরূহ কাজ । কয়েকটি মেয়ে খুব সুন্দর কাজ করত— ভারতী, প্রতিমা, নীহার । ওদের কাছে কাজ শিখে আমার রুটিবেলা ক্রমশ ভাল হতে লাগল । আটা মেখে ভিজে কাপড় জড়িয়ে লেচি করে আটা দিয়ে রুটি বেলতে হবে— যেন পূর্ণিমার চাঁদ । সেই রুটি ফুলবে, তবে বিজলীদি খুশি ।

ছিলেন বাসনাদি । তাঁর কাছে আমাদের প্রথম বেদমন্ত্র উচ্চারণ শেখা । তাঁর কাছে শেখা স্তোত্র, গান পরে কলেজে শিখিয়েছি । সংস্কৃতের উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে, দর্শন ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বাসনাদি । বুঝি বা না বুঝি, তাঁর কাছে সংস্কৃত আবৃত্তি শোনা— সে এক বিরল অভিজ্ঞতা ।

লাইব্রেরিতে তখন নিয়মিত সাপ্তাহিক উপনিষদের ক্লাস হত বড়দের জন্য । নীচু বিশাল গোলটেবিল ঘিরে দিদিরা বসতেন । উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করতে আসতেন শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ । অনুমতি নিয়ে বেশ কয়েকবার ওই ক্লাসে আমি বসতে পেরেছি । বসার জন্যে বসা, কিছু বুঝবার বয়েস বা ক্ষমতা কোনটাই ছিল না । কিন্তু এখনও মনে করতে পারি মহারাজের গম্ভীর গলার উচ্চারণ : "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নাস্তীতি চৈকে...।" পরবর্তী কালে তাঁর অনূদিত শাস্ত্রগ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ের তালিকায় পেয়ে বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছিলাম ।

আমাদের স্কুল পরীক্ষা শেষ, সারদামন্দির ছেড়ে চলে যেতে হবে, আমার চোখে জল । কোথায় যাব, কেন যাব, এখান থেকে কি কলেজে পড়া যায় না ? মন আকুল । সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীদি বললেন : "পাখিকে বেশিদিন খাঁচায় আটকে রাখতে নেই । দরজা খুলে দিতে হয় । পৃথিবী অনেক বড়, ঘুরে দেখ, আরও অনেক কিছু আছে । আর এ জায়গা তো, তোমাদের রইলই, যখন খুশি আসবে, থাকবে ।"

গীতা হালদার

কোনও কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে বোর্ডিং-এর মেয়েদের বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়া হত । একবার বাগবাজার গঙ্গার ঘাট থেকে নৌকো করে সবাই মিলে ঠাকুরের গান গাইতে গাইতে গিয়েছিলাম । আর একবার বিশেষ একটি এগজিবিশনে যাওয়া হয়েছিল । সেখানে বিরাট জাহাজ ও ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষামূলক অনেক দেখবার জিনিস ছিল । ছিল রানা প্রতাপ সিং-এর অস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ।

একবার ম্যালেরিয়া রোগের খুব প্রকোপ । আমি তখন বোর্ডিং-এ আছি । ১০৫ ডিগ্রির উপরে জ্বর । সকলে কতই সেবা করেছিল । তখন রেণুদি (প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা) নিজে চিকিৎসক দেখানো এবং চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিলেন । তাঁদের কথা ভুলতে পারি না । পরবর্তী কালে শ্রীসারদা মঠে তাঁর কাছে আমার দীক্ষা হয় ।

মাধ্যমিক বিভাগ

ইয়ের গন্ধে ভরা লাইব্রেরি ঘর

সিস্টার নিবেদিতার লেখার টেবিল

ক্ষয়িত্রীবৃন্দ— মাধ্যমিক বিভাগ

ত্রীদের আলপনা

সূচীশিল্পে অভিনিবেশ

শেখার আনন্দে উজ্জ্বল

প্রাথমিক বিভাগ

শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ— প্রাথমিক বিভাগ

একাগ্রতা— পাঠগ্রহণের প্রথম শর্ত

অভিনয়ে আমরা কি কম !

শিশুদের জন্য চার্ট

শোভাযাত্রায় কলকাতার পথে

পুতুলের জগতে শিশুমন

শিল্পবিভাগ ও ক্রিস্টিন ভবন

শিল্পবিভাগ

শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ— শিল্পবিভাগ

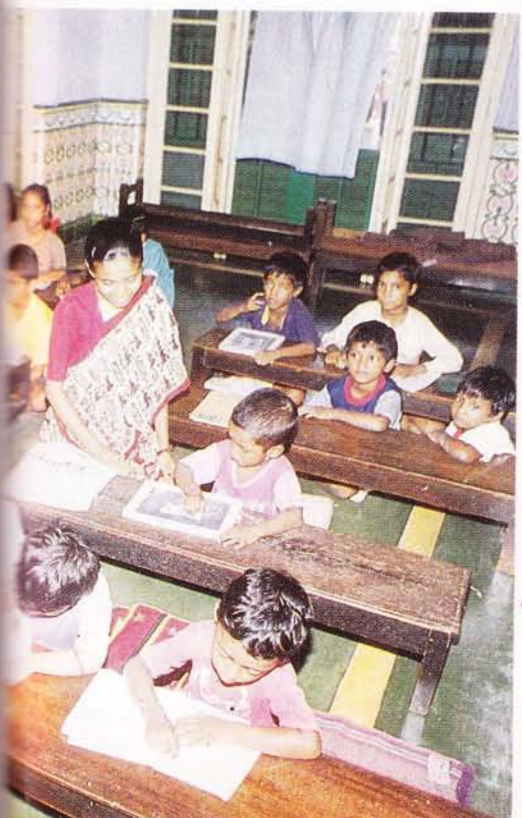

ক্রিস্টিন ভবন • স্থানীয় গরিব শিশুদের লেখাপড়া

ক্রিস্টিন ভবন • টিফিনের সময়

প্রাক্ শতবর্ষ অনুষ্ঠান— রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এ

আন্তর্বিদ্যালয় কুইজ কম্পিটিশন

কুইজ কম্পিটিশনের বিচারকমণ্ডলী

শিক্ষকদিবসে গিরিশমঞ্চে বিশেষ অনুষ্ঠান

গীতা চৌধুরী

কেদারনাথের পথে যাত্রীদল— ক্ষীণাঙ্গী মহিলাদের একটি দল । দেখে মনে হয় পথের ক্লেশ বুঝি এদের সইবে না । তবু সয় । দুর্গম পথ পেরিয়ে ঘুরে আসে কেদার-বদ্রী-গঙ্গোত্রী— এ কার কৃপায় ? নিত্য যাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় তারা, ঐ যিনি প্রসন্ন হাস্যে বরাভয়দায়িনী মূর্তিতে বসে আছেন ঠাকুরদালানে, তাঁরই । তাঁরই কৃপায় পঙ্গু-প্রায় প্রাণীগুলি তীর্থদেবতাকে দর্শন করে, ফিরে এসে নব-উদ্যমে আবার কাজে ঝাঁপ দেয় ।... এঁরা কারা ? এঁরা সবাই শিক্ষিকা—নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা—গ্রীষ্মাবকাশে বেরিয়েছেন তীর্থ-দর্শনে ও সেই সুযোগে দেশের মাটি আর দেশের মানুষকে চিনতে । মাঝে মাঝে এমনি বেরোন তাঁরা—এ বিদ্যালয়ের পুরোনো ট্র্যাডিশন এটা ।

এই দলে আমি এলাম কী করে ? কী করে আমি এলাম নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ? ফিরে যাই তাহলে বারো বছর আগের—১৯৬৪ সালের সেই দিনটিতে । আমাকে যিনি এই বিদ্যালয়টির সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ ! এখানেই আমি খুঁজে পেয়েছি আমার প্রাণের আনন্দ । শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সেদিন এসে দাঁড়িয়েছিলাম এ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে । বিদ্যালয়টির খ্যাতি যদিও তখনই দূর-ব্যাপ্ত, তবু জানা ছিল না এর পিছনে সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস ।

একটানা মাত্র দেড়টি বছর, তারপর বিদ্যালয় ছাড়ার প্রয়োজন হল । যেতে হল দূরে, কলকাতার বাইরে— দীর্ঘদিনের জন্যে । ছাড়তে বড় ব্যথা বাজল । বুঝলাম বাঁধা পড়ে গেছি । দূরে গিয়ে মনে হল যেন আমার হাজার ওয়াটের আলোটা নিভে গেল, যেন সুর কেটে গেল । দীর্ঘ বিরতির পর আবার ফিরে এলাম । ফিরে পেলাম আলো, খুঁজে পেলাম সুর ।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭— আরও দশটি বছর ! আরও অনেক ঘটনা, অনেক স্মৃতি । কত মুখ মনে পড়ে ! মুখগুলি দূরে সরে গেছে, স্মৃতিটুকু ফেলে গেছে । বিদ্যার্থিনী হয়ে যারা আসে এখানে, কি শেখে তারা ? কোন্ বিদ্যা নিয়ে ঘরে ফেরে ? আবার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে তারা অপরকে কি শেখায় ?

মানুষ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামীজী । দেখেছিলেন তাঁর মানস-কন্যা নিবেদিতাও । তাই এখানে মানুষ গড়ারই নিরলস সাধনা চলে । পবিত্র সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষা নিয়ে শিক্ষাদান ব্রতে নিবেদিত যে জীবন, সে তো সার্থক । কিন্তু বাকি অসংখ্য কি কিছুই পায় না ? পায় বইকি ! শূন্যহাতে কেউ ফেরে না এখান থেকে । তাই চলে গিয়েও ফিরে ফিরে আসে, নাম-না-জানা কিসের যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণে । দূর বিদেশে থাকে যারা, তারাও দেশে এলে একবারটি আসে এই বিদ্যাপীঠে । যে-তীর্থবারিতে প্রাণের ঘরটি পূর্ণ করে নিয়ে গেছে তারা, সেই তীর্থভূমি আবার স্পর্শ করে ধন্য হতে চায় ।...

অশেষ সুকৃতির বলে শিক্ষিকার পদ পেলাম এখানে । তারপর কেটে গেল বারোটি বছর । আজ দেখছি আমার প্রথম দিনের সেই শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে কখন যেন ছড়িয়ে গেছে অন্তরের কোষে কোষে, আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হৃদয়ের প্রীতি, ভক্তি আর ভালবাসা । নিবেদিতা বিদ্যালয় আজ আমার কাছে শুধু একটি বিদ্যা-নিকেতন নয়, এ আমার আনন্দ-নিকেতন ।

[১৯৬৬—১৯৯৮]

অনিন্দিতা চক্রবর্তী

মনে পড়ে যায় ক্লাস ফাইভে খেয়ালখুশির ক্লাস, ছড়া মেলাবার, ছড়া বানাবার ক্লাস, নিজেকে হারাবার, নিজেকে খুঁজে পাবার ক্লাস । ক্লাস সিক্স-এর সেই সংস্কৃত ক্লাস । সেদিনটা ছিল পূজার ছুটি পড়ার আগের দিন । কমলাদি বলেছিলেন আজ আমি এমন গল্প বলব যে-গল্প তোমরা আগে কোনদিন শোননি, আমাদের কালের গল্প । আমার বেশ মনে আছে, আমি একমনে গল্প শুনছিলাম, চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল পড়ছিল । অজান্তেই সেদিন আমার মন অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়ার আনন্দ পেয়েছিল । এরপর ক্লাস সেভেন-এ পড়ি, বাঁপাশেই ছিল লাইব্রেরি । কতবার ইচ্ছা করেছে এক ছুটে ছুঁয়ে আসি বইগুলিকে । চারতলায় দাঁড়িয়ে ডানদিকের বারান্দা দিয়ে গঙ্গা দেখা যেত । ঐ ক্লাসে আমাদের র‍্যাপিড রীডার পড়তে হত 'ছোটদের নিবেদিতা' । যতবারই পড়তাম, ততবারই আরও বেশি ভাল লাগত সিস্টারকে । বড় কাছের মানুষ মনে হত । সবসময় যে কথাটা আমার মনের মধ্যে ধাক্কা দিত সেটা ছিল সিস্টারের শেষ কথা— The boat is sinking but I shall see the sunrise. আমরা কি পারব তাঁকে sunrise দেখাতে !

মধুমিতা সেনগুপ্ত

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি— সেদিনের একটি ধূসর চিত্র আজ চোখের সামনে ভাসছে । ছোট মেয়েটি বই-খাতা হাতে নিয়ে অসীম কৌতূহলভরে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছিল । বুক তার বারংবার কেঁপে উঠেছিল এক অজানা আশঙ্কায় । মনে হয়েছিল মাতৃক্রোড়চ্যুত এক নবজাত শিশুকে এক অজানা জগতে কে যেন জোর করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে । কিন্তু কি আশ্চর্য ! এই অকারণ ভীতি দূর হতে বেশি সময় লাগেনি । প্রাণোচ্ছল ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে একান্ত আপন করে নিয়ে, সুন্দর ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠবার সুযোগ দিল এই বিদ্যালয় । বাড়ি আর বিদ্যালয়ের মধ্যে দূরত্ব গেল ঘুচে । সহপাঠীদের সাহচর্য ও দিদিদের অকৃত্রিম স্নেহস্পর্শে এ হল আমার দ্বিতীয় গৃহ ।

কি সুন্দর আমাদের প্রার্থনার সময়টি ! আমরা সকলে সমবেত হই ঠাকুরদালানে ঠিক শ্রীশ্রীমায়ের সামনে । শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী

বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিস্টিন, ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ আরও কত মহাপুরুষের চিত্র এখানে আছে । মনে হয় আমাদের প্রার্থনা সকলে শুনছেন কান পেতে, সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের আশীর্বাদ করছেন । শ্রীশ্রীমায়ের শান্ত, নীরব দৃষ্টি সেই মুহূর্তে হৃদয়কে গভীর প্রশান্তিতে ভরে তোলে । কি সুন্দর ঐ ছবিটি— যেখানে সূর্যোদয় হচ্ছে, আর যার নীচে পূর্ণ দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করছে সেই কথা কয়টি— "Let us be silent that we may hear the whispers of the gods."

যে কথাটি বিশেষ করে মনে হয়— এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কে, কার প্রেরণায় এবং কাকে দিয়ে ? শ্রীমা সারদাদেবী, যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ আর ভগিনী নিবেদিতা— বিদ্যালয়ের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত আছেন এই ত্রয়ী । দুর্ল… সৌভাগ্য আমার যে, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী হতে পেরেছি । এ… ভূমিতে মাথা রেখে কবির কবিতা অনুসরণ করে একটু ঘুরি… বলি—

এমন স্কুলটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
সকল স্কুলের সেরা সে যে
আমার স্কুলের ভূমি ।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগ

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ভগিনী ক্রিস্টিনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় । আজকের শিল্পবিভাগের প্রদর্শনী এবং বহু মহিলার নিয়মিত শিল্পশিক্ষায় একান্ত অভিনিবেশ দেখলে সেই প্রারম্ভের দিনগুলিতে নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন— দুই সিস্টারের পরিকল্পনা ও পরিচালনার প্রাণপাতী সংগ্রাম বোঝা যাবে না । শুধুমাত্র ক্ষুদে ছাত্রীর দল নিয়েই তাঁরা কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা দেননি । তখনকার সমাজে কোনও ছাত্রী মনের মতো গড়ে ওঠার কালেই হঠাৎ সমাজের বিধানে বাল্যবিবাহের ফলে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা অচিরেই বন্ধ হত । তাই মেয়েদের নয়, অন্তঃপুরের মায়েদের ও বালবিধবা মেয়েদের নিয়ে তাঁরা 'পুরস্ত্রীবিভাগ' খুললেন । ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নামে যে-আবেদন প্রকাশিত হয়, সেখানে বাগবাজার বোসপাড়া লেনের ১৭ নম্বর ভাড়াবাড়িতে 'বিগত আঠারো বছর ধরে বালিকা ও অন্তঃপুরচারিণীদের সেবায় শিক্ষামন্দিরের' উল্লেখ আছে । সেইসঙ্গে পাশ্চাত্য ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের স্বেচ্ছায় সর্বপ্রকার দৈন্যবরণ করে ঐ শিক্ষাকার্যে সহায়তার কথাও উল্লিখিত হয়েছে । আবেদন অনুসারে ঐ আঠারো বছরে সাতশ-র অধিক বালিকার জীবন বিদ্যার আলোকে ধন্য হয়েছে এবং আন্দাজ তিনশ অন্তঃপুরচারিণী প্রকৃতশিক্ষা লাভ করেছেন । দুশ দরিদ্র কুলরমণী জীবিকা-অর্জনে সমর্থ হয়ে নিজেদের ও সমাজের কল্যাণসাধন করেছেন । ভগিনী ক্রিস্টিন তখনকার কালে ভারতীয় দর্জির কাছে কাটছাঁট ও মেরামতির কাজ শিখে নিয়ে মেয়েদের শেখাতেন । সেলাই যাঁরা করতেন তাঁরা সেইসব কাপড়জামা নিজেরাই বাড়ি নিয়ে যেতেন । নিবেদিতা লিখেছেন : "তখন শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল সেলাই ও পোশাকের ছাঁটকাট । আমাদের ভগিনী বেচারীর (ক্রিস্টিনের) কিন্তু বরাবরই পড়াশুনাতেই বিশেষ রুচি, তবু মেয়েদের জন্য তিনি ভারতীয় দর্জির কাছে সেলাই শেখেন এবং ক্লাসের প্রস্তুতির জন্য চব্বিশ ঘণ্টা নিজেই ঐ বিষয়ে পরিশ্রম করতেন । এখন তিনি পোশাক তৈরির মাপজোখে অতিনিপুণ । জামার পকেট বা পটি বসানো, নক্‌সা তোলা-সূক্ষ্ম মসলিনের জামার টানা পটিতে নক্‌সা নষ্ট না করে বোতাম বসানোর মতো শক্ত কাজও তাঁকে এখন কাবু করতে পারে না ।" কিন্তু এ ক্ষমতা আয়ত্ত করতে তাঁকে কত কষ্টই না স্বীকার করতে হয়েছিল ! অবশ্য পরে শুধু সেলাই নয়, অল্পবয়সী বিবাহিতা মেয়েরা পড়াশোনা বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা শেখার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী হন । তবে দুঃস্থ এবং অসহায় মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য এই শিল্পবিভাগটির এক ভূমিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদির সমান্তরালভাবেই গড়ে ওঠে । আজ বহু মেয়ে অবৈতনিক শিল্পবিভাগে সেলাই প্রভৃতি শিখতে আসেন এবং বছরে একবার শিল্পপ্রদর্শনীতে তাঁদের হাতের কাজ ও সেলাইয়ের যে-নমুনা দেখা যায় তা নিঃসন্দেহে উঁচুদরের । দেশ স্বাধীন হবার পরেও আজ পর্যন্ত শিল্পবিভাগ অবৈতনিক । তবে পরে সরকারি অনুদান আসে এবং ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দ থেকেই লেডি ব্রেবোর্ণ ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয় ।

ভগিনী ক্রিস্টিন ও ভগিনী সুধীরার পর বিদ্যালয়ের হাল ধরেছিলেন সিস্টারের ছাত্রী শ্রীমতী প্রবোধ, শ্রীমতী মহামায়া প্রমুখ শিক্ষয়িত্রীরা । পরে শ্রীমতী চপলা, বাণী দেবী, মীরা দেবী ও শ্রীমতী নরেশনন্দিনী পরে উষা দেবী, অনিলা দেবী, শোভাদি ও পাখিদি সকলেই এগিয়ে আসেন বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে । ঐ সময়ের ছাত্রী ও আশ্রমের কর্মী পূজনীয়া বিজলীদির (প্রব্রাজিকা বিদ্যাপ্রাণা) কাছে শুনেছি অফিসের পাশে দোতলার ১৩ নম্বর ঘরে সেলাইয়ের ক্লাস হত । সেলাই শেখাতেন শোভাদি । তখন স্কুলে খুবই অর্থাভাব ছিল । সুতরাং ছাত্রীদের হাতের তৈরি সায়া, ব্লাউজ প্রভৃতি বিক্রি করা হত ।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে শিল্পবিভাগের দায়িত্ব নেন দক্ষিণভারতের

শিল্পপ্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী

কন্যা পূজনীয়া জয়লক্ষ্মীদি । শিল্পবিভাগে সরকারি সাহায্যে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে ডিপ্লোমা কোর্স খোলার পর ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ষাট, বাষট্টি হয়েছিল । সরকার অনুমোদিত প্রশংসাপত্র এবং বহু পুরস্কারও ছাত্রীরা লাভ করেছে ।

জয়লক্ষ্মীদির সহকর্মী শ্রীমতী রজতরেখা সেনগুপ্ত এই শিল্পবিভাগের মান খুব রুচিপূর্ণ ও উন্নত করেছিলেন । জয়লক্ষ্মীদি ঐ কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলে কল্যাণীদি (প্রব্রাজিকা শুদ্ধাপ্রাণা) ঐ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । তাঁর পরিচালনায় বিভাগের প্রসার হয় । তাঁতের কাজ, বাটিক, চামড়ার কাজ, মাটির জিনিস গড়া— প্রভৃতি তিনিই শুরু করেছিলেন । ইতিমধ্যে তিনি সংঘের একটি শাখাকেন্দ্রের ভার গ্রহণ করায় এবং রজতরেখাদিও গ্রামসেবিকার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন । প্রব্রাজিকা ত্যাগপ্রাণা, প্রব্রাজিকা কৃষ্ণপ্রাণা, প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা পরে পরে দায়িত্ব গ্রহণ করে শিল্পবিভাগটি পরিচালনা করেন । বর্তমানে প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা শিল্পবিভাগের দীপশিখাটি জাগিয়ে রেখেছেন । একই ধারায় আজও শিল্পপ্রদর্শনী হয় । শ্রীসারদা মঠের প্রথম প্রেসিডেন্ট পরমপূজনীয়া ভারতীপ্রাণামাতাজী বহুবার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন । বর্তমান প্রেসিডেন্ট পরমপূজনীয়া মোক্ষপ্রাণামাতাজীও যে বছর অধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন, সেই বছর (১৯৭৪) থেকে শিল্পবিভাগের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে আসছেন ।

এখানকার ছাত্রীরাও কম গর্বিত নন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে । একজন প্রাক্তনছাত্রী শেফালি করের স্মৃতিকথায় "প্রবেশদ্বার পার হয়েই চোখে পড়ল সিস্টার নিবেদিতার বিশাল ছবিটি । অত্যন্ত রক্ষণশীল জমিদার পরিবারের সাধারণ গৃহবধূ আমি । তবু মনে হল আমার জীবনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল । ভর্তি হলাম বাটিক শেখার জন্য । শিল্পবিভাগের শ্রদ্ধেয়া নীলিমাদির (প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা) সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল কি নিরলস, নিঃস্বার্থ ও কর্মময় এঁদের জীবন । এঁরা বহন করছেন সিস্টার ক্রিস্টিন ও নিবেদিতার ঐতিহ্য ! শিল্পবিভাগের ছাত্রীরা এখনও মাটিতে মাদুর পেতে অভিজ্ঞ শিক্ষিকাদের কাছে নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে । তাঁত ঘরটি তখন ছিল নীচে একতলায় । মালতীদি তাঁত শেখাতেন । 'স্টীচারি' সেলাই শেখাতেন সরযূদি (প্রব্রাজিকা কৃষ্ণপ্রাণা) । স্বামীকে হারাবার পর এই শিল্পবিভাগের সকলের সঙ্গে বন্ধন যেন আরও দৃঢ় হল । এই শিল্পবিভাগে যুক্ত হবার পরে আশ্রয় পেয়েছিলাম পরমপূজনীয়া ভারতীপ্রাণামাতাজীর কাছে । তিনি ছিলেন শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা ।"

যেমন বিদ্যালয়, তেমনি শিল্পবিভাগের মেয়েরাও নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের যুগ্ম উদ্যমে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব মনে রেখে আজও পথ চলছেন । আজ নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি আসন্ন । শিল্পবিভাগটিও শতবর্ষ অতিক্রম করে, বিদ্যালয়ের বুকে অবস্থিত হয়ে ঘোষণা করছে প্রতিষ্ঠাত্রীদ্বয়ের পুণ্যস্মৃতি ।

বিদ্যালয়ের এক অসামান্য ছাত্রী

প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা

একরাশ ফুলের মতো ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে এক বিদেশিনী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীকে দর্শন করতে। যাতায়াতের নৌকা ভাড়া করা আছে— কালীবাড়ির পবিত্র প্রাঙ্গণে তাঁরা প্রবেশ করেছেন চাঁদনী দিয়ে। না, দেবমন্দিরে প্রবেশে তাঁর অধিকার নেই— ছাত্রীদের এগিয়ে যেতে বলে সরে এসেছেন নাটমন্দিরের শেষপ্রান্তে— দু'চোখ ভরে দেখছেন শ্রীরামকৃষ্ণপূজিতা ভবতারিণীর অপূর্ব বিগ্রহ, সমগ্র মনপ্রাণ উজাড় করে প্রার্থনা জানাচ্ছেন জগন্মাতার শ্রীচরণে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সে-ই প্রথম এসেছে মা ভবতারিণীকে দর্শন করতে— দীর্ঘকাল পরেও শৈশবের সেই পুণ্যস্মৃতি কত মধুর! কিন্তু তারই সঙ্গে মিশে আছে কিছু অভিযোগ, কিছু বিষণ্ণতা!

ভগিনী নিবেদিতার শতবর্ষজয়ন্তীর বিশেষ সভায় শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা ভারতীপ্রাণামাতাজী, সেদিনকার প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রীদের মধ্যে যিনি অন্যতমা, মন্তব্য করেছিলেন: "ম্লেচ্ছ বিদেশিনী বলে মন্দির প্রবেশে তাঁর অনুমতি ছিল না। যদিও তাঁর মতো যোগ্য অধিকারী কেউ ছিল কিনা জানি না!"

নিবেদিতা যে-যুগে বাগবাজার পল্লীর হিন্দুমেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছিলেন, সে-যুগের পক্ষে সমাজ-সংস্কারের কড়া শাসন ছিল প্রায় নিশ্ছিদ্র। রাজধানী কলকাতার বুকে তখন নাম করা স্কুল-কলেজের সংখ্যা কম নয়, নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির জোয়ার ব্রাহ্মিকাদের জীবনে, নব্যশিক্ষিত সাহেবি-ভাবাপন্ন পরিবারে আলোড়ন এনেছে ঠিকই, তবু চিরায়ত সমাজজীবনের কাঠামোয় সে আধুনিকতার স্পর্শ বড়ই নগণ্য— গোঁড়া হিন্দু পরিবারে তখনও জাতপাত, ছোঁয়াছুঁয়ির ঘটাপটা।

এমনই এক পরিবারে কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁর জন্ম। নাম ছিল পারুল। সমাজের আর পাঁচটা মেয়ের মতো অল্পবয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। তখনকার দিনে প্রাগ্‌যৌবনকালে বিবাহিতা কন্যাদের পিতৃগৃহে বাসের রীতি ছিল। বালিকা পারুলও তাই পিত্রালয়েই থাকতেন। ওই সময় বাগবাজার পল্লীতে শুরু হয়েছিল সিস্টারদের স্কুল— ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে। আট বছরের মেয়ে জিদ ধরল সে-ও ঐ স্কুলে পড়বে। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের কোনও একদিন ছোট্ট পারুল এল নিবেদিতার স্কুলে।

শৈশবের দিব্যস্মৃতি, সাধুসজ্জনের সঙ্গ ভারতীপ্রাণামাতাজীর মনের মঞ্জুষায় চিরদিন সযত্নে রাখা ছিল। কথাপ্রসঙ্গে কখনও কখনও তিনি বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। সেইসব অমূল্য ঘটনা গ্রথিত করা হয় 'আত্মস্মৃতি' নাম

প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী

দিয়ে । 'ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা' বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হল, মনে আছে— অনেকেই বলতেন, গল্প-উপন্যাসের চেয়েও এই 'আত্মস্মৃতি'-র আকর্ষণ তীব্রতর— যা আদ্যন্ত পাঠ না করলে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না । 'আত্মস্মৃতি'-তে লিখেছেন :

"স্কুল তখন ১৭ নং বোসপাড়া লেনে । সিস্টারের স্কুলে স্বামীজী প্রায়ই আসতেন, কিন্তু আমরা তখন খুবই ছোট, তাই বেশি কিছু মনে নেই । শুধু খুব লম্বা-চওড়া চেহারা আর বড় বড় চোখ দুটি বেশ মনে আছে । ঐ বছর বোধহয় ঠাকুরের তিথিপূজার দিন সিস্টার আমাদের দশ-বারজন ছোট মেয়েকে নিয়ে নৌকায় করে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন । আমরা সব্বাই স্বামীজীকে প্রণাম করি— এসব কথা খুবই অস্পষ্ট মনে আছে ।

"তখন স্কুলে সন্ধ্যার পর শরৎ মহারাজ এসে মেয়েদের কাছে গীতাপাঠ করতেন । শরৎ মহারাজের মুখে লম্বা দাড়ি । পুরস্ত্রীদের দালানে চিকের আড়ালে বসবার ব্যবস্থা ছিল । আমরা ছোটরা উঠোনে বসতুম, সিস্টার আমাদের কাছে বসতেন । সবাইকে ঘোড়ার গাড়ি করে সিস্টার নিয়ে আসতেন । সিঁড়ির গায়ে ছোট জায়গাটিতে শরৎ মহারাজ বসে পাঠ করতেন । আমরা তো ঘুমিয়ে পড়তুম, সিস্টার কোলে করে আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যেতেন ।

"যোগীন-মা, গোলাপ-মাকেও প্রায়ই স্কুলে দেখতে পেতুম । তাঁরা প্রায় রোজই বলরামমন্দিরে আসতেন আর ফেরার পথে সিস্টারকে দেখে যেতেন । সিস্টার ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁদের প্রণাম করতেন । আর তাঁরা জিগ্যেস করতেন, 'নিবেদিতা, তুমি কেমন আছ ?' "

আন্তরিক ভালবাসা আর স্নেহে অমলিন সেই পুণ্যস্মৃতি নিটোল মুক্তার মতো এক মহার্ঘ সঞ্চয় ! স্কুলের সেই প্রথম দিনগুলোয় ভালবাসাই ছিল নিবেদিতার বাণী-আরাধনা-মন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ ।

পরাধীন দেশে উন্নতির সহস্র সম্ভাবনা বীজাবস্থাতেই নষ্ট হয়ে যায় । নিবেদিতা ব্যথাহতচিত্তে ভাবেন, হয়তো এমন দিন আসবে যখন শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মানুষ স্বদেশ, স্বজাতির জন্য ব্যক্তিসুখকে তুচ্ছজ্ঞান করবে, ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা, তার গৌরবময় ঐতিহ্যের যথার্থ মূল্যায়ন করতে শিখবে ।

নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের মনে দৃঢ়মুদ্রিত করে দিতেন জাতীয়ভাবনা । গল্প, পুরাণকথার মাধ্যমে দেশের জন্য গৌরববোধ জাগ্রত করতেন । আজন্ম শিক্ষয়িত্রী নিবেদিতা নিজের দেশে থাকতেই তো ছিলেন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ্ । কিন্তু এদেশে তিনি এসেছিলেন আত্মগরিমা-প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, এসেছিলেন আত্মবিলুপ্তির সাধনায় ব্রতী হয়ে— নিজেকে তিলে তিলে নিবেদন করতে । তাই বড় যত্ন আর আশা নিয়ে প্রত্যেকটি ছাত্রীকেই গড়ে তুলতে চাইতেন । ততোধিক আশাভঙ্গ হত যখন আকস্মিকভাবে ছাত্রীটির বিদ্যাচর্চার পরিসমাপ্তি ঘটত— বাল্যবিবাহ-প্রথা কী দুর্বিষহ ! দুঃখ করে একদিন বলেই ফেললেন : "যদি আমার মেয়েদের একজনও ঠিক ঠিক মানুষ হয়, তবেই জানব আমার প্রচেষ্টা সার্থক ।"

* * *

এভাবেই কত কথা, কত স্মৃতির খণ্ডচিত্র ভেসে উঠত প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর মনে । সিস্টারকে তিনি দীর্ঘ নয় বছর ধরে নানা পরিবেশে, প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে দেখেছেন । কখনও তিনি ছাত্রীদের আপনজন, কখনও শাসনে কঠোর— সামান্য অপচয়, নীতিনিয়মের সামান্য বিপর্যয় তাঁকে অসহিষ্ণু করে তোলে । কখনও বই লেখার কাজে তাঁর পূর্ণ অভিনিবেশ— ছাত্রীদের দেখাশোনার মুখ্য দায় ক্রিস্টিনের ওপর দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেন লিখন-পঠনের স্বেচ্ছানির্বাসিত দুর্গে । আবার কখনও দেখা যায়, জ্ঞানী-গুণী মানুষ— স্বনামধন্য সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, দেশনেতা— সকলেই আসেন তাঁর বিদ্যালয়কক্ষে । সিস্টারের সেখানে এক অনন্য প্রেরণাদাত্রীর ভূমিকা ।

দেশকে আপনবোধ করার শিক্ষা ছাত্রীদের মধ্যেও সংক্রমিত হত । ব্যতিক্রমী মহান চরিত্রের এমনই দূরবিসারী প্রভাব যে, বিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যে উপস্থিত কারও পক্ষেই সিস্টারের ব্যক্তিত্বকে এড়িয়ে চলার উপায় ছিল না । আর ছাত্রীরা তো তাদের প্রাণস্বরূপা সিস্টারকে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাবশেই অনুসরণ করে চলত । সিস্টার বলতেন, ভারতবর্ষের কন্যারা অবিরাম যেন 'ভারত, ভারত'— এই মন্ত্র জপ করে । দেশের দশের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করার শিক্ষা সিস্টারের ছাত্রীদের জীবনে যে কত গভীর ছিল তা উত্তরকালে ভারতীপ্রাণামাতাজীর জীবনচর্যা থেকেই বুঝতে পারা যেত । শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষারূপে দীর্ঘ উনিশ বছরে প্রতিদিন তিনি পরম নিষ্ঠাভরে সংবাদপত্রের খুঁটিনাটি বিবরণ পাঠ করতেন, প্রতিসন্ধ্যায় রেডিও-র খবর শুনতেন— দেশের কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামা হলে অথবা কষ্ট মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগে কষ্ট পাচ্ছে শুনলে আন্তরিক সহানুভূতি নিয়ে দুর্গত মানুষজনের উদ্দেশে কল্যাণপ্রার্থনা জানাতেন ।

জীবনের শেষ পর্যায়ে একক তপশ্চর্যার বাতাবরণ থেকে তাঁকে ফিরে আসতে হয় সংঘের অধ্যক্ষারূপে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে । সেই কবে তিনি কর্মজগৎ থেকে সরে গিয়েছিলেন নিভৃত সাধনার ক্ষেত্রে— শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে ভক্তমহিলাদের মধ্যে যখন থাকতেন, গোলাপ-মা, যোগীন-মার মতো সাধিকাদের জীবনধারা প্রবাহিত হত প্রধানত ভক্তসেবা ও আপন সাধনাকে আশ্রয় করে । বারাণসী থেকে সাতাশ বছর পর ভারতীপ্রাণামাতাজী শ্রীসারদা মঠে যখন এলেন তখন সমাজজীবনের কাঠামোয় অনেক

পরিবর্তন এসেছে। ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়েরা স্বেচ্ছায় ধর্মজীবন-যাপনে এগিয়ে আসছে— তবু তাদের জীবনদর্শন তো সেই প্রাচীনাদের মতো ছিল না! এযুগের মঠবাসিনী মেয়েদের তিনি আপন করে নিয়েছিলেন শান্ত ভালবাসার মাধ্যমে— নবাগতারা তাঁর সরল পবিত্র অথচ গভীর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে শ্রীশ্রীমায়েরই প্রতিভাস দেখতেন। যুগের সঙ্গে তাঁর মানিয়ে চলার অপরিসীম ক্ষমতা মঠবাসিনীদেরও বিস্মিত করত। হয়তো এ-ও ছিল সেই নিবেদিতা স্কুলেরই শিক্ষার গুণ! কোন্ শৈশবে দেখেছিলেন বিদুষী নিবেদিতা, ক্রিস্টিনের নিরন্তর সাধনা— অতিসাধারণ পল্লীর সঙ্কীর্ণমনা মানুষদের ভালবাসার জাদুমন্ত্রে জয় করার সাধনা। হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের অজস্র রীতিনীতির প্রতি অটুট শ্রদ্ধার ভাব বজায় রেখে ধীরে ধীরে ছাত্রীদের জীবনকে আধুনিক শিক্ষাদর্শে মার্জিত, পরিশীলিত করার প্রয়াস। সেইসঙ্গে তো ছিল-ই শ্রীশ্রীমায়ের 'যখন যেমন তখন তেমন' নীতির অনুসরণ।

নিবেদিতার জীবনে দেশের কাজ আর অন্তরঙ্গ অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে কোনও ভেদরেখা ছিল না। স্বামীজীর কর্মযোগকে তিনি মুক্তির প্রত্যক্ষ সোপান-বোধে আশ্রয় করেছিলেন। ছাত্রী পারুলও স্কুলের বাতাবরণে নিবেদিতার ঋজু স্বভাবের মধ্যে, ক্রিস্টিনের পবিত্রমধুর আচরণের মধ্যে দেখেছিলেন স্বর্গীয় শুচিতার দীপ্তি— সংসারের কোনও মালিন্য যাকে স্পর্শ করতেও অপারগ। এমনই সেই স্কুলের পরিবেশ যে পারুলের ইচ্ছাই করত না দিনান্তে ঘরে ফিরতে। উঁচু ক্লাসের ছাত্রী যখন তিনি, সেসময়ে সুধীরাদি এলেন শিক্ষাব্রতী হয়ে। সুধীরার বৈরাগ্যদীপ্ত চরিত্রে এমন এক আকর্ষণী শক্তি যে, তাঁকে না ভালবেসে থাকা যেত না। ছাত্রীরা দেখত— সুধীরাদি যেন স্বতন্ত্র। তাঁর ত্যাগের আদর্শ, ভালবাসা, উৎসাহ ও দরদ পারুলের জীবনদর্শনকেই যেন পালটে দিল। ঈশ্বরলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সপ্তদশী পারুল পথে নেমেছিলেন। সহায় ও প্রেরণাদাত্রী ছিলেন সুধীরাদি। তাঁরই সহযোগিতায় গৃহ থেকে গৃহান্তরে আপন পরিচয় গোপন রেখে অজ্ঞাতবাস। সুধীরা আত্মগোপনকারিণীর নাম রাখলেন 'সরলা'। পরে অবশ্য সেই গোপনীয়তারক্ষার প্রয়োজন শিথিল হয়েছিল। সরলার নিকট-আত্মীয়েরাও তাঁর বৈরাগ্যের আন্তরিকতাদর্শনে সংসারের দায়বন্ধন থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। এরপর, সুধীরাদির দূরদর্শিতায় ব্রাহ্মণঘরের মেয়ে হয়েও তাঁর ধাত্রীবিদ্যায় প্রশিক্ষণলাভ, সেই বিদ্যাসূত্রেই শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গসেবিকারূপে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে মাতৃ-আলয়ে বাস, শ্রীশ্রীমাকে জীবনের কেন্দ্রে রেখে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের অভিভাবকত্বে তপোময় জীবনযাপনের সূচনা। প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর 'আত্মস্মৃতি' পাঠকমাত্রেই সেই ক্রমপরিণতির সঙ্গে সুপরিচিত।

কিন্তু জীবনবোধের গভীরে আরও কত সূক্ষ্ম অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকে— লোকচক্ষুর অন্তরালে যা ধীরে ধীরে ব্যক্তি-মানসকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তোলে। জীবনের কোন্ প্রত্যুষে নিবেদিতা এসেছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা পারুলের প্রাত্যহিকতায়। নিবেদিতা তাঁর আচার্যের কাছে শিখেছিলেন ভারতবর্ষের মেয়েদের এমন সুশিক্ষা দিতে হবে যেখানে আধ্যাত্মিকতাকে বর্জন করে জীবনযাপনের প্রশ্ন উঠবে না। তাই সাগ্রহে তিনি ছোট মেয়েদের নিয়ে যেতেন বাগবাজারে মাতৃসান্নিধ্যে, নিয়ে যেতেন বেলুড়ে স্বামীজীর পদপ্রান্তে অথবা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই পুণ্য কক্ষে। এই অধ্যাত্মসংস্কার গড়ে তোলার অনন্য ভূমিকা পালন করে শিক্ষয়িত্রী নিবেদিতা ছাত্রীদের চিরঋণী করে রেখেছিলেন। সরলার জীবনে এর সঙ্গে ঘটেছিল আরও কতকগুলি দুর্লভ যোগাযোগ।

গুরুর সান্নিধ্যে তাঁরই সেবায় নিরন্তর বাস অধ্যাত্মপথের যে কোনও পথিকেরই পরমকাম্য। সেইসঙ্গে ছিল শ্রীশ্রীমার অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রমুখ মাতৃমণ্ডলীর দুর্লভ স্নেহ, শাসন ও সুপরামর্শ। শ্রীশ্রীমায়ের অবর্তমানে যোগীন-মা, গোলাপ-মাকে সরলা সেবাশুশ্রূষা করতেন আর তাঁরা লক্ষ্য রাখতেন মায়ের এই আদরিণী কন্যার জীবন যেন কোনও ভাবেই লক্ষ্যচ্যুত না হয়। পূজনীয় শরৎ মহারাজেরও আশীর্বাদ ছিল : "মানবজন্ম পেয়েছ, শেয়াল-কুকুরের মতো না মরে এমন মরা মরবে, একটা দাগ রেখে যাবে।" সেই উদ্দেশ্যেই তো সরলার ঘর ছাড়া— কোনদিনই যে-প্রেরণা তিনি ভুলতে পারেননি।

শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের পর একে একে প্রয়াত হলেন সুধীরাদি, যোগীন-মা, গোলাপ-মা— এমনকি, পিতৃপ্রতিম শরৎ মহারাজও। বাইরের পবিত্রসঙ্গ যেদিন দুর্লভ হল, সেদিন সরলার চিরবৈরাগী মন ঘুরে দাঁড়াল একক সাধনার পথে। নিবেদিতা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ, নার্সিং ট্রেনিং-এর অভিজ্ঞতা— সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে গেল। বিশ্বনাথের দরজায় এসে দাঁড়ালেন বিশ্বের নাথকে একমাত্র সহায় জেনে। প্রথমে ভাড়াবাড়িতে, পরে নিজের ছোট্ট বাড়িতে দিনের পর দিন তাঁর জীবনধারা একই খাতে প্রবাহিত হত।

শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদদের জীবন দেখে শিখেছিলেন— ধর্ম কোনও অনুষ্ঠান-আড়ম্বরে নেই ; প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সাধকের চরিত্রে আনবে রূপান্তর— দৈবীসম্পদে ঋদ্ধ হবে তার জীবন। ঈশ্বরনিষ্ঠ জীবন তো তিনি কম দেখেননি— এখন তাই অবিমুক্তপুরী বারাণসীর পুণ্য বাতাবরণে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন সাধনার একটানা স্রোতে। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, জপধ্যান, পূজা-প্রার্থনা— কখনও বা অদূরবর্তী কাশী অদ্বৈত আশ্রমে মন্দিরাদি দর্শন করে আসা।

বিস্ময় জাগে ভাবলে, এই একক সাধনার আকুলতা আর দৃঢ় মনোবল কেমন করে এল সেই সরল-সুন্দর সেবাপরায়ণা মেয়েটির

শান্তস্বভাবে ! অথবা বলা যায়, এ তো কোনও আশ্চর্য সমাপতন নয়, পবিত্র হৃদয়ের এটাই তো স্বাভাবিক গতি । স্বামীজী ও নিবেদিতা চাইতেন শিক্ষা যেন নারীকে স্বাবলম্বী করে । কিন্তু সৎসঙ্গ ও শিক্ষা যে হিন্দুনারীর জীবনে এমন যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে চলেছে সেটা বোধহয় তাঁদেরও প্রত্যাশার অধিক ছিল । উপলব্ধির মানসদর্পণে শিক্ষিতা মেয়েরা বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবল রাঁধা-বাড়াই জীবন নয় । জীবন আরও বড় ।

বঙ্গনারীর মানসবিবর্তনের সেই ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনে স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠার দাবিতে নারীকে অনেকক্ষেত্রেই সমাজ, সংসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে আমরা দেখি । কিন্তু শিক্ষা যেখানে হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলিকে উৎপাটিত না করে প্রসারিত করে, সেখানে এমনভাবেই আসে উচ্চতর জীবনের আহ্বান । সুধীরাদির সীমিত আয়ুষ্কালে যে-স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল,. তাকে বাস্তবায়িত করে গেলেন প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী । সুধীরাদি বলতেন— হোক্ না নারীর আকৃতি, আত্মায় তো কোনও লিঙ্গভেদ নেই ! নারীজনোচিত মৃদু, কোমল ভাবকে পরিহার করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন । সেযুগের ভদ্রঘরের মেয়ের পক্ষে একা রাস্তায় চলা, একা রেলপথে ভ্রমণ— এসবই সুধীরাদির জীবনের পরিচিত ঘটনা— বার বার শুনলেও ছাত্রীদের কাছে যা পুরোনো হত না । নিবেদিতার স্বপ্ন ছিল তাঁর ছাত্রীরা আদর্শ হিন্দুরমণী হয়ে উঠবে । ক্রিস্টিন বলতেন : "নারীমুক্তি বলতে স্বামীজী বুঝতেন সবরকম সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি— যা নারীর প্রকৃত শক্তির উন্মোচন ঘটিয়ে দেবে ।" আরও বলেছিলেন : "নারীশিক্ষা সম্পর্কিত স্বামীজীর চিন্তাগুলিকে সঠিক ভাবে যদি কার্যকর করা যায়, তাহলে এমন একশ্রেণীর নারী গড়ে উঠবে, জগতের ইতিহাসে যাঁদের তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না । প্রাচীন গ্রীসের নারীরা যেমন শারীরিক দিক দিয়ে প্রায় নিখুঁত ছিলেন, এই নারীরা তেমনি বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে তাঁদের পরিপূরক হবেন— করুণাময়ী, প্রেমময়ী, কোমলতায় পূর্ণ, সহিষ্ণুতার মূর্তি, হৃদয়বত্তা ও বুদ্ধিমত্তায় মহান ; তবে সবচেয়ে মহান আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে ।"

স্বামীজী, নিবেদিতা অথবা ক্রিস্টিন কেউই বিদ্যালয়ে ছাত্রী প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার জীবনে শিক্ষার আত্মীকরণ আর তার সুদূরপ্রসারী পরিণতি স্বচক্ষে দেখে যাননি । কিন্তু তাঁদের আশীর্বাদ তো ছিলই । সর্বোপরি ছিল সেই অতলান্ত ভালবাসা— মাতৃহৃদয়ের উৎসমুখ হতে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পুণ্যলগ্নে যা স্বতঃই উৎসারিত হয়েছিল । নিবেদিতার জন্মশতবর্ষজয়ন্তীতে প্রাক্তন ছাত্রীসম্মেলনে সেই অসামান্য ছাত্রী ভারতীপ্রাণামাতাজী তাঁর ভাষণে বলেন :

> "নিবেদিতা ছিলেন ভাবময়ী । যে ভাব তিনি দিয়ে গেছেন তা শীঘ্র লুপ্ত হবার নয় । যুগপ্রয়োজনে কিছু পরিবর্তন হলেও মূল সুরটি তেমনি অব্যাহত আছে । যে কেউ এই বিদ্যালয়ের গণ্ডির ভেতর আসবে তাকেই তাঁর ভাব কিছু না কিছু প্রভাবিত করবে । হয়তো তার প্রকাশ সময়-সাপেক্ষ । জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তরিক সেবার ভাব ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভাব— যে ভাবের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন আমাদের ভগিনী নিবেদিতা— সেই ভাব যদি আমরা বহন করে নিয়ে যেতে পারি তবেই ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন সার্থক হবে ।"

সংযুক্ত সম্পাদিকা, 'নিবোধত' পত্রিকা ।

অর্ঘ্য

জিতেন্দ্রনাথ সরকার

॥ এক ॥

যুগান্তরের সন্ধি লগনে
শ্রীরামকৃষ্ণে স্মরি ।
ওগো নিবেদিতা নামিলে আহবে
জ্ঞানের কৃপাণ ধরি ॥

॥ দুই ॥

লভি বীর গুরু বিবেকানন্দে
সঁপিয়া জীবন পরমানন্দে
জীবে জীবে তুমি পরম শিবেরে
লইলে বরণ করি ॥

॥ তিন ॥

চিত্তে তোমার বিরাজে নিত্য
জননী সারদামণি ।
মর্মে তোমার গভীর গুহায়
জ্বলে কৌস্তুভ মণি ॥

॥ চার ॥

মৃতপ্রাণে করি প্রাণসঞ্চার
রুদ্রবীণায় তুলি ঝঙ্কার
অতি দুর্দম কর্মসাগরে
ভাসালে জীবনতরী ॥

আলোকদূতী

প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণা

আলোর সন্ধানে তুমি ব্রতী
দুঃসহ তপস্যায় মগ্ন ছিলে
নিশিদিন ; ভারত কল্যাণে
নিবেদিতপ্রাণ নিবেদিতা ।

☆

অশিক্ষার অন্ধকারে মগ্ন
দেবভূমি ; শিক্ষার প্রদীপখানি
হাতে নিয়ে তব পথ চলা ;
অনাহারে, অনিদ্রায় জর্জরিত-প্রাণ
তবু বুক ভরা পরম আশ্বাস ।

☆

ঈশ্বরের করুণায় অনন্ত বিশ্বাস
জন্মলগ্নে নিবেদিত তুমি ;
শত দুঃখ হতাশায় প্রেরণার
উৎস-স্বরূপিণী । একমাত্র লক্ষ্য
ছিল ভারত-কল্যাণ ।

☆

ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে উদ্বোধিত
প্রাণ ; ভারত-মাতার বেদীতলে
নিঃশেষে করেছ তুমি দান ।
প্রাণ-প্রিয় ভারত-ভগিনী
কীর্তি তব চির অম্লান ।

তুমি এখানেই

মানসী মজুমদার

কবে, কোন একদিন
তোমার শ্রমক্লান্ত চোখ ঘুমিয়ে পড়েছে ।
ঘুমিয়ে পড়নি তুমি ।
আমাদের ছেড়ে কোনও স্বর্গে যেতেই পার না ।
জেগে আছ
জেগে আছ আজও ।

শতবর্ষ আগে
মায়ের জ্বালিয়ে দেওয়া প্রদীপখানিকে
কত ঝড়-জল-কুয়াশার থেকে
আগলে রেখেছ তুমি এই আঙিনায় ।
পাংশু মেয়ের দল যূপকাষ্ঠ থেকে উঠে
চোখ মেলে চেয়েছে প্রথম ।
আলো তুলে পথ দেখিয়েছ ।
নাগপাশ ছিঁড়ে সে পথে মিলেছে
গার্গী-সীতা-মৈত্রেয়ীর চরণের রেখা ।
শত কোটি বালিকার হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বলে
সে শিখায়
আজ উদ্ভাসিত চারিদিক ।

মহা ভাগ্যবতী আমি ।
রোজ আসি এই আঙিনায় ।
এ বাতাসে শ্বাস নিই ।
তোমার স্বপ্নপূরণ দেখি ।
জানি
তুমি এখানেই আছ ।
আগলে রেখেছ আমাদের ।

নিবেদিতা-তীর্থে মনীষী সমাগম

রেবা ভট্টাচার্য

যে-বিদ্যালয়ে প্রতিদিনের কাজ শুরু হয় সরস্বতী বন্দনা দিয়ে, যেখানে হাজার শিক্ষার্থী করজোড়ে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে দিনের পাঠ নেবার আগে মনকে সংহত করে, সেই নিবেদিতা বিদ্যালয় আজ শতবর্ষ পরিক্রমা শেষ করতে চলেছে । এ যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের সাবেক কালের একটি দোতলা বাড়িতে, ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর কালীপূজার দিনে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে । এই শিক্ষাসত্রে আদর্শ কন্যা গড়বার ভার যাঁকে দেওয়া হল তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা ।

বিবেকানন্দের শিক্ষাপরিকল্পনা কোনও ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না । নারীশিক্ষা সমগ্র সমাজবিপ্লবেরই একটি অংশমাত্র ছিল । ঝিমিয়ে পড়া, আত্মবিশ্বাস ক্ষয়ে যাওয়া, প্রতিরোধ-বিমুখ জাতিকে জাগিয়ে দেবার যুদ্ধে নেমেছিলেন তিনি । নারী যেহেতু সমাজের প্রধান একাংশ, তাই সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবের অংশীদার হিসেবে যোগ্য করে, তাদেরও এই যুদ্ধে সামিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য । কেবল সাধারণ শিক্ষা নয়, বিজ্ঞানচেতনা, সমাজবোধ, সংস্কৃতির মূল উদ্ধার করে তার প্রতি জাতির গর্ববোধ জাগানো, যুবশক্তির মধ্যে দেশের জন্য দায়বোধ সৃষ্টি করা, সর্বক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন করে সমগ্রজাতিকে, দেশের মানুষকে স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ করা— এসবই ছিল স্বামীজীর পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গেলে যে কর্মশক্তি, নিষ্ঠা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং সর্বোপরি দরদের প্রয়োজন, তার আশ্চর্য সমাবেশ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন নিবেদিতার মধ্যে । তাই তাঁকে লিখেছিলেন : "তোমার মধ্যে একটি জগৎ আলোড়নকারী শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে... হে মহাপ্রাণ ওঠ, জাগো । জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে ?" যিনি অন্তরে শিক্ষাব্রতী এ ডাক উপেক্ষা করার শক্তি তাঁর থাকে না ।

১৯০২ থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের ধাত্রী নিবেদিতা ভারতের শিক্ষাচিন্তা, সমাজচিন্তা, বিজ্ঞানচর্চা এবং শিল্পচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । ভারতকে হৃদয়ে স্বদেশরূপে গ্রহণ করে সর্বতোভাবে তার উন্নতিতে তিনি সর্বস্ব পণ করেছিলেন । বিংশ শতাব্দীর সেই প্রথম দশকে মনীষার যে সঙ্গম হয়েছিল বঙ্গদেশে, তা বড় কম নয় । ১৬ নম্বর এবং ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনের বিদ্যালয়-ভবন দুটিতে সিস্টারদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় এবং কর্মবিনিময়ের সূত্রে বিভিন্ন মনীষীর আগমন ছিল অনিবার্য । রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, যদুনাথ সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ এবং বারীন্দ্র ঘোষ, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিনয় সরকার, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সুরেন গাঙ্গুলী এমন অনেক মনীষীর পদধূলি পড়েছিল এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে । কেবল স্বদেশী মনীষীই নয়, এই মিলনতীর্থের অভিযাত্রী ছিলেন কলকাতার সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল, স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার কলকাতা শাখার তৎকালীন সম্পাদক এস. কে. র‍্যাটক্লিফ, প্রখ্যাত জাপানী চিত্রশিল্পী কাকুজো ওকাকুরা । এছাড়াও এসেছিলেন আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স-নিবাসী আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী যিনি ধ্রুপদী চিত্রশিল্পের প্রবক্তা ছিলেন । আকারে ক্ষুদ্র হলেও এই বিদ্যায়তনটি যে এক বিরাট সম্ভাবনার অঙ্কুরস্বরূপ ছিল, একথা তাঁরা জানতেন, কেননা এর ধাত্রী এক সৃষ্টিশীল মানবী— ভগিনী নিবেদিতা ।

বিচিত্রগামী এই প্রতিভার সংস্পর্শে এসেছিলেন সেকালের শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিরা । পারস্পরিক গুণগ্রাহিতার সম্পর্কে 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে'— এই নিয়মে ছিল আদান-প্রদান । নিবেদিতা

চেয়েছিলেন তাঁদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করে ভারতবর্ষকে স্বমহিমায় পাশ্চাত্যের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা দিতে এবং জাতীয়গৌরবে ভারতবাসীকে পুনর্জীবিত করতে । ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা প্রমাণ করে পদার্থবিদ্যা এবং শারীরতত্ত্ব এই দুই বিজ্ঞানতত্ত্বের সীমারেখা অবলুপ্ত হয়ে এসেছে এবং জড় পদার্থেরও সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে । বিজ্ঞানে এই মহৎ আবিষ্কারের স্বীকৃতি পাওয়া পরাধীন দেশের বিজ্ঞানীর পক্ষে সহজ ছিল না । নিবেদিতা বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষকে ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করতে হলে আগে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেতে হবে ।

বিজ্ঞানে বসুর স্বীকৃতি ও সহায়তা প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ এবং রমেশচন্দ্র দত্তর সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ বেড়ে ওঠে । ভারতীয় বিজ্ঞানচিন্তা-বিকাশে সহায়তা এবং পশ্চিমী বিরোধিতা প্রতিরোধ করার জন্য গোখলের সঙ্গে সখ্যভাব জন্মেছিল নিবেদিতার । ভগিনী ক্রিস্টিনের সঙ্গেও গোখলের বন্ধুত্ব ছিল । স্কুলের কাজে বা অন্যান্য নানা সময়ে ভগিনীরা তাঁকে ডাকতেন । গোখলে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন । বিবেকানন্দের ভারতভাবনা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাই নিবেদিতা তাঁর ওপর ভরসা রাখতেন । তাঁর মাধ্যমেই ইংরেজ সরকারকে ভারতীয় শিক্ষার দায় সম্বন্ধে সচেতন করতেন এবং সরকারের মতিগতির সন্ধান রাখতেন । তিনি জানতেন, কেবল নিন্দা করে বলবৎ ব্যবস্থাকে সংস্কার করা যায় না, ভারতীয় জীবনকে নির্মাণ করতে হবে ।

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, নিবেদিতা এই জীবনগড়ার কাজকেই নিজের কাজ বলে গ্রহণ করে একেবারে নিজের উদরান্নের অংশ কেটে বোসপাড়ার ওই গলিতেই নিজের কর্মশালা চালাচ্ছিলেন । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন ।... জনসাধারণকে হৃদয়দান করা যে কত বড় সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি ।" ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতার 'The Web of Indian Life'-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের অবজ্ঞার মনোভাব বিশ্লেষণ করে তিনি সমকালীন পটভূমিকা বর্ণনা করে ঝড়ের পূর্বসংকেত দিয়েছিলেন এবং নিবেদিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন ।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দ থেকেই শ্রীঅরবিন্দ এবং বারীন্দ্র ঘোষ বহুবার এসেছেন ১৬ এবং ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে । তাঁরা নিবেদিতার মধ্যে দেখেছিলেন : "বিশুদ্ধ আত্মিক অগ্নির সঙ্গে যোদ্ধৃর ঝঞ্ঝাগতির সমন্বয় ।" তাঁর উন্মুক্ত মন, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অধ্যাত্মচেতনা এবং তেজস্বিতা তৎকালীন অবস্থায় আত্মবিস্মৃত জাতির জাগরণে বিশেষ প্রয়োজন ছিল ।

একটি জাতির চরিত্রকে ধরে রাখে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নান্দনিকতা-বোধ এবং ধর্মবোধ । তাই জাতির ইতিহাস, ভাষা, শিল্পের প্রতি মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে হবে । ভারতের উন্নতি ইংরেজের পন্থায় বা ইউরোপের অনুকরণে করতে গেলে তা হবে দুর্বল যার শিকড় দেশের মাটির গভীরে প্রবেশ করবে না । তাই ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, রাজনীতিবিদ্ বিপিনচন্দ্র পাল, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন । ভারতের মূল সঙ্কটের চরিত্র নিবেদিতার কাছে স্পষ্ট ছিল । তিনি বুঝেছিলেন, পরাধীনতা থেকে মুক্তি না পেলে যেমন বিজ্ঞানের অগ্রগতি অসম্ভব, তেমনি শিল্পের বিকাশও সম্ভব নয় । তাই নন্দলাল বসুকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, ভারতীয় শিল্পীকে দেশের মাটির ওপর দাঁড়িয়ে জাতীয় ঐতিহ্যের ভিতর থেকেই শিল্পপ্রেরণা গ্রহণ করতে হবে এবং শিল্পরুচি গড়তে হবে । তিনিই নন্দলাল এবং অসিত হালদারকে অজন্তা গুহাচিত্র দর্শন এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবধারায় শিল্পসৃষ্টির পথ দেখিয়েছিলেন । বিদ্যালয়টিকে বিদ্যামন্দির রূপে উপস্থাপনা করে পবিত্রতার সকল চিহ্ন যেমন, কীর্তিমুখ, পদ্ম, শঙ্খ, ঘণ্টা, আমলক শিলা ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে নিবেদিতাকে নন্দলাল তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন । তাঁরই আঁকা সরস্বতীচিত্র অনুযায়ী মৃৎশিল্পী মা সরস্বতীর প্রতিমা তৈরি করেন প্রতি পুজোয় । বিদ্যালয়ের স্তবগুচ্ছও সেই সরস্বতীচিত্রই বহন করে আজও ।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ভগিনীর কাছ থেকে জেনেছিলেন 'আত্মমর্যাদাবোধে'র সংজ্ঞা, সমাজবিজ্ঞানী বিনয় সরকার তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং রসজ্ঞ-মনটির খোঁজ পেয়েছিলেন আর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন যে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছিলেন ভগিনীর কাছ থেকে ইংরেজীতে তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' রচনাকালে, তারই স্বীকৃতিতে বলেছেন : "তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম ।"

ভারতের সার্বিক সংগ্রামে নিবেদিতা নিজের শক্তিক্ষয় করেছিলেন অনেকখানি, সেইসঙ্গে বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের দুরূহ চিন্তা তাঁর শরীরে ভাঙন ধরিয়েছিল । লেখা এবং বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের জন্য প্রাণপাত করতে হয়েছে তাঁকে, কেননা, তাঁর বিদ্যালয় কোনও বিদেশী সরকারের সাহায্য স্পর্শ করতে চায়নি । অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পুরস্ত্রী বিভাগের যাবতীয় খরচ বহন করার যে শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল, তাতেই ভগ্নস্বাস্থ্য ভগিনীর জীবনদীপ নিভে গেল ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে ।

বিদ্যালয়ে বহুদিন থেকেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জন্মদিনে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিদ্বজ্জনদের আহ্বান করা হত । সেই ধারাটি এখনও অব্যাহত আছে । তাঁরা মেয়েদের ত্যাগ-সেবাধর্মের সার কথা যেমন শোনান, তেমনি দেশ, সময়-কাল, দেশের অতীত সংগ্রাম, ইতিহাস, সাহিত্যের কথাও বলেন । তাঁরা এই পুণ্য প্রতিষ্ঠানে নিবেদিতার কথাপ্রসঙ্গে মেয়েদের মনে করিয়ে দেন : "ভারত বিরাট আদর্শের জননী,

যা-কিছু মহৎ, প্রেমময় এবং বৃহৎ, তারই পালিকা, ধাত্রী ।" ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ের আশ্রমিক বিভাগ সারদামন্দিরে উপনিষদ্ এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আশ্রমিকদের শিক্ষা দিয়েছিলেন শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ । ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে এল বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব । এই উৎসবের সূচনা করেছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ এবং সেই উপলক্ষে বহু মনীষীর পদধূলি পড়েছিল এই বিদ্যায়তনে । তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত এবং সুবক্তা শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজ, সাহিত্যিক অনুরূপাদেবী এবং সুলেখিকা সরলাবালা সরকার, শিক্ষাব্রতী ডঃ রমা চৌধুরী, ঐতিহাসিক ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী এবং আরও অনেকে ওই উৎসবকে শ্রীমণ্ডিত করেছিলেন । একই সঙ্গে সংঘজননী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীও পালিত হয়েছিল । ডঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা, অধ্যাত্মভাবনা, নিয়মানুবর্তিতা ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ সম্বন্ধে সপ্রশংস মন্তব্য করেন । অর্ধশত বৎসর ধরে ঐতিহ্যে প্রোথিত থাকা এই বিদ্যালয়টি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল । বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত শিল্পবিভাগটি তাঁর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে । তিনি শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন : "নিবেদিতা যে শিখাটি জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন তা যেন স্বমহিমায় অম্লান থাকে আগামী দিনেও ।"

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতার জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে এই বিদ্যালয়ে শুভাগমন করেছিলেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও কালিদাস নাগ, শিক্ষাবিদ ও ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এবং ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করে তাঁরা তাঁকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শাশ্বত-মিলনের মূর্তি বলে অভিহিত করেন । সেবিকা নিবেদিতার ভাবকে অনুসরণ করে ব্রহ্মচারিণী, সন্ন্যাসিনী এবং শিক্ষাব্রতিগণ একযোগে সেখানে আত্মনিয়োগ করেছেন দেশের ও দশের সেবায়, আগামী দিনে তাঁদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে জনগণের কাছে তাঁরা সহযোগিতা কামনা করেছেন ।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন রাজ্যপাল কে. এম. মুন্সী বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন । 'ভারতীয় বিদ্যাভবনে'র প্রতিষ্ঠাতা এই সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছাত্রীদের উদ্দেশে ভাষণে বলেন, তারা যেন ভবিষ্যতে অধ্যাত্মজীবনে আশ্রয়লাভ করে নারীপ্রগতিকে নতুন ধারায় এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সমগ্র ভারতের সামনে এক নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে— যাতে জাতীয়জীবন সমৃদ্ধ হয় ।

দেশ স্বাধীন হল কিন্তু শিক্ষার প্রসার তেমন হল না । উপরন্তু স্বাজাত্যবোধ, স্বাভিমান, দেশের জন্য কঠিন পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার— এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের মনে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল আমাদেরই শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিতে । যে বিদ্যালয়ে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে 'বন্দে মাতরম্' ছিল মেয়েদের নিত্যকার

নিবেদিতার শতবর্ষ জয়ন্তী : স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ ও স্বামী ওঙ্কারানন্দ

প্রার্থনাসঙ্গীত, সেই বিদ্যালয় ব্রত নিল স্বাধীনতা দিবসকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে শিক্ষার্থীর হৃদয়ে চিত্রপটের মতো তুলে ধরার । তাই স্বাধীনতা দিবস পালন এখানে একটি কর্মযজ্ঞ । মনীষীরা আজও আসেন এখানে স্বাধীনতা দিবসে এবং যুবদিবসে অর্থাৎ স্বামীজীর জন্মদিনে ।

সমগ্র ষাট এবং সত্তরের দশক জুড়ে এখানে এসেছেন শিক্ষাবিদ দুঃখহরণ চক্রবর্তী, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), প্রবন্ধকার হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সাহিত্যিক ভবতোষ দত্ত । ভগিনীর জ্যোতির্ময়ী মূর্তিকে স্মরণ করে, বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তাঁরা । আমেরিকার স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ, উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ এই নিবেদিতা-তীর্থে এসেছেন । এঁদের সকলেই এখানে ত্যাগ ও তপস্যার সঙ্গে শান্তি ও শুচিতার পরিবেশ দেখে প্রসন্ন হয়েছেন । ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতার জন্মশতবর্ষ পালিত হয় যথোচিত গাম্ভীর্য এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে । এই বছরের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসটিতে মহাজাতি সদনে আয়োজিত সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন । ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয় প্লাটিনাম জুবিলী পালন করে । এই উপলক্ষে অর্থনীতির অধ্যাপক অম্লান দত্ত এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের তৎকালীন অধ্যক্ষ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মহাজাতি সদনে মনোজ্ঞ ভাষণে তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । ঐদিন সভাপতি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ । বিদ্যালয়ের কন্যাদের তিনি স্মরণ করিয়ে দেন ভগিনী নিবেদিতার উত্তরসূরী হিসেবে দেশহিতের ব্রত গ্রহণ করার কথা । এখনও এখানে প্রতিবৎসরই আসেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, স্বামীজী ও নিবেদিতার আদর্শপ্রচারের মহতী সাধনায় সমর্পিতপ্রাণ গবেষক এবং একালের ইতিহাসবেত্তা গুণিজন ।

শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছল এই বিদ্যালয় । অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, উপেক্ষা-ঔদাসীন্য, বিপর্যয়-সমালোচনার ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সে, তবু সহনশীলতা-ত্যাগ-সেবার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি । যুগযুগান্তের প্রজ্ঞায় স্থির থেকে সে ঐতিহ্য ছেড়ে ক্ষণকালের কোনও আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না । বরঞ্চ মন উন্মুক্ত রেখে, মাটির ভিতর শিকড় চালিয়ে দিয়ে, নিজ আদর্শে এবং প্রত্যয়ে স্থির থাকবে । বৈদগ্ধ্য, প্রজ্ঞা এবং অন্তর্দৃষ্টি— এই তিনের অনুসন্ধানে সে ব্যাপৃত থাকবে এবং শিক্ষার্থীদেরও সেই বোধে জাগ্রত করবে ।

শিক্ষয়িত্রী, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল ।

প্লেগের সময় কলিকাতায় কি আতঙ্ক !... কলিকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ করিবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল । একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখিলাম ঝাড়ু ও কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছেন । তাঁহার এই দৃষ্টান্তে লজ্জাবোধ করিয়া বাগবাজার পল্লীর যুবকেরাও অবশেষে ঝাড়ুহাতে রাস্তায় নামিল । পরে শুনিলাম এই বিদেশিনীই ভগিনী নিবেদিতা ; স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহাকে লণ্ডন হইতে আনিয়াছেন । নাগরিক জীবনে স্বাবলম্বন-শিক্ষার প্রথম পাঠ আমরা ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলাম । এই প্লেগ উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় !

—অধ্যাপক যদুনাথ সরকার

নিবেদিতাতীর্থে

প্রব্রাজিকা মৈত্রীপ্রাণা

স্মৃতিমধুর শৈশব। কোন শৈশবে দেখেছি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ছবি। মায়ের দিকে তাকালে মনে হত কী আছে ঐ চাহনিতে? কেন অন্য দিকে চোখ ফেরানো যায় না? এমনই আর একটি ছবি দেখেছি বইয়ের পাতায়— সিস্টার নিবেদিতার। ঐ মুখ, ঐ চোখ, দৃপ্তভঙ্গি, কী আকর্ষণীয়! কে ইনি? ছোট জীবনীটি পড়ে ফেললাম। প্রতিদিনই চোখ পড়ত স্বামীজীর একটি বাণীর দিকে— "আমি চাই এমন লোক যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত হইবে, আর তাহাদের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত— ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ, মনুষ্যত্ব।... যিনি প্রেমিক তিনি জীবিত, যিনি স্বার্থপর তিনি মৃত।" শব্দের এতো শক্তি! পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে গেল।

* * *

পার হয়ে গেছে শৈশব, কৈশোর। গ্রাম ছেড়ে এসেছি শহর কলকাতায়। দেহে মনে তারুণ্যের উন্মাদনা। স্বাধীন দেশের নাগরিক। পড়েছি স্বামীজীর বাণী ও রচনার কিছু কিছু, মহাত্মাজী ও নেতাজীর জীবনী। ভিতরে ভিতরে কত আকাঙ্ক্ষা— আঠারো বছর বয়সের ধর্ম। সময় পেলেই কলেজ থেকে সোজা বেলুড় মঠে যাই, কখনও একা, কখনও দলবলসহ।

একদিন একা গিয়েছি মঠে। পুরোনো মন্দিরে প্রণাম করে স্বামীজীর ঘরে যাব ভাবছি। দেখি বারান্দায় পূজ্যপাদ স্বামী নির্বাণানন্দজী, অভয়ানন্দজী, প্রবোধানন্দজী, শাশ্বতানন্দজী, চিদানন্দজী মহারাজ, কেউ বেঞ্চিতে বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। স্বামী নির্বাণানন্দজী সহসা পেশী ফুলিয়ে বললেন: "কুস্তি করতে পারিস?" শাশ্বতানন্দজী বললেন: "চোখ দেখে মনে হয় তুমি কমিউনিস্ট।" কথাটি একেবারেই মনঃপূত হল না। ভয়-ডর ছিল না, অসঙ্কোচে বললাম: "আমি কমিউনিস্ট নই, তথাকথিত কোনও ইজম্ আমার মধ্যে নেই, আমি বুঝি হিউম্যানিজম্।" সন্ন্যাসী মহারাজদের সে কী হাসির রোল! এখনও শুনতে পাই। একদিন গেলাম পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর কাছে। অনেকক্ষণ কাছে বসিয়ে কথা বললেন। উঠে আসার সময় বললাম, আবার কবে আসব মহারাজ? মিষ্টি হেসে বললেন: "Take your chance." এই 'chance' আমি নিয়েছি।

* * *

শুনেছি যোগোদ্যানের কথা। পূজ্যপাদ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী তখন ওখানে। কেউ কেউ আমায় বলেছেন, উনি ভয়ঙ্কর কড়া। তা হোক, আমাকে যেতেই হবে। গেলামও। প্রণাম করে উঠতেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন, বেশ জেরা করলেন। ঘাবড়াইনি। কিছুক্ষণ পরে সুর বদলে গেল। বাহ্য-কাঠিন্যের আবরণ ভেদ করে বয়ে গেল স্নেহের প্রস্রবণ।

বললেন: "স্বামীজীর কোন্ মূর্তি ভালবাস?"

—পরিব্রাজক বিবেকানন্দ।

—কেন?

বললাম: "মাতৃভূমি ভারতকে দেখতে দেখতে চলেছেন সন্ন্যাসী, দেখছেন স্বদেশের জনগণকে।"

খুশি হয়ে বললেন: "বেশ, বেশ।" পরক্ষণেই বললেন:

"আচ্ছা, চিকাগো বক্তৃতায় দণ্ডায়মান স্বামীজীকে দেখ তো। পৃথিবীর কাউকে ভয় পান না, যোদ্ধৃবেশে, এক অপরাহত শক্তি, মনে রেখো ।" আর একদিন গিয়েছি ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে । খুশি হয়ে বললেন : "এমনি করেই আসতে হয়, আমরা তো শরৎ মহারাজের কাছে এমনি করেই যেতুম ।" সময় পেলেই যাই, শুনি শুধু স্বামীজীর প্রসঙ্গ ।

* * *

কেটে গেছে কয়েকটি বছর । এলাম নিবেদিতাতীর্থে, নিবেদিতা স্কুলে । ঠাকুরদালানে দেখলাম শ্রীশ্রীমায়ের ছবি, বসে আছেন । অন্যদিকে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি— শ্বেতপাথরের, তারই পাশে দেওয়ালে শ্রীশ্রীমা ও সিস্টারের ছবি, দুজনে মুখোমুখি । জেগে উঠল শৈশবস্মৃতি । সেই মা, সেই সিস্টার— 'দেখে দেখে আঁখি না ফিরে ।' এক বিচিত্র অনুভূতি, আজও ।

নিবেদিতা স্কুলে দীর্ঘকাল বাস করার সুযোগ পেয়েছি । এ এক পরম প্রাপ্তি । ভগিনী নিবেদিতার শতবর্ষ জন্ম জয়ন্তী পালিত হচ্ছে । ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ অক্টোবরের পুণ্যপ্রভাতে বেজে উঠল মঙ্গল শঙ্খ । বিদ্যালয়ের দ্বারদেশে নিবেদিতার বিশাল প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে মঙ্গলারতি করছেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ও সেবিকা, ভগিনী নিবেদিতার ছাত্রী, শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা পূজনীয়া প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী । এই বিদ্যালয়ে তিনি মাঝে মাঝে এসে বাস করতেন, শোনাতেন ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী সুধীরার অনুপম আত্মত্যাগের কথা ও কাহিনী । মনে হত সেই কালটি যেন কথা কইছে ।

এই শতবর্ষ জয়ন্তীতে স্কুলে শুভাগমন করেছেন পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, অভয়ানন্দজী, ওঙ্কারানন্দজী ও গম্ভীরানন্দজী মহারাজ, নিবেদন করেছেন শ্রদ্ধাঞ্জলি । মহাজাতি সদনে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : "এই মহান নিবেদিত জীবন (নিবেদিতা) দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করুক স্বদেশের সেবায় ।" নিবেদিতা ভারতের সঙ্গে একাত্ম । ঐ দিনটিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সম্পর্কেও একটি সপ্রশংস উক্তি শুনেছি । নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীরা কী disciplined! নিজেদের নির্দিষ্ট আসনগুলি তারা ছেড়ে দিয়েছে অতিথিদের জন্য! লিখেছেন : 'ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অব বেসিক এডুকেশন' (দিল্লী)-এর ডিরেক্টর প্রয়াত হিমাংশু বিমল মজুমদার । সন্তানের গৌরবে নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করেন পিতা-মাতা, ছাত্রছাত্রীর গৌরবেও তেমনি আনন্দিত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী । প্ল্যাটিনাম জুবিলিতেও আমরা পেয়েছি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজকে । ঠাকুরদালানে বসে বলছেন মহারাজ । দেওয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজী, ভগিনী নিবেদিতা, ক্রিস্টিন ও মহামানবদের সুবৃহৎ প্রতিকৃতি । মনে হল সকলে সশরীরী— সে এক বিচিত্র অনুভূতি ।

* * *

কী পেয়েছি এই বিদ্যালয়ে ? এক নতুন দৃষ্টি । তৎকালীন (১৯৬৭) প্রধান শিক্ষয়িত্রী পূজনীয়া শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজী একদিন শিক্ষাপ্রসঙ্গে বললেন : "এখানকার হেডমিস্ট্রেস, এখানকার অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীমা ।" এমন কথা কখনও শুনিনি । কী গভীর অর্থবহ ! সেদিন আরও বললেন : "দেখ, ঠাকুরঘরে পবিত্রপ্রাণাজী কী নিষ্ঠাভরে পুজো করছেন । আমাদের অমনি নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করতে হবে শত শত বালিকা সারদাকে, খুদে সারদাকে ।" মনে পড়ল যোগোদ্যানের স্মৃতি । স্বামী ওঙ্কারানন্দ মহারাজকে একদিন বলেছিলাম : "মহারাজ, আমায় পুজো শিখিয়ে দিন ।" উত্তরে বললেন : "...নিবেদিতা স্কুলে গিয়ে লক্ষ্মীকে (শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজী) বলবি, পুজো শিখিয়ে দেবে ।" পুজোর কথা বলতে হল না তাঁকে । আপনা থেকেই পুজোর পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন তিনি । সেই পুজো এখনও চলছে ।

* * *

প্ল্যাটিনাম জুবিলির শুভ আরম্ভ । বিদ্যালয়ে এসেছেন শ্রীসারদা মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষা পূজনীয়া প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী । শুনিয়েছেন তাঁর শুভেচ্ছা-বাণী । ঐ সংক্ষিপ্ত বাণীর মধ্যে বিধৃত ছিল নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পদযাত্রার ইতিবৃত্ত— স্বামীজীর পরিকল্পনা, শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ, নিবেদিতার আত্মদান এবং বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দের হিতচিন্তা ও সদাজাগ্রত দৃষ্টি যা দুস্তর বাধা অতিক্রম করে বিদ্যালয়ের পদযাত্রার গতিকে অব্যাহত রেখেছে । আমার মনে হয়েছে এই যাত্রায় যাতে তালভঙ্গ না হয়, অধ্যক্ষা মাতাজী আমাদের সেই ইঙ্গিত দিলেন ।

* * *

এই কালে একদিন পূজনীয়া দয়াপ্রাণামাতাজী দোতলায় অফিসের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমায় বলছেন : "কত ঝড় বয়ে গেছে স্কুলের ওপর দিয়ে । স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ ঐ কালে কী আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সেই ঝড়ের সম্মুখীন হয়ে কিভাবে তাকে প্রতিহত করেছেন !" দোতলায় ১৫ নং ঘরের দরজার ওপরে পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের একটি ফটো টাঙানো ছিল । লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন । সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় মনে হত, মহারাজ যেন বলছেন : সতর্ক হয়ে কাজ কর ।

বিদ্যালয়ের বিবিধ উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সরস্বতী পুজো, স্বাধীনতা দিবস, বার্ষিক উৎসব ও প্রতিষ্ঠাত্রী দিবস । একবার

স্বাধীনতা দিবসে আমরা ছাত্রীদের দিয়ে চার্টে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরেছি। দোতলার সারা দেওয়াল জুড়ে ৩৫/৩৬টি চার্ট। শ্রীসারদা মঠ থেকে এসেছেন পূজনীয়া প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণামাতাজী, বসেছেন অফিসরুমে। ডাক পড়েছে আমাদের। অফিসে গিয়ে দেখি মুক্তিপ্রাণামাতাজী নিবিষ্ট মনে একটির পর একটি চার্ট পড়ছেন। ভয়ে বুক দুরু দুরু, এই বুঝি কিছু শুনব। যা ভেবেছি, ঠিক তাই। কাছে ডেকে দেখিয়ে দিলেন ইতিহাসের একটি তারিখ ভুল। ইতিহাসের সাল, তারিখ তাঁর নখদর্পণে। তিনি চাইতেন প্রত্যেকটি কাজে perfection.

বিদ্যালয়ের একতলায় তিনদিক দিয়ে তিনটি সিঁড়ি। ওপরে উঠতে গেলেই প্রত্যেক সিঁড়ির ওপরে ঠাকুর, মা, স্বামীজী, নিবেদিতা, ক্রিস্টিন কারুর না কারুর প্রতিকৃতি। তিনতলায় ও চারতলাতেও ঐরকম। একদিন তন্ময় হয়ে দেখছি। পূজনীয়া আত্মপ্রাণামাতাজী লক্ষ্য করে বললেন : "কি জান, সবসময় আমরা ওঁদের দেখব, আমাদের মন ঐ দিকেই থাকবে।" শুনে মনে হল, ওঁরাও আমাদের দেখছেন। আত্মপ্রাণামাতাজীর কাছে আমরা শাস্ত্র পড়তাম। একদিন একটি শব্দার্থ জিজ্ঞাসা করলে বললেন : "শব্দের root বের করে অর্থটি বোঝ।" জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থী নিজেই উত্তর খুঁজে বের করবে, এই তাঁর পদ্ধতি। তাঁর সান্নিধ্যে এসে অর্জন করেছি শাস্ত্রপাঠের প্রতি শ্রদ্ধা। নিজেকে শিক্ষয়িত্রী যত না ভেবেছি, ভেবেছি একজন বিদ্যার্থী।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে পৌরোহিত্য করতে এসেছেন পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ। তাঁর ভাষণের প্রথম বাক্যটি ছিল : "আজ নিবেদিতাতীর্থে এলাম।" আমার বিশ্বাস দৃঢ় হল, ভারততীর্থের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই নিবেদিতাতীর্থ।

* * *

১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের এক শীতের সকাল। বেলুড় মঠে গিয়ে মন্দিরে মন্দিরে প্রণাম করে পূজ্যপাদ স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজের কাছে গিয়েছি। প্রণাম করে উঠতেই পরপর কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। একটি প্রশ্ন ছিল, স্বামীজীর প্রকৃত শিষ্য কে? উত্তর দেব ভাবছি, সহসা তিনি বলে উঠলেন : "সিস্টার নিবেদিতা।" ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন : "কেন জান? স্বামীজীর মন্ত্র ছিল 'অভীঃ'। নিবেদিতা এই মন্ত্রের উপাসিকা।" মহারাজের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একেবারে আত্মমগ্ন। কী অত্যাশ্চর্য তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ! কী শ্রদ্ধা নিবেদিতার প্রতি! ফিরে এলাম স্কুলে। কথাটি কানে বাজতে থাকে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে কখনও শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি, কখনও বলরামমন্দির, বোসপাড়া লেনের যত্র তত্র, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, গঙ্গার ঘাট, বাগবাজারের অলি-গলি সর্বত্রই আনাগোনা করি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের পাদস্পর্শে পূত এই পথের ধূলি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদবৃন্দ, মায়ের লীলাসঙ্গিনী, সন্ন্যাসী-গৃহী, জ্ঞানী-গুণী, মানী-ধ্যানী সকলের সঙ্গে এই পথের মিতালি। বোসপাড়া লেনের ঐ ১৬ নম্বর জীর্ণ বাড়িটিকে আশ্রয় করেই যে তপস্যা করেছিলেন সর্বংসহা নিবেদিতা। পথের দেবতা প্রসন্ন হাসি হেসে বলেন, কোথায় পাবে এমন তীর্থ?

পথ চলতে চলতে মনে হয়েছে 'অভীঃ' মন্ত্রটি নিবেদিতা পেয়েছিলেন কখন? ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দ। স্বামীজী লন্ডনে এসেছেন দ্বিতীয়বার। একদিন ক্লাসে একচোট বাদানুবাদের পর স্বামীজী সহসা বলে উঠলেন : "জগতে আজ কিসের অভাব জান? জগৎ চায় এমন বিশজন নর-নারী, যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, 'ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল।' কে কে যেতে প্রস্তুত?" সপ্রতিভ মার্গারেট ভাবছেন, উঠে দাঁড়াবেন। পরক্ষণেই স্বামীজীর কণ্ঠে বজ্রবাণী : "কিসের ভয়, যদি ঈশ্বর আছেন, একথা সত্য হয়, তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন? আর, যদি একথা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেই বা ফল কী?" বজ্রেও বাঁশী বাজে। বাঁশী কথা বলে— 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় আত্মোৎসর্গই জীবন। কিসের ভয়? না ভয় নেই। মনে হয় নিবেদিতার 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষা এখানেই। তিনি ঐ বিশজনের একজন। গুরু বিবেকানন্দের আহ্বানে সর্বস্ব ত্যাগ করে ঈশ্বরকে সম্বল জেনে মার্গারেট নোবল পথে নামলেন— এ পথ ভারততীর্থের পথ। এ তাঁর মহাভিনিক্রমণ।

* * *

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি, মার্গারেট পৌঁছলেন ভারততীর্থে। শ্রীগুরু তাঁকে স্বাগত জানালেন। এবার মার্গারেট থেকে তাঁর নিবেদিতায় পরিণতি— এ ইতিহাস সর্বজনবিদিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে অর্জুন তাঁর 'বিশ্বরূপ দর্শন' করেছিলেন। গুরু বিবেকানন্দ শিষ্যাকে দিব্যদৃষ্টি দিলে তাঁর হল 'ভারতদর্শন'। গুরুর সঙ্গে তীর্থপরিক্রমা করে নিবেদিতা উপলব্ধি করলেন ভারতের সবই দেবময়। এই কালের উল্লেখ্য তিনটি দিন। ১৭ মার্চ নিবেদিতা দর্শন করলেন 'যুগধর্মপাত্রী' শ্রীমা সারদাদেবীকে। মা তাঁর কাছে ধরা দিয়েছেন। মায়ের মহিমা উপলব্ধি করে নিবেদিতা বলেছেন : "আমার সবসময় মনে হইয়াছে তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী।" আর একটি দিন ২৫ মার্চ, তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দময় প্রভাত। ঐ প্রভাতে স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষাদান করে জগন্মাতার চরণে উৎসর্গ করেন। "তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।" এমনই আর একটি দিন ১৩ নভেম্বর, অমাবস্যা। এই দিনে নিবেদিতার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে। জগজ্জননী সারদা-সরস্বতী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন পূজা সমাপন করে ভাবী ছাত্রীদের

উদ্দেশে আশীর্বাণী করেন : "আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের উপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে ।" মনে হয় এ আশীর্বাদের অংশভাক্ আমরাও । কারণ, আদর্শ বালিকা গঠনের দায়ভার আমাদের উপর ন্যস্ত । দিনটির তাৎপর্য আরও একটি কারণে, স্বামীজী-পরিকল্পিত ভাবী সারদা মঠের বীজ পরোক্ষভাবে বপন করা হল এইদিনে ।

এই বিদ্যালয়েই নিবেদিতার তপস্যা— সতীর তপস্যা । জয় করেছেন তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ; লাভ করেছেন গুহাহিত আনন্দ । এ আনন্দ এসেছে সংগ্রামের পথে । ১৯০২—১৯১১ এই কালবৃত্তে নিবেদিতার যে সাধনা তা অপার সংগ্রামের— এর অপর নাম 'পূজা' । তিনি জানতেন, 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার ।' ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর মহাসমাধি । তাঁর চিত্ত শোকসংবিগ্ন । শোকপ্রকাশের সময় কোথায় ? পরাধীন ভারতের দুঃসহ জ্বালায় তিনি উন্মত্তপ্রায় । দেশবাসীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকবেন কী করে ? অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে : "... ব্রত উদযাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ ।" 'ক্ষত্রিয়-শোণিতে' যাঁর জন্ম, গুরুকৃপায় অপ্রতিহত মহাশক্তির অধিকারিণী যিনি, তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 'যোদ্ধৃত্ব' । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাসৈনিকদের তিনি প্রেরণাদাত্রী । 'জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্'— গীতার এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়নি কি তাঁর চিন্তায়, কর্মে ও বক্তৃতায় ? ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ, মনুষ্যত্ব এই দৈবী সম্পদে ঋদ্ধ, স্বামীজীর ঈপ্সিত চরিত্র নিবেদিতা । ছাত্রীদের তিনি শুনিয়েছেন স্বদেশমন্ত্র— "ভারতের কন্যাগণ, তোমরা জপ করবে— 'ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ! মা, মা, মা !' সঙ্গে সঙ্গে করধৃত জপমালা নিয়ে জপ করেছেন এই মন্ত্র ।"

* * *

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনের অন্তর্গত এক প্রদর্শনীতে তাঁর ছাত্রীদের তৈরি ও তাঁরই পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা প্রদর্শিত হয় । গাঢ় রক্তবর্ণের জমির ওপর সোনালী সুতোর বজ্র ও দুপাশে লেখা 'বন্দে মাতরম্'— এখনও বিদ্যালয়ে আছে । আর্ত, পীড়িত, বিদ্যার্থী, কবি, শিল্পী-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ্ সকলের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন 'সেবিকা, বান্ধবী, মাতা' রূপে । "নিবেদিতা গুরুগিরি করতে আসেনি, প্রাণ দিতে এসেছে"— বলেছেন স্বামীজী । নিবেদিতা কী চেয়েছেন ? ''In India I am born, in India I shall die''— এই তাঁর ভারতপ্রেম ।

নিবেদিতা কে ? তিনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন— তিনি শ্রীমার 'অবোধ খুকি', তিনি 'Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda.' সত্যই কি তিনি মায়ের অবোধ খুকি ? না । শরৎ মহারাজকে দিয়ে শ্রীমা তাঁর মনের ভাবটি ইংরেজী চিঠিতে লিখিয়েছিলেন : ''You are a manifestation of the ever-blissful Mother.'' মনীষীই মনীষাকে উপলব্ধি করতে পারেন । সন্ন্যাসের অর্থ ত্যাগ-তিতিক্ষা । চির সন্ন্যাসিনী নিবেদিতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বলেছেন কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথ : "...তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্ত কালের জন্য দৃকপাত করেন না ।" নিবেদিতাই নিবেদিতার উপমা । ভেসে আসছে প্রশান্তগম্ভীর সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর— "স্বামীজীর প্রকৃতশিষ্য— নিবেদিতা, 'অভীঃ' মন্ত্রের উপাসিকা ।"

* * *

মহাতীর্থ নিবেদিতা বিদ্যালয়, এক দিব্যভাবে পরিপূরিত । এখানে চলেছে এক অখণ্ড যোগের সাধনা, সে সাধনায় রত ছাত্রী ও শিক্ষিকাবৃন্দ । বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তির পুণ্যবাসরে সম্মিলিতভাবে প্রণাম করি— বিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে, বিদ্যাস্থানকে, ভগিনী নিবেদিতাকে ।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, বর্তমানে শ্রীসারদা মঠের ভুবনেশ্বর শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষা ।

সত্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতাই সাফল্যের চাবিকাঠি

ভাস্বতী সেনগুপ্ত

[নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রাক্‌শতবর্ষ আন্তর্বিদ্যালয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা ।]

"সত্যের সন্ধান থেকে আমি বিরত থাকব এই শর্তে আমাকে যদি মুক্তি প্রদান করা হয়, তাহলে আমি বলব, হে এথেন্সবাসিগণ তোমাদের ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ঈশ্বরের আদেশই মান্য করব ।... এবং যতদিন পর্যন্ত আমার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হবে, আমার ক্ষমতা থাকবে, ততদিন আমি আমার আরব্ধ ব্রত থেকে বিরত থাকব না ।... যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাকেই জিজ্ঞাসা করব জ্ঞান ও তথ্যের অনুসন্ধান না করে, আত্মার উন্নতিবিধানে সচেষ্ট না হয়ে ঐশ্বর্য ও খ্যাতির প্রতি প্রলুব্ধ হতে তুমি লজ্জা বোধ করো না ।... নিজের কর্তব্যসাধনে বিরত থাকা অত্যন্ত অন্যায়, যা আমি মন্দ বলে জানি, তা বর্জন করে উত্তমকে গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর বলে মনে করি ।" প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও দার্শনিক সক্রেটিসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হলে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এটিই ছিল তাঁর শেষ উক্তি ।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একজন মানুষের যা উপলব্ধি, অভিজ্ঞতার্জিত সেই উপলব্ধিই তার কাছে সত্য এবং সেই সত্যকে আঁকড়ে থাকার নামই নিষ্ঠা । "বিশ্ব যদি চলে যায়, কাঁদিতে কাঁদিতে/ আমি একা বসে রব সঙ্কল্প সাধিতে"— এই হল প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা । কিন্তু সত্যের প্রতি এই অবিচলিত নিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য যে-অসীম মনোবলের প্রয়োজন, সেই আত্মশক্তি সর্বদা মানুষের থাকে না । বিরোধী পক্ষের ভয়ে ক্ষুদ্র প্রাণধারণের স্বাভাবিক প্রবণতা নিষ্ঠা থেকে মানুষকে সাময়িকভাবে বিচ্যুত করে । সেটা তার দুর্বলতা । কিন্তু মানুষের সেই দুর্বলতা দেখে বিরোধী পক্ষের উল্লাস প্রকৃত সত্যকে পৃথিবী থেকে অপসারিত করতে পারে না । আর তাই *'Eppur si muove'* — সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে এই সত্যের প্রচারক গ্যালিলিওকে তৎকালীন ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের ধর্মযাজকদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হলেও জাগতিক নিয়মের কোনও অন্যথা হয়নি ।

"তোরে বারে বারে ডাকতে হবে, হয়তো দুয়ার খুলবে না/ তাই বলে ভাবনা করা চলবে না,"— এই আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন যুগের কালজয়ী মহাপুরুষদের তাৎক্ষণিক সাফল্যের মোহ ও আকাঙ্ক্ষা আচ্ছন্ন করতে পারেনি বলেই যত অত্যাচার ও বাধাবিঘ্নের মুখে দাঁড়িয়েও তাঁরা বিশ্বাস করতেন, "সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্ ।"

মানুষের অন্তরে সত্যনিষ্ঠার আদর্শ গড়ে ওঠবার প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয় শৈশবেই । শিশুর পারিবারিক আচার-আচরণ, পারিপার্শ্বিক সমাজই একমাত্র গড়ে তুলতে পারে সত্যের প্রতি তার একনিষ্ঠতাকে, জাগ্রত করতে পারে সেই সুপ্ত চেতনাকে যা তাকে আজীবন বাধা দেবে কোনপ্রকার অন্যায়, অসত্য আচরণ করতে ।

"সত্যের জন্য সবকিছুকেই ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনকিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না"— সর্বকালের সর্বক্ষেত্রে অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ ও মহাবলিষ্ঠ এই বাণীটির প্রচারক যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ । শৈশবেই মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর কাছে সত্যনিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । "ফল যাই হোক না কেন, যা সত্য বলে মনে করবে, তাই করে যাবে"— মায়ের এই পরিপূর্ণ উপদেশের পরিপূর্ণ রূপ তিনি দেখেছিলেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : "সত্যই কঠিন তপস্যা ।" মা এবং গুরুদেব উভয়ের জীবনে সত্যনিষ্ঠার যে-আদর্শ দেখেছিলেন, তা স্বীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ রূপায়িত করেছিলেন, ভারতের এই বীরসন্তান ।

আর স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সেই সনাতন হিন্দুধর্মের

প্রতিনিধি, যে-ধর্মের অন্যতম ঐহিক সম্পদ উপনিষদের মূল আদর্শই হল নির্ভীক সত্যানুসন্ধান । এই ভারতীয় সংস্কৃতিরই আর এক মূল্যবান সম্পদ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব রচিত মহাভারত । মহাকাব্যের যুধিষ্ঠিরের চরিত্রটি ছিল সত্যনিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক । মহাভারতের এক তেজস্বিনী নারীচরিত্র শতপুত্রবতী গান্ধারী কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে নিরানব্বই জন পুত্রের মৃত্যুর পরেও নিজ অসৎ দুর্নীতিপরায়ণ পুত্র দুর্যোধনকে যুদ্ধে জয়লাভের বরদান করেননি । তিনি সর্বদাই বলেছেন : "ধর্মের জয় হোক ।" কারণ তিনি জানতেন, কোনও ভাবেই অন্যায় অসত্য আচরণ ধর্ম ও সত্যের জয়ের পথে বাধা দান করতে পারে না ।

শুধু মহাভারতে নয়, সত্যনিষ্ঠার উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র, যাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অগ্রাধিকার পেয়েছে সত্যের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি । পিতৃসত্য পালনের জন্য নিজের প্রাপ্য সিংহাসন ও রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে, নির্দ্বিধায় তিনি নিজেকে নির্বাসিত করেছিলেন নির্জন বনাঞ্চলে ।

ত্রেতাযুগে মহারাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য স্ত্রী-পুত্রকে পরিত্যাগ করে নিজে চণ্ডালের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন । সত্যনিষ্ঠার অপর জ্বলন্ত উদাহরণ শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের ধর্মপরায়ণতা । আধুনিক যুগেও কিশোর শহীদ ক্ষুদিরাম বসু, জাতির জনক গান্ধীজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—তাঁদের সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতাও দেশাত্মবোধের জন্য শুধু বিশ্ব ইতিহাসেই উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে নেই, তাঁরা এই পুণ্য ভারতভূমিকে এনে দিয়েছিলেন আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ।

সুতরাং দেখা গেছে শুধু ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে অনাদি কাল থেকে সত্যই তার প্রাপ্য জয়মাল্যে ভূষিত হয়েছে । মিথ্যার কপট রূপ কিছু অন্ধ মানুষকে সাময়িকভাবে হয়তো আচ্ছন্ন করে রেখেছে, কিন্তু প্রকৃত সত্যকে ধরাতল থেকে চিরতরে অপসারিত করা তার পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হয়নি ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌন্তেয় অর্জুনকে হতাশা পরিত্যাগপূর্বক রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হতে উৎসাহিত করার জন্য বলেছেন :

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥

— সুখদুঃখে অবিচলিত যে জ্ঞানী ব্যক্তিকে কোনও অবস্থা বা দ্বন্দ্বই আত্মার নিত্যত্ব জ্ঞান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, তিনিই অমৃতত্ব লাভের প্রকৃত অধিকারী ।

মানুষকে সাফল্যের সোপানে উত্তীর্ণ করতে শুধু সত্যনিষ্ঠ নয়, প্রয়োজন হয় আন্তরিকতারও । অন্তর থেকে উৎসারিত যে অকৃত্রিম মনোভাব অন্তরস্থ আত্মার উদ্বোধন ঘটায়, তাই-ই আন্তরিক । তাই পক্ষান্তরে বলা যায়, সত্যনিষ্ঠার আদর্শও তার অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে অন্তর থেকে স্ফূরিত হয় ।

প্রাথমিক ব্যর্থতায় হতোদ্যম না হয়ে কোনও কর্মে আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করা হলে সাফল্য সেই কর্মে আসবেই । গীতায় বলা হয়, নিষ্কাম কর্মই কর্মের বিশুদ্ধ রূপ । "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।" ফলের আশা না করে যে-কর্ম করা যায়, তাই-ই নিষ্কাম কর্ম, যা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলে মোক্ষলাভের পথে । কোনও কর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকলে তবেই নিষ্কাম কর্ম সম্ভব । তাই সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালবাসা, স্নেহ আন্তরিক । আবার পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যবোধ যদি হয় নিছক বাহ্যিক বা জাগতিক, তবে সেই কর্তব্যবোধে থাকে না আন্তরিকতার পরশ । আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশের জন্য তাই প্রয়োজন হয় না, কোনও বাহ্যিক আড়ম্বর বা আতিশয্যের । আন্তরিকতা যদি মানুষকে ঐহিক সাফল্য নাও দেয় তবু বিশ্ব ইতিহাসে তার মানবিকতা, বাঙ্‌নিষ্ঠাকে করে রাখে চিরস্মরণীয় । এর জলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন, মহাভারতের এক বিশিষ্ট চরিত্র নিষাদপুত্র একলব্য ।

কপটতা, ছলনা, দুর্নীতি তাঁর যোদ্ধৃজীবনকে ধ্বংস করে দিলেও অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত একাগ্রতা, কঠোর অধ্যবসায় ও অতুলনীয় গুরুনিষ্ঠা একলব্যকে মানুষের মনে আজও করে রেখেছে অক্ষয়, অবিনশ্বর ।

শুধু মহাভারতে নয় রামায়ণের যুগেও দেখা গেছে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম আন্তরিক ছিল বলেই বিনা প্ররোচনায় ভরত সিংহাসন ও বিপুল ধনরাশির মোহ ত্যাগ করে অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করেছিলেন ।

পরবর্তী কালেও লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও যুগনায়কদের ক্ষেত্রে শত প্রতিকূলতা ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁরা সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেছেন কেবল সত্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে পাথেয় করে ।

কিন্তু বর্তমান ধারাবাহিক দুর্নীতিপরায়ণতার যুগে সত্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ঐ সনাতন আদর্শের উপর আস্থা রাখা ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে । শঠ, কপটদের অন্যায় সাফল্য আমাদের সেই বিশ্বাসের মূলে বারংবার কুঠারাঘাত করে । কিন্তু আশার কথা এই যে, "চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না ।" তাই আমরা দৃঢ়- নিশ্চয় অনাগত ভবিষ্যতে সেইসব অন্যায় সাফল্য প্রাকৃতিক নিয়মেই ধরাতল থেকে তিরোহিত হবে । আর সেদিনই বিশ্বমানবের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা যাবে, আমাদের সেই চির আকাঙ্ক্ষিত বাণী, 'জয়, জয় সত্যের জয়... ।' মূল্যবোধের যে ক্রমাগত অবক্ষয় পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এক অনিশ্চয়তার দিকে, সত্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার বলে বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই ঐ হৃত মূল্যবোধকে পুনরুদ্ধার করবে ; নিখিল মানবজাতির উত্তরণ ঘটাবে মানবত্বের পথে । পৃথিবীতে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে আদি অকৃত্রিম সেই আদর্শ— সত্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা মানবজীবনের সাফল্য অর্জনের প্রকৃষ্ট পথ ।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন নিবেদিতা গার্লস স্কুল-এর নবম শ্রেণীর ছাত্রী ।

একটি আলোকচিত্র

প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের বাগবাজার পল্লী । হিন্দুপরিবারে তখনও জাতপাতের বিচার প্রবল । সেখানে 'ম্লেচ্ছ বিদেশী'দের অন্তঃপুরে আবাহন করা ! এমনই সঙ্কীর্ণ পরিবেশে বাগবাজারে ১০/২ নং বোসপাড়া লেনে তখন বাস করছেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী । জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় এসেছেন ।

স্বামী বিবেকানন্দ যেন অপেক্ষায় ছিলেন । হিন্দুসমাজে তখন কেবলই বর্জন ; গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত হয়নি । স্বামীজীর বিদেশী শিষ্যা ও ভক্তদের সাগ্রহ সমাদর করেছিলেন সেদিন তাঁরই সন্ন্যাসী গুরুভাইরা । তাঁরা তো সামাজিক বিধিনিষেধ ও রীতিনীতির অধীন নন । এক ধর্মান্দোলন সবে তখন রূপ নিতে শুরু করেছে । ভুবনত্রয় তাঁদের স্বদেশ । সুতরাং স্বামীজীর 'ম্লেচ্ছ শিষ্য'-দের গ্রহণ করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হননি ।

১৭ মার্চ স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্যের শিষ্যাদের শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন । গ্রামের মেয়ে সারদাদেবী । লেখাপড়া শেখা আধুনিক মেয়ে নন । বাইরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তাঁর কোনও পরিচয় নেই । একবার গভীর সমাধি থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন : "দেখ গা, আমি একদেশে গেছলুম— সেখানকার লোক সব সাদা সাদা । আহা, তাদের কি ভক্তি !" শ্রীমা সে কথা শুনে অবাক হয়ে ভেবেছিলেন 'সাদা সাদা মানুষ আবার কি!' আরও বলেছিলেন : "তখন কি বুঝতে পেরেছিলুম এই ওলি বুলরা সব ভক্ত হবে ?" বোঝা যায় মায়ের হৃদয়ে তাঁর বিদেশী সন্তানদের গ্রহণের একটি ব্যাকুলতা ও প্রতীক্ষা ছিল । তাঁর মাতৃহৃদয় দেশ-জাতি-কালের ব্যবধান উপেক্ষা করে উন্মুখ ছিল সকলকেই বরণ করতে ।

বাগবাজারের বনেদি রক্ষণশীল পরিবেশে তিনজন বিদেশিনী এলেন বোসপাড়ায় মায়ের কাছে । তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুপুঙ্খ বর্ণনা লেখাজোখা নেই । তার উল্লেখ পাই ঐ মার্চ মাসেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত স্বামীজীর এক পত্রে । তিনি যেন শ্রীশ্রীমায়ের উদার ব্যবহারে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন । ঐ একবারই আমরা শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে তাঁকে বিস্ময় প্রকাশ করতে শুনি : "শ্রীমা এখন এখানে ! ইউরোপীয় ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন । তারপর কি কাণ্ড, ভাবতে পার— মা তাঁদের সঙ্গে খেলেন পর্যন্ত ! দারুণ ব্যাপার নয় কি !" পত্রটি লিখেছিলেন ইংরেজীতে । শ্রীশ্রীমায়ের উদার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে বিদেশী মেয়েরা মুগ্ধ । মা তাঁদের গ্রহণ করেছিলেন— 'আমার মেয়ে' বলে ।

বাস্তবিক মা আমাদের সমাজের কত বদ্ধ দ্বার এমন নিঃশব্দে খুলে দিয়েছেন— তা আজ আমরা ভাবতেও পারি না । মা খুলেছিলেন ভারতের অন্তঃপুরের দ্বার পাশ্চাত্যের অন্তঃপুরচারিণী অথচ স্বাধীন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল মেয়েদের সামনে । তাঁরা সবদিক দিয়েই ছিলেন বিদগ্ধ সমাজের প্রতিভূ ।

দিনটি কোনদিন সামান্য ভাবেননি তাঁরা । বিশেষ করে নিবেদিতা তাঁর রোজনামচায় লিখে রেখেছিলেন : 'day of days' অর্থাৎ জীবনের এক দুর্লভ দিন, সুধন্য দিন । সেদিনের সমাজে এই ঘটনায় কোনও তরঙ্গ উঠেছিল কিনা জানা যায় না । তবে ঘটনাটি যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । তখন ছবি তোলার রেওয়াজ বড়-একটা ছিল না । হয়তো আমরা শ্রীশ্রীমায়ের কোনও ছবি পেতাম না, যদি না এঁরাই পরে কোন একদিন আয়োজন করতেন তাঁর ছবি তোলার । অবগুণ্ঠিতা লজ্জাশীলা মায়ের ঐ ছবি তোলা বিদেশিনীদের পক্ষেই তখন

সম্ভব । আমাদের অন্তঃপুর ও শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানরা কেউই এই দুঃসাহসিক প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারতেন কি মায়ের সামনে !

শ্রীমায়ের ছবি পেয়ে যেমন নিবেদিতা, ম্যাকলাউড ও সারা বুল আনন্দিত হয়েছিলেন, শ্রীমাও তিনটি ছবির মধ্যে নিবেদিতার সঙ্গে ছবিটিও তাঁর কাছে রেখে দিয়েছিলেন । নিবেদিতা যখন পাশ্চাত্যে স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত তখন মা স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে দিয়ে একটি পত্র লিখিয়েছিলেন । সে পত্রে ছিল : "...তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি । আমার সঙ্গে একত্রে তোলা তোমার ফটোটির দিকে আমি অনেক সময় চাহিয়া দেখি, তখন মনে হয়, তুমি যেন নিকটেই রহিয়াছ ।"

সারা বুলের বিশেষ ইচ্ছায় শ্রীশ্রীমায়ের তিনটি ছবি তোলা হয় । মায়ের একার ছবি ছিল দুটি এবং নিবেদিতার সঙ্গে একটি । এই তৃতীয় ছবিটি সম্বন্ধে সংশয় ছিল । অনেকে মনে করতেন, ওটি প্রকৃত ছবি নয় । দুটি আলাদা তোলা ছবি একত্র করা হয়েছে । পরে ছবিটির negative পাওয়া গেলে বোঝা যায় মায়ের সঙ্গে নিবেদিতার ছবিটি একটি দুর্লভ চিত্র এবং মায়ের পত্রেও তার উল্লেখ আছে ।

এবারের শতবর্ষ উৎসবের লগ্নে ঐ অপূর্ব যুগ্মচিত্রটি প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে । এ যেন এক ভাবী মিলনের প্রতিশ্রুতি । ভারতের অন্তঃপুর, যা চিরদিন সুরক্ষিত থাকতেই একান্ত অভ্যস্ত— সেখান থেকে এল আন্তরিক আহ্বান । এ আহ্বান বৃহত্তর মানবসমাজ, বিশেষ করে বিশ্বের নারীদের জন্য । সেখানেই কবির ভাষায় : "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে ।" মায়ের মহিমা, মা সব গ্রহণ করেও আত্মস্থ । মায়ের এই অবিচলিত ভাব যদি আজ আমরা নিতে পারতাম, হতাম বজ্রের দৃঢ়তায় সুরক্ষিত, অথচ নির্মল আকাশের মতো উদার, প্রসারিত । মা বাইরের বন্ধন সরিয়ে জীবন মিলিয়ে দিলেন অথচ অন্তরে রইলেন মুক্ত ।

নিবেদিতা এক ভারতকে মূর্ত দেখেছিলেন স্বামীজীর মধ্যে । সেই বিবেকানন্দই তাঁকে নিয়ে এলেন ভারতের অন্তরজগতে, এক অধ্যাত্মপ্রতিমার সান্নিধ্যে । আশ্চর্য দৃষ্টি ছিল নিবেদিতার । বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন তিনি । এতো শুধু পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষার প্রকাশ নয়, এ যে অনন্ত শক্তি ও প্রেমের উদ্ভাস । এক সম্রাজ্ঞীর মর্যাদাময় আশ্বাসে ভরপুর, যিনি দেবীসূক্তে বলছেন : "আমি যাকে ইচ্ছা ব্রহ্মা করি, ব্রহ্মজ্ঞানী করি, দান করি মেধা ।"

মায়ের মহিমা বুঝে নিশ্চুপ হয়েছিলেন নিবেদিতা । বিশাল সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে, আকাশ ছোঁয়া হিমগিরির পাদদেশে অথবা এক বিশাল তরুর পাদমূলে যে অনুভূতি জন্মায়, মায়ের সান্নিধ্যে তেমনি এক অনন্তের অনুভূতি জেগেছিল নিবেদিতার চেতনায় । তাঁর কল্পনাকেও শতগুণে অতিক্রম করে গিয়েছিল সেই করুণাভরা মৈত্রীভালবাসার বিগ্রহ শ্রীশ্রীমায়ের শান্ত কোমল মূর্তি । নিবেদিতার চোখে তাই আরতি, নতি ও পরম শরণাগতি । নিজের প্রথম দেখার অনুভূতি বার বার বান্ধবীদের কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছেন । শুভ্রবসনে শোভিত, পবিত্রতা মাখানো সেই মাতৃমূর্তির অনুষঙ্গে মেরিমাতার আদল জেগেছে মনে । ভাষার পেলব তুলিতে ফোটাতে চেয়েছেন সেই অপার্থিব মহিমা— তবু তৃপ্ত হননি । মনে মনে গুনগুন করা বন্দনাটি একবার মাকেই লিখলেন । সে পত্রের আলেখ্য অমর হয়ে রইল সাহিত্যের আঙিনায় মায়ের উদ্দেশে রচিত শ্রেষ্ঠ স্তবকের মতো : "মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি ! আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার মতো উচ্ছ্বাস ও উগ্রতা । তোমার ভালবাসা হল এক স্নিগ্ধ শান্তি যা সকলকে দেয় কল্যাণস্পর্শ এবং কারও অমঙ্গল চায় না... তোমার আনন্দময় ঘরখানিতে তুমি আমায় যে আশীর্বাদ জানালে, তা আমায় দিয়েছিল এক অদ্ভুত মুক্তির অনুভূতি !... প্রেমময়ি মা, চমৎকার একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা যদি তোমায় লিখে পাঠাতে পারতাম !... সত্যই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি ! শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র ।"

বাস্তবিক এত শান্তি, এত পরিপূর্ণ অন্তর্লীন সত্তা তো কখনও নিবেদিতাও দেখেননি । কি আনন্দময়ী, অথচ তাঁর মর্যাদা লঙ্ঘন করার সাধ্য কারও নেই । প্রাচ্যের এই অপূর্ব প্রতিমার মধ্যেই নিবেদিতা দেখেছিলেন অতীতের গার্গী-মৈত্রেয়ী, সীতা-সাবিত্রীকে । সর্বভাবময়ী সারদার মধ্যে মিশে থাকা ভারতের আদর্শ নারীদের চিনেছিলেন নিবেদিতা । তাঁরা যেন প্রাচীনতার খোলসমুক্ত হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন ঐ মহিমময়ী তেজস্বিনীর চরিত্রে । মায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিবেদিতা নিজেই স্তব্ধ । লেখনী চলেছে ধ্যানের গভীরতায় এক অপরূপার রূপের সন্ধানে ।

প্রখ্যাত গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখছেন : "মা নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে আছেন, কী গভীর স্নেহ তাঁর নয়নে । কিন্তু সত্যই কি তিনি নিবেদিতার দিকে তাকিয়েছিলেন ? দ্বিতীয় নজরে দেখি— মায়ের চোখে অসীম সুদূরতা, সেখানে কোনও নির্দিষ্টতা নেই... আশ্চর্য অতল শান্তি এবং দূরপ্রসার— যা অন্তর্মগ্নতার অপর রূপ ।"

মনে হয় শ্রীশ্রীমা ও নিবেদিতা মুখোমুখি বসে আছেন এমন একটি চিত্রের কল্পনা কেন এসেছিল ? এমনভাবে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করার কোনও চিত্র কি আমরা সচরাচর দেখতে পাই ? অথবা নিবেদিতা ও শ্রীশ্রীমা যখন বিস্ময়ে ও স্নেহে পরস্পরকে অবলোকন করছেন তখনই কারও ইঙ্গিতে আলোকচিত্রী দৃশ্যটি ধরে রেখেছিলেন তাঁর ক্যামেরায় ? হয়তো বা নিবেদিতার ইচ্ছাতেই ঐ ছবি উঠেছিল ।

নিবেদিতার দৃষ্টি নিয়ে কি আমরাই দেখতে শিখেছি মাকে আজ ? নিবেদিতা কি বলতে চেয়েছেন— যদি শান্তি চাও, চাও জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য— তবে তাঁকে দেখতে শেখ । তিনিই তো 'ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী ।' অথবা তিনি এনে দেবেন স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের চেতনা ! ছবির কোনও অর্থ খোঁজা আজ দুরূহ কাজ । বুঝতে হলে এবং খুঁজে পেতে

হলে নিবেদিতার চিন্তার রেখা ধরেই অগ্রসর হতে হবে ।

ছবিটি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক । একটা যোগাযোগের ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছিল তারই প্রমাণ । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারী মিলিত হলেন নতুন দিগন্তে । এ মিলন বাইরের নয় । তাঁদের অন্তরও মিলিত হল ।

হতে পারে মা দু-হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন তাঁর কন্যাকে । অথবা সুদূর থেকে কন্যা এসে আশ্রয় পেল মায়ের কোলে । মায়ের স্নিগ্ধ চাহনিতে দেশ-কালাতীত এক ভালবাসা, গ্রহণের আশ্বাস । নিবেদিতা কী দৃপ্ত, অথচ নম্র, নত । পাশ্চাত্য মনস্বিতা ও প্রাচ্যের অধ্যাত্মগরিমা— দুয়ের অভূতপূর্ব মিলন ।

ছবিটি নিবেদিতাই এক সময়ে দেখেছিলেন মানসচক্ষে । অবশ্য তার স্থান, কাল, পাত্র সবই ভিন্ন । পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন— সেখানে যেন দুটি চিত্তপ্রবাহ মিলেছিল । একটি 'তারুণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল,' অপরটি ছিল এক মহাসাগর 'অধ্যাত্মসাধনায় প্রশান্ত ।' নিবেদিতা ও শ্রীশ্রীমায়ের এই মিলনে যেন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনবৃত্তটি পরিপূর্ণ হল । একদিন আসবে যখন নিবেদিতার মতো বহু পাশ্চাত্যের মেয়ে ব্যাকুল হবে প্রাচ্যের অধ্যাত্মজীবনের আকাঙ্ক্ষায় । আর ভারতের মেয়েরা ? তারা নিজেদের উজ্জ্বল করবে কর্মশক্তিতে, মনীষায়, স্বাধীনতায় । অন্যদিকে শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে যে-আধ্যাত্মিক জাগরণ এসেছে— সেই সম্পদকে গভীরভাবে সুরক্ষিত করবে ত্যাগ ও সেবার নব আদর্শে ।

আরও চিন্তার অবকাশ আছে । অপরা বিদ্যা কি পরাবিদ্যায় সার্থক পরিণতি পেল ? নিবেদিতার বিদ্যালয় থেকেই কি রূপ নেয়নি স্বামীজীর স্বপ্নসম্ভব শ্রীসারদা মঠ— অধ্যাত্মপ্রতিমা শ্রীসারদাদেবীকে কেন্দ্রে রেখে ?

স্বামীজীর একান্ত অভিপ্রায় ছিল, সাধুদের মঠের মতো, মেয়েদেরও একটি স্বাধীন মঠের প্রতিষ্ঠা । কিন্তু সেকালের সমাজে যেখানে নারীর শিক্ষারই প্রচলন খুব সীমিত ক্ষেত্রে, সেখানে ঐ ইচ্ছার রূপায়ণ কী করে ঘটবে ? নারীর সমস্যা তখন সমাজ জুড়ে । বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের কেতাবী শিক্ষা প্রায় হত না । তাদের স্বাধীন ইচ্ছাগুলো ধীরে ধীরে নিঃশেষ হত 'খাওয়ার পরে রাঁধা, আবার রাঁধার পরে খাওয়া'র একটি দীর্ঘবৃত্তে । শিক্ষা পেলে মেয়েরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে শিখবে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও সংকল্প গ্রহণ করার শক্তি প্রবল হবে একথা স্বামীজী জানতেন । ত্যাগের পথে তখনই তাদের যাত্রা সম্ভব । তাই স্বামীজী একটি বিদ্যালয় মাত্র প্রতিষ্ঠা করেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন । জানতেন যে অমোঘ বীজ বপন করা হল ভারতের মাটিতে, তার থেকে কিছু ত্যাগব্রতী কর্মীই তাঁর স্ত্রীমঠ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে । নিবেদিতা বিদ্যালয়ের নেপথ্যে ছিল মেয়েদের স্বাধীন মঠ প্রতিষ্ঠার এই মহৎ ভাবনা এবং কালে সেই ভাবনা রূপ নিল । ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ত্যাগব্রতী কর্মীদের নিয়েই স্বামীজীর পরিকল্পিত শ্রীসারদা মঠের ঐতিহাসিক সূচনা । নারী আন্দোলনের সে-এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক্‌দর্শন । আধ্যাত্মিক জীবন ও কর্মময় জীবনকে একই সূত্রে মিলিয়েছিলেন নিবেদিতা । তাঁর ব্রহ্মচর্য এবং সংযতজীবনের সঙ্কল্পের মধ্যেই ঐ ভাবী উত্তরণের আভাস ছিল । নিবেদিতা স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলনের চিন্তাকে তাঁর জীবনে রূপ দিয়েছিলেন অনেকাংশেই । তাঁর জীবনব্রত থেকে তিনি কখনই বিচ্যুত হননি । আমরা যেন না ভুলি সেই ধারাটিই বিদ্যালয়ে অন্তঃসলিলা হয়ে অন্যান্য কর্মীদের প্রবুদ্ধ করে চলেছে শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা ও আশীর্বাদে ।

সম্পাদিকা, 'নিবোধত' পত্রিকা ।